দর্শনপরিচয়

দর্শনপরিচয়

ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তদ্বিবৃত
কয়েকটী বিশেষ তত্ত্বের সরল বিশ্লেষণ

শ্রীগোপালচন্দ্র সেন

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্
কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

বঙ্গ-জননীর একনিষ্ঠ সাধক, স্বদেশীর অগ্রদূত

স্বর্গগত পিতৃদেব

শ্রীকুঞ্জবিহারী সেনের

পবিত্র নামে

এই গ্রন্থ

ভক্তি-অর্ঘ্য-স্বরূপ

অর্পিত হইল

নিবেদন

ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান ও দর্শন আলোচনায় আগ্রহ সকলেরই যাহাতে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, এই দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া 'দর্শনপরিচয়' রচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের 'সম্বিৎ-রূপা' ভক্তি-বৈশিষ্ট্যের প্রতীক ভারতীয় দর্শন সমুচ্চয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে একান্ত অজ্ঞতাই জনসাধারণের সন্তাপ ও দৈন্যের অন্যতম কারণ। 'দর্শনপরিচয়' পাঠে, উক্ত দুর্গতির প্রকৃতি ও হেতু যদি কেহ উপলব্ধি করেন ও তৎপ্রতিকারে যত্নশীল হ'ন এবং 'দর্শনে' স্পৃহা তাঁহাদিগের যদি বলবতী হয়, তবেই শ্রম সার্থক হইবে।

'সুহৃদ্ লাইব্রেরীর' অধ্যয়ন-মণ্ডলী যদি বর্ত্তমান গ্রন্থ প্রণয়নে সমবেত ঐকান্তিকতা না দেখাইতেন, তাহা হইলে ইহা রচিত হইত কিনা সন্দেহ ; কাজেই গ্রন্থখানি যদি সাধারণ-পক্ষে দর্শন আলোচনায় কিঞ্চিন্মাত্রও সহায়তা করে ও ইহা যদি 'সুধীগণের ও ভক্তবৃন্দের নিকট আদরণীয়' হয়, তাহা হইলে উক্ত মণ্ডলীর সভ্যবৃন্দেরাই ধন্যবাদের পাত্র।

অপরপক্ষে, 'বঙ্গ-সাহিত্য মহামণ্ডলের' সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীকাশীশ্বর বিদ্যারত্ন, কাব্য-স্মৃতি-তীর্থ মহোদয় তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ দানে ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য, কাব্য-ব্যাকরণ-তর্কতীর্থ মহাশয় গ্রন্থারম্ভে একাধারে ত্রিবিধ মঙ্গলাচরণ সন্নিবিষ্ট করিয়া 'দর্শনপরিচয়' প্রকাশে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছেন এবং আমার শিল্পী-বন্ধু শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র আঢ্য, 'দর্শনপরিচয়ে'র প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা করিয়া দিয়া এক অতুলনীয় দর্শন-পরিচয় দিয়াছেন ; তাঁহাদিগের এ ঋণ অপরিশোধনীয়—ইতি,

গ্রন্থকার।

"এই ভারত মহাসাগর তীরে, সভ্যতার দুয়ারে, পুরাকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত বহু বিভিন্ন জাতি ও সভ্যতা আসিয়া মিলিত হইয়াছে। সে মিলনে ভারতের আদর্শ আরও পুষ্ট ও পরিণত হইয়াছে, কখনও সে তাহার বৈশিষ্ট্য হারায় নাই—তাহার আদর্শের বিচ্যুতি ঘটে নাই। বিশ্বজনীন সার্ব্বভৌম আদর্শই ভারতের ভাব, তাহাই ভারতীয় সভ্যতার প্রাণস্বরূপ। * * * * * বর্ত্তমান জগৎ আজ জড়ত্বের শৃঙ্খল পরিয়া, পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের গান গাহিয়া চলিয়াছে, আজ তাহারা ভারতের দিকে উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে—ভারতের নূতন বাণী, নূতন তত্ত্ব, সে পূর্ণব্রহ্ম জ্ঞান শুনিবার জন্য উৎকর্ণ, উদ্‌গ্রীব।"

—আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

পদার্থান্ সমালোচ্য বৈশেষিকৈর্যৎ, পরং তত্ত্বমাপ্তং তদেকং ত্বমেব।
শ্রুতং মানগম্যং বিশেষাভিধানং, তবৈব স্বরূপং ন চান্যদ্ বিভাতি ॥৪॥
শ্রুতেরর্থজাতস্য বিশ্লেষণার্থং, গতিঃ কর্ম্মমীমাংসকৈর্যোপদিষ্টা।
প্রশান্তং সুরূপং তবৈতৎ স্বরূপং, ত্বমীশঃ পরেশো নৃপেশো ভবেশঃ ॥৫॥
প্রসিদ্ধঞ্চ বৈদান্তিকানাং যদাদ্যং, সদদ্বৈত মন্যাদৃশং বাপি তত্ত্বম্।
পরব্রহ্মণস্তে স্বরূপং বিদিত্বা, তদেবৈতি মুক্তিং গতো জীবলোকঃ ॥৬॥

(হে পুরুষোত্তমদেব!) বৈশেষিকেরা পদার্থনিচয় সমালোচনা করিয়া যে পর তত্ত্বরাজি লাভ করিয়াছেন তদ্‌সমুদয় তুমিই এবং তাঁহাদিগের বেদ-লব্ধ ও প্রমাণ-সিদ্ধ ‘বিশেষ’ আখ্যায় পরিকল্পিত রূপ তাহা তোমারই স্বরূপের বিকাশ ভিন্ন অন্য আ কিছুই নহে।৪।

মীমাংসকেরা বেদার্থের বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে যে (বিশিষ্ট) কর্ম্ম-পন্থার উপদে করিয়াছেন তাহা তোমারই প্রশান্ত ও সৌন্দর্য্যময় রূপমাধুরী (উপলব্ধির নিমিত্তই)—তুমি ভূতেশ, তুমি ভূপেশ, তুমি পরাৎপর, তুমি পরমেশ্বর।৫।

বৈদান্তিকদিগের (ব্রহ্ম-বিষয়ক) অদ্বৈতবাদ রূপ যে আদি-তত্ত্ব এবং (উক্ত তত্ত্বের দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত (প্রভৃতি) যে সকল বিভেদাত্মক তত্ত্ব-নিরূপণ, তদ্ সমুদয় তোমারই (ইহ-চরাচরে যাবতীয় জড় ও চেতন পদার্থের মধ্যে একমাত্র) ব্রহ্মময়-সত্তারই স্বরূপ বিকাশ এবং ইহা উপলব্ধি করিয়াই জীবগণ মুক্তি লাভ করে।৬।

নমঃ শিবায়েতি নমন্তি শৈবাঃ, পতিং পশূনাং যমনাত্মমাত্মম্ ।
স ত্বং শিবাদ্বৈতময়ো মহেশঃ, ত্বমীশরূপং পরমং প্রধানম্ ॥৭॥
চার্ব্বাক মুখ্যাঃ প্রবদন্তি কেচিৎ, বৃহস্পতের্যন্মতমাদদানাঃ ।
দৈবাদি মিথ্যা সকলঃ স্বভাবঃ, স চ স্বভাবস্তব দেবলীলা ॥৮॥
অর্হং ত্বমেবাসি পরস্বরূপঃ, ত্রিরত্নমপ্যার্য্যতমং ত্বমেব ।
প্রসিদ্ধ হেতুস্ত্বমনন্তরূপ ! জড়োঽজড়াত্মা পরমাণুরেব ॥৯॥

(হে পুরুষোত্তমদেব !) 'নমঃ শিবায়' বলিয়া শৈবেরা অনাদি জগৎ-কারণ পশুপতি বলিয়া তোমাকেই প্রণাম করেন, তুমিই সেই পুরুষ-শ্রেষ্ঠ অদ্বিতীয় মহেশ, তুমি সকলেরই প্রধান, তুমিই (ব্রহ্মাদি ঈশ্বরের) শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর ।৭।

চার্ব্বাক্ আখ্যায় যাঁহারা বিদিত, তাঁহারা দেবগুরু বৃহস্পতির মত অবলম্বন করিয়া বলেন—দৈবাদি সমস্তই অলীক ও সকলই স্বভাবের (প্রকৃতির) খেলা এবং সেই প্রকৃতি তোমারই লীলা ; (প্রত্যক্ষ, যাহা দৃষ্ট হয়, তাহাই একমাত্র প্রমাণ এবং প্রকৃতিই জগতাধার—এই দুইটি মুখ্য-তত্ত্ব প্রচার করিয়া তাঁহারা তোমারই শিব ও শক্তি দুয়ের ভেদে অভেদাত্মক যুগল রূপের লীলা আস্বাদন করেন) ।৮।

জৈনদিগের (ধ্যেয়) আর্হত্ তুমিই এবং তাঁহাদের প্রকৃষ্ট কাঙ্ক্ষনীয় (সম্যক্ জ্ঞান, দর্শন ও চরিত্র আদি) ত্রিরত্নের যে (সাধন) তত্ত্ব, তাহা তুমিই—তাঁহাদিগের (প্রবর্ত্তিত) প্রসিদ্ধ কারণ তুমিই (তাঁহাদিগের 'পুদ্গল', জড়-পরমাণু ও 'আত্মা' চৈতন্য-পরমাণু সংজ্ঞার্থক, অবিভাগ পরিচ্ছেদ, যে পরমাণু-তত্ত্ব) তাহাই তোমার অনন্ত রূপ-তত্ত্ব ।৯।

বৌদ্ধৈঃ প্রদিষ্টঃ সুবিশুদ্ধবোধিঃ, প্রজ্ঞাদিমার্গ প্রতিরূঢ়তত্ত্বম্ ।
দুঃখাভিধস্কন্ধ সমাপ্তিমূলং, মহানিদানং ভবতঃ স্বরূপম্ ॥১০॥
আজীবকং তত্ত্বমিদং নিরূঢ়ং, ঊর্দ্ধে মনুষ্যো জনিভূম্নিকায়ে ।
মন্ত্রঃ স চায়ং তব বাক্যমন্ত্রাৎ, ন ভিন্নতামেতি মহত্ত্ব হেতুঃ ॥১১॥

দৃশ্যতে দর্শনৈঃ সর্ব্বৈর্যস্য শ্রীপদপঙ্কজম্ ।
তত্রৈবাস্তাং মতির্নিত্যং গোপালস্য পরাৎপরে ॥
নাম সংকীর্ত্তনায়ৈব মহিম্নঃ স্তোত্রমুত্তমম্ ।
পুরুষোত্তমনাম্নস্তে সর্ব্বত্র জয়তি ধ্রুবম্ ॥

॥ ওঁ নমঃ পুরুষোত্তমদেবায় ॥

(হে পুরুষোত্তমদেব !) বৌদ্ধদিগের উপদিষ্ট প্রজ্ঞাদি (প্রজ্ঞা, সমাধি ও শীল এই ত্রিস্কন্ধাশ্রিত আর্য্য অষ্টাঙ্গিক) মার্গের যে তত্ত্ব এবং তাঁহাদিগের সংসার উৎপত্তির হেতু-নিরাকরণ ও (দ্বাদশ) দুঃখ-স্কন্ধের পরিসমাপ্তির উপায় স্বরূপে 'মহানিদান' আখ্যায় বর্ণিত তথ্যসমূহ তোমারই শুদ্ধ বোধি-সত্ত রূপ (উপলব্ধির নিমিত্তই অভিব্যক্ত) ।১০।

আজীবক দিগের 'সবার উপরে মানুষ সত্য' রূপ যে মহান তত্ত্ব, তাহাই (স্রষ্টা ও সৃষ্টি আদি যাবতীয় অচিন্ত্য ভেদা-ভেদ জ্ঞাপক ভাব নিচয়ের) বরেণ্য মহা-সত্য এবং তাঁহাদিগের উক্ত (ভূত ও ভূতভাবনের মধ্যে ঐক্য) মন্ত্র-বাক্যই একমাত্র পূজনীয় তোমারই মন্ত্র-রূপ ।১১।

সকল দর্শন-পন্থী যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম (নিরত) দর্শন করেন সেই পরাৎপর (পুরুষোত্তমের) শ্রীচরণে নিত্যই গোপালের মতি থাকুক ; তব নাম সংকীর্ত্তনের নিমিত্তই এই পরমোত্তম পুরুষোত্তমের মহামহিমা জ্ঞাপক স্তোত্র রচিত হইল—এই স্তোত্র সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হউক ।

হে পুরুষোত্তমদেব ! তোমায় নমস্কার ।

"আদাবন্তেচমধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।"

"সুখ-শান্তি, আপদ-বিপদ, সকলই তাঁহার ইচ্ছা। আমরা তাঁহার দুর্জ্ঞেয় ইচ্ছার রহস্য বুঝি না বলিয়া দুঃখ করি। * * * * * আমি দুঃখকে অমঙ্গল মনে করি না, কারণ দুঃখই মানুষের মনুষ্যত্বকে গড়িয়া তুলে—আপনাকে, অর্থাৎ পরমাত্মা ব্রহ্মকে জানিতে শিখায়; তাহাতে মানুষ ঐশ্বর্য্য-বিলাস, সুখ-সম্পদকেই জগতের শ্রেয় মনে করে না—সত্যের অনুসন্ধান জন্য, সদ্‌গুণের আশ্রয়ে, আত্মসুখ ছাড়িয়া সকলকে সুখী করিতে কর্ম্ম করে। * * * * * "

—ডাঃ শ্যামাপদ ঘোষ।

(মাধেপুরা, ২৫।৩।১৩২৭)

সূচীপত্র

বিষয় পৃ

দর্শনপরিচয়

উপক্রমণিকা

ভারতের আজ বড়ই দুর্দ্দিন। অপরের কথায় কাজ কি, বাংলা ও বাঙ্গালীর বর্ত্তমান দুঃখ দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিয়া প্রাণের মর্ম্মন্তুদ হাহাকারে হৃদয় বিদীর্ণ হওয়ায় কবি কান্নার সুরে গাহিয়াছেন, হায় আজ

"দৈন্য জীর্ণ কক্ষ তার, মলিন শীর্ণ আশা,
ত্রাসরুদ্ধ চিত্ত তার, নাহি নাহি ভাষা।"

—বাংলা ও বাঙ্গালীর এ হেন দীন হীন বেশ, পথের ধূলি হইতেও এ তুচ্ছ জীবন, এ জীবন্মৃত অবস্থা—চিরকাল কিছু ছিল না। বাঙ্গালী চিরকাল কিছু এখনকার মত এমনতর কাঙ্গালবেশে, করুণার ভিখারী সাজিয়া বিশ্বের দ্বারে সদাই সন্ত্রস্ত চিত্তে বসিয়া থাকে নাই। জগতের 'দরবারে' তাহার স্থান ছিল, জ্ঞান গরিমায় আপনার যোগ্য আসন গ্রহণ করিয়া এক সময়ে সে ভারতের যাবতীয় শিক্ষাকেন্দ্র অতীব দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়াছে।

আরও অনেক বিষয়ে তাহার গৌরব ছিল, সুখ্যাতি ছিল—যথা, হস্তি-চিকিৎসায়,[১] রেসমের কাজে,[২] ঢাকাই মস্‌লিনে,[৩] ভাস্করের কাজে,[৪] বাকলের কাপড়ে,[৫] নৌকা এবং জাহাজ গঠনে,[৬] থিয়েটার বা প্রেক্ষাগৃহ বা 'পেক্‌খা-ঘরঅ'[৭] প্রবর্ত্তনে।

১। মুনি পালকাপ্য হস্তি-চিকিৎসায় বিশারদ ছিলেন, তাঁহার আয়ুর্ব্বেদ খৃঃ পূঃ চতুর্থ-পঞ্চম শতকে—Sutra Periodএ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল।

২। বাংলায় হলুদে রঙের রেসম নাগবৃক্ষের (নাগকেশর গাছের) পোকা হইতে হইত; চীনের রেসম সাদা, ইহা তুঁত গাছের পোকা হইতে হইত। সুবর্ণকুড্য বা কর্ণসুবর্ণ অর্থাৎ বাংলার মুর্শিদাবাদ ও রাজমহল এই উভয় স্থানে খৃঃ পূঃ তৃতীয়-চতুর্থ শতকে রেসমের চাস হইত।

৩। ঢাকাই মস্‌লিন্ এত সূক্ষ্ম সূতায় তৈয়ারী হইত যে তাহা ঘাসের উপর শিশিরে ভিজিয়া গেলে দেখাই যাইত না। বাংলা দখল করিয়া তথায় সুবাদার নিযুক্ত করিয়া আকবর বাদসাহ উক্ত সুবাদারের সহিত এই বন্দোবস্ত করেন যে রাজস্ব হিসাবে বাৎসরিক তিনি তাঁহার নিকট মাত্র পাঁচ লক্ষ টাকা লইবেন, কিন্তু দিল্লীর রাজবাড়ীতে বৎসরে যত মালদহের রেসমী কাপড় ও ঢাকাই মস্‌লিন্ আবশ্যক হইবে সবই তাঁহাকে যোগাইতে হইবে।

৪। বাংলার ভাস্কর শিল্প, মূর্ত্তিবিদ্যা (Iconography) ভাবে ভরপুর; পালরাজাদের সময় ইহার চরম উন্নতি হয়। মূর্ত্তিগুলি দেখিলে মনে হয় যেন কথা কহিতেছে, যেন সজীব; এ সম্পদ বাংলার নিজস্ব।

৫। বাকলের অপর নাম 'ক্ষৌম' বা 'দুকূল'। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে ইহা কর্ণসুবর্ণে হইত এবং ইহার বর্ণ সূর্য্যের মত ও ইহা মণির মত উজ্জ্বল।

৬। বাংলার তৈয়ারী জাহাজে চড়িয়া বিজয়সিংহের সুপারা (বোম্বায়ের নিকট) ও লঙ্কা দ্বীপে যাত্রা, পালরাজাদের নৌযুদ্ধ, ১২০০ দাঁড়ওয়ালা চাঁদসদাগরের মধুকর জাহাজ, বাঙ্গালী মাঝি পরিচালিত কেদার রায় ও প্রতাপাদিত্যের নৌবহর প্রভৃতি সবই নৌকা বা জাহাজ গঠনে বাঙ্গালীর কৃতিত্বের পরিচায়ক।

৭। 'পেক্‌খা-ঘরঅ' প্রাকৃত শব্দ।

অভিনয়াদি 'কলাবিদ্যা' [১] ব্যতিরেকে নানা বিষয়ক জ্ঞান বিজ্ঞান আলোচনায় ও দর্শনে, কাব্যে এবং সাহিত্যে কৃতবিদ্য স্মরণীয় বাঙ্গালীর অভাব ছিল না—সাংখ্যকার মহামুনি কপিল, [২] বৈশেষিক দর্শনশাস্ত্র প্রণেতা মহর্ষি কণাদ, [৩] ভগবান গৌতম বুদ্ধ, রাজা অশোক, বৌদ্ধশীলভদ্র, [৪] দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, [৫] বিশ্বেশ্বর শম্ভু, [৬] ভিক্ষু বিভূতিচন্দ্র, [৭]

১। নাটক অভিনয়াদির চতুর্ব্বিধ (পাঞ্চালী, ওড্রমাগধী, আবন্তী ও দাক্ষিণাত্যা এই চারি প্রকার) প্রবৃত্তির মধ্যে ওড্রমাগধী প্রবৃত্তি প্রথমে বঙ্গদেশ হইতেই চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হয়। বাংলার লোক নাটকই ভালবাসিত বেশী, নাচ গান তেমন পছন্দ করিত না; আবার স্ত্রীর অভিনয় অপেক্ষা পুরুষের অভিনয়ই বাঙ্গালীর বেশী পছন্দ—এখনও বাংলায় নাচ গান তেমন জমে না যতটা জমে 'acting'—খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে বাংলা দেশে নাট্যকলার প্রভুত উন্নতি হইয়াছিল।

২। কপিল দেব কর্দ্দম প্রজাপতির ঔরসে ও দেবহূতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, ইনি ভগবানের পঞ্চম অবতার বলিয়া খ্যাত। কপিলের শাপে সূর্য্যবংশীয় রাজা সগরের ষষ্টি সহস্র পুত্র নিহত হন ও পরে সগর বংশীয় ভগীরথ স্বর্গ হইতে গঙ্গা আনয়ন করিয়া কপিল শাপে নিহত পূর্ব্ব পুরুষদিগকে উদ্ধার করেন। কপিলের বাড়ী পূর্ব্বাঞ্চলে—বাংলায়। এখনও গঙ্গাসাগর মেলার নামে কপিল মুনির আশ্রমে মেলা হয়, যদিও ইহাই প্রবাদ যে প্রকৃত কপিলাশ্রম এখন সাগরগর্ভে অন্তর্হিত।

৩। কণাদের অপর নাম উলূক, ইনি কশ্যপ বংশীয় ছিলেন, খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতকের লোক।

৪। শীলভদ্র নালন্দা বিহারের অন্যতম অধ্যক্ষ ছিলেন, ইনি সমতটের জনৈক রাজার পুত্র। ইনি ধর্ম্মপালের শিষ্য, মহাযান বৌদ্ধ, য়ুয়াং চুয়াংএর গুরু ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ছিলেন।

৫। দীপঙ্কর বিক্রমশীল বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি বিক্রমশীপুর নিবাসী বাঙ্গালী। ইনি ৭০ বৎসর বয়সে তিব্বতরাজের আহ্বানে পশ্চিম তিব্বতে গিয়া তথায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন। ইনি 'অতিশা' নামে খ্যাত ছিলেন।

৬। বিশ্বেশ্বর শম্ভু দীপঙ্করের ন্যায় একজন ধর্ম্ম প্রচারক, ইনি দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন।

৭। বিভূতিচন্দ্র জগদ্দল বিহারের প্রধান ভিক্ষু ছিলেন—জগদ্দল বাংলার মহাবিহার। ইনি মহাপণ্ডিত ছিলেন।

লুইপাদ, [১] শান্তিদেব [২] মচ্ছেন্দ্রনাথ, [৩] গোরক্ষনাথ, [৪] জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীচৈতন্যদেব, গোবিন্দদাস, রঘুনাথ, [৫] জগন্নাথ, [৬] জগদীশ [৭] প্রভৃতি আরও অনেকেরই নাম করিতে পারা যায়। কিন্তু বাঙ্গালী আজ সে সমস্তই ভুলিয়াছে; আপনারে নিশিদিন হীন ও হেয় ভাবিয়া ভাবিয়া সে স্বীয় 'জীবগর্ব্ব' হারাইয়াছে। তাহার প্রাণের স্বরূপ যে কি, সে পরিচয়ের একান্ত অভাবে আজ এক মোহনিদ্রায় অভিভূত হওয়ায়

১। লুইপাদ একজন আদি সিদ্ধাচার্য্য, ইনি মহা যোগীশ্বর ছিলেন। ইঁহার রচিত বহু চর্য্যাপদ বা কীর্ত্তনের গানের ভুটিয়া ভাষায় তর্জ্জমা আজও ভুটানে পাওয়া যায়। রাঢ়দেশে ও ময়ূরভঞ্জে ইঁহার পূজা হয়। ইনি একটি সম্প্রদায়ও সৃষ্টি করেন।

২। শান্তিদেব বহু বৌদ্ধ পুঁথি লিখিয়াছিলেন ও বহু বাংলা গান রচনা করিয়াছিলেন। সর্ব্বদাই ইঁহার মুখ প্রসন্ন থাকিত বলিয়া ইনি 'ভুসুকু' নামেও খ্যাত ছিলেন।

৩-৪। মচ্ছেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ উভয়ের মধ্যে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ। মচ্ছেন্দ্রনাথ নাথপন্থের (Nathism) প্রবর্ত্তক। নাথেরা না হিন্দু না বৌদ্ধ এমন একটি অভিনব ধর্ম্মমত প্রচার করেন। নাথ সম্প্রদায় বহুশত বৎসর ধরিয়া বাংলায় প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। নাথপন্থ বাংলার নিজস্ব সম্পদ, মচ্ছেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ বাংলার পরম গৌরব।

৫। রঘুনাথ শিরোমণি বাংলার সুবিখ্যাত নব্যন্যায়ের প্রবর্ত্তক। ইনি নবদ্বীপের বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ও মিথিলার পক্ষধর মিশ্রের শিষ্য ছিলেন। ইঁহার রচিত 'দীধিতি-প্রকাশ' নব্যন্যায়ের একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

৬। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার স্মৃতিশক্তি ছিল অনন্য সাধারণ ও ইঁহার অধ্যবসায় ছিল অলৌকিক। ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয় ও ইনি ১১১ বৎসর জীবিত ছিলেন।

৭। জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রণীত "তর্কামৃত" নব্যন্যায় দর্শনের একখানি প্রাথমিক পাঠ্য পুস্তক। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইনি প্রাদুর্ভূত হন।

সুখসূর্য্য তাহার অস্তমিত হইয়াছে, আশা তাহার নির্ম্মূল হইয়াছে, তাহার ঊর্দ্ধগতিও রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

বর্ত্তমান কালে চিন্তার দৈন্যই বাঙ্গালী জাতির প্রধানতম দৈন্য। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, "বাঙ্গালীর সর্ব্বকঠিন রোগ তাহার অচিন্ত্য জ্বর"। [১] আশ্চর্য্যের সেরা আশ্চর্য্যও এইটী; স্বনামধন্য চিন্তাশীল মহাত্মাদিগের এই বঙ্গদেশে চিন্তার এ কি ভীষণ অবজ্ঞা এবং অনাদর! যে যে বিষয়ে যতটুকু চিন্তার আবশ্যক তৎসমুদয় হইতেই বাঙ্গালী সর্ব্বথা পলায়নপর; ইহা কি ভীষণ অবস্থা নহে? ভাব অবলম্বন করিয়াই ভাবের প্রকৃত বিষয়বস্তুটী ধরিতে পারা যায়, নচেৎ নহে। কাজেই ভাবের সাধনায় আবার বাঙ্গালীকে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। তবেই তাহার এই 'অচিন্ত্যজ্বর' ছাড়িবে—ত্রিতাপ হইতে রক্ষা পাইয়া পুনরায় সে তাহার হৃত 'স্বরাজ্যে' প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। আজকালকার এই স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার যুগে হিন্দু দর্শনের আলোচনাই তাহার পক্ষে প্রকৃত ও প্রকৃষ্ট স্বরাজ্য লাভের উপায়। বাঙ্গালী এতাবৎকাল তাহার এই মরণোন্মুখ রোগ ধরিতে পারে নাই, এই মারাত্মক রোগ নিরাকরণোদ্দেশ্যে সে কোন প্রচেষ্টাই করে নাই; কেমন যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া, 'দিনগত পাপক্ষয়' করিয়া, সে জীবন বহিয়া চলিয়াছিল—মুহূর্ত্তেকের তরেও সে তাহার এই অস্বাভাবিক বিকারগ্রস্ত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে নাই; ফলে তাহার অধোগতি আজ সুনিশ্চিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাহাতেই সে তাহার সম্পূর্ণ অলক্ষিতভাবে নিমজ্জিত হইতেছে।

১। "Think-phobia, i. e., total incapability and unwillingness to think"—Sree Aurobindo.

বাঙ্গালীর এই আত্মবিস্মৃতি লক্ষ্য করিয়া তাহার প্রাণ উদ্বুদ্ধ করিবার মানসে কবি শাশ্বত জাগরণের বাণী গাহিয়া তাহাকে শুনাইলেন—

"এইখানে উদেছিল বুদ্ধের উন্নত আত্মা
এইখানে নদীয়া-কিশোর
বর্ণে গন্ধে ফুলে ফলে আছে তারা সমাহিত
আছে জেগে প্রাণ-মাঝে তোর।
এই জন্ম এই আত্মা নহে শুধু এ জন্মের নিত্যতার ব্যক্ত জাগরণ,
চিরমাতা প্রকৃতির এ অমৃত বক্ষমাঝে অনু-কণা লভে না মরণ।
যে নির্ব্বাণ-মন্ত্র-কথা শুনেছিল এ ধরণী.—ত্যাগের সে স্বপ্ন পূর্ণ ধ্যানে,
যে অমৃত-নাম-মন্ত্রে প্রেমে মেতেছিল ধরা প্রাণ জেগে উঠেছিল গানে
আজো জাগে জগতের প্রাণে।
নহে লুপ্ত নহে সুপ্ত ভোগবতী ফল্গুমত ওরে অন্ধ ওরে ভ্রান্ত চিত
তোর মাঝে জাগিছে সতত।"—"আকিঞ্চন দাস।"

বাংলার প্রাণের স্বরূপ কথনে শ্রীঅরবিন্দ লিখিলেন—

"The lyric and the lyrical spirit ;
The spirit of simple, direct, and poignant expression, of deep, passionate, straight-forward emotion, of a frank and exalted enthusiasm ;
The dominant note of Love and Bhakti, of a mingled sweetness and strength ;
The potent intellect, dominated by the self-illuminated heart ;
A mystical exaltation of feeling and spiritual insight, expressing itself with a plain concreteness and practically—
This is the Soul of Bengal."

গীত কাব্যময় মানস-ছন্দ ;
তেজ স্পষ্ট ও সরল বাক্য বিন্যাস রীতি—যাহা সুগভীর ও
রাগ রঞ্জিত ঋজু ভাবধারায় এবং সারল্যে বিমণ্ডিত
সুউন্নত মহোদ্যমে অভিব্যক্ত ;
মধুর-কম প্রেম-ভক্তির উচ্ছ্বাসে স্বতঃই ওতঃ প্রোতঃ ;
স্বস্বরূপে উদ্ভাসিত প্রদীপ্ত প্রতিভা ; এবং
বর্দ্ধিষ্ণু গূঢ় অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টি—যাহা নিয়তই
ক্রিয়াসিদ্ধ ও সুসংযতভাবে সর্ব্বদাই সতঃস্ফূর্ত্ত—
ইহাই বাংলা, ইহাই বাঙ্গালীর প্রাণের স্বরূপ।

—তাহাই যদি, তবে আজ বাঙ্গালীর এ হেন দুর্দ্দশায় মুহ্যমান হইয়া থাকিলে চলিবে কেন? এহেন দুর্গতির অবসান, এহেন লজ্জাকর কলঙ্কের মোচন তাহাকে যে করিতেই হইবে। বাংলা তথা ভারতের ও ভারতবাসীর হৃত-গৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে যে তাহাকেই। কান্ত-কবি রজনীকান্তের সুরে প্রাণের আবেগ ঢালিয়া তাহাকেই যে আবার গাহিতে হইবে—

"তোমারি চরণে করি দুঃখ নিবেদন—
শান্তি সুধামৃত অচল নিকেতন।"

সর্ব্বপ্রকারে ও সর্ব্বাবস্থায় দুঃখ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হওয়া মানব মাত্রেরই চরম ও পরম লক্ষ্য ; আর এই দুঃখ নিরাকরণের উপায়ের উদ্ভাবনেই জ্ঞানের বিকাশ। জ্ঞানের ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতির উদয় হয়, প্রাণে শান্তি আসে, সুধামৃতে হৃদয় ভরপুর হইয়া যায় ও সেই অচল নিকেতন শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আত্ম-নিবেদন করিতে মানুষ শিক্ষা করে।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই ভাবধারা তখন সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় তাহার মনের মধ্যে দেদীপ্যমান হইতে থাকে, এবং উক্ত তত্ত্বের উপলব্ধি পূর্ণরূপে হইলে, সর্ব্ব-উপাধি বিনির্ম্মুক্ত হইয়া মানুষ তখনই ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির সার-সংযুক্ত মাধুর্য্যময়ী ও জ্ঞানরূপা যে ভক্তি [১] তাহার অধিকারী হয়। মানব আত্মার বিকাশ, এমনই ভাবে সত্য ও সুন্দর পন্থার অনুবর্ত্তন করিয়া সাধিত হয়—মানুষের স্বরূপ এমনই ভাবে ধীরে ধীরে কিন্তু অমোঘ ও অব্যর্থ গতিতে ক্রমবিবর্ত্তিত হইয়া ফুটিয়া উঠে—ও তাহার যিনি স্রষ্টা, যিনি তাহাকে তাঁহার নিজস্ব চিদানন্দের অভিব্যক্তিরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে আবার মহানন্দে বিভোর করিয়া তুলে।

দুঃখ কি? তাহার উৎপত্তিই বা কোথা হইতে এবং কেমন করিয়াই বা তাহা দুর করিতে পারা যায়—কি উপায়ে, কি পথ অবলম্বন করিয়া ইহাই ভারতীয় সকল দর্শনশাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। "দর্শনং দর্শনং প্রোক্তম্", দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে বিভিন্ন তত্ত্বগ্রামকে—যথা, সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এবং আত্মতত্ত্ব, পরকালতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, অদৃষ্টতত্ত্ব, জগতের কার্য্য কারণ ভাব ও তৎসমুদয়ের বিধান কর্ত্তার বিশেষ জ্ঞান প্রভৃতি সম্যক্ আয়ত্ত করিতে পারা যায় ও এগুলির প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রতীতি জন্মে। আর্য্য ঋষিগণ এই হেতু এই জ্ঞান-শাস্ত্রের নামকরণ করিয়াছিলেন "দর্শন"। বস্তুতঃ যাবতীয় পদার্থের স্বরূপ বা যথার্থ জ্ঞান যে শাস্ত্রপাঠে অবগত হওয়া যায় তাহাই দর্শনশাস্ত্র।

ভিন্ন ভিন্ন দর্শনকার দুঃখ নাশের জন্য বিভিন্ন পথ নির্দ্দেশ করিয়া-

১। "হ্লাদিনীসারসমবেতসম্বিদ্রূপা ভক্তিঃ"—বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত শ্রীগোবিন্দ ভাষ্য। ৩।৪।১২ ॥

ছেন; প্রকৃত পক্ষে কিন্তু দর্শন বলিতে "সর্ব্বতোমুখ সত্যের এক মুখ দর্শন" ইহাই বুঝায়। প্রাচীন ঋষিদিগের মধ্যে যিনি "সত্যের সার্ব্বভৌম ভাবের যে ভাবাংশ অনুভূতি করিয়াছেন, অর্থাৎ সত্যের সর্ব্বতোমুখ স্বরূপের যে মুখ তাঁহার নিজের মানসদৃষ্টির গোচর হইয়াছে, তাহাই তাঁহার দর্শন।" এই হেতু দর্শন অনেকগুলি হইলেও, ভিন্ন ভিন্ন দর্শনশাস্ত্র সত্যের ঐকদেশিক প্রস্থান-বিশেষ বা ব্যাখ্যা হইলেও, যাহা দৃশ্য, যাহা মূল সত্য, তাহা একই; কাজেই বিবিধ দার্শনিকদিগের প্রবর্ত্তিত বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে বিরোধের প্রশ্ন কোনক্রমেই উঠিতে পারে না, সেগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডার কোন অবসরই আসে না। "সর্ব্ব-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ" গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য যথার্থই বলিয়াছেন—

"বাদিভির্দর্শনৈঃ সর্ব্বৈর্দৃশ্যতে যত্ত্বনেকধা।
বেদান্তবেদ্যং ব্রহ্মেদমেকরূপ মুপাস্মহে॥"

পরস্পর বিবদমান দার্শনিক পণ্ডিত মণ্ডলী নিজ নিজ দর্শন পন্থানুযায়ী বিভিন্ন রূপে যাঁহাকে দর্শন করেন—সেই একমাত্র বেদান্তবেদ্য ব্রহ্মকে আমরা উপাসনা করি।[১]

ওঁ নমঃ শ্রীভগবতে গোবিন্দায়।"

১। "That Being, who is variously understood by the various philosophical controversialists in all their (the) several systems of philosophy (followed by them), He who is indeed the one only "BRAHMA", to be realised through the Vedanta, (Him) that same being we worship".—From the translation of Rao Bahadur Prof. M. Rangacarya.

বৈদিক দর্শন

বেদ অপৌরুষেয়। চতুর্ব্বেদই ভারতীয় জ্ঞান-বৈশিষ্ট্যের প্রতীক "সর্ব্ব-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ" গ্রন্থের উপোদ্ঘাত প্রকরণে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য ভারতীয় জ্ঞান ভাণ্ডারের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। ঋক্ সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই বেদ চতুষ্টয়কে (শ্রুতিকে) ভিত্তি করিয় ভারতবাসী ধর্ম্ম (duty), অর্থ (wealth), কাম (desire) ও মোক্ষ সাধন (salvation, final deliverance) উদ্দেশ্যে "চতুর্দ্দশসু বিদ্যাসু" চতুর্দ্দশ বিদ্যার অনুশীলন করিতেন; তাহার মধ্যে—

(ক) "বেদাঙ্গ" (the auxiliary limbs of the Vedas অন্তর্গত ছয়টি;

(খ) "বেদোপাঙ্গ" (the secondary or indirectly conn ted limbs of the Vedas) অন্তর্গত চারিটি;

(গ) "উপবেদ" (the supplementary Vedas) এই সমুদ চতুর্দ্দশটি।

"বেদাঙ্গ" ছয়টি, যথা—

১। শিক্ষা— Science of accents & phonetics,
২। কল্প— Ritual Code,
৩। ব্যাকরণ—Grammar,
৪। নিরুক্ত— Etymology and interpretation,

৫। জ্যোতিষ —Astronomy,
৬। ছন্দ —Prosody.

"বেদোপাঙ্গ" চারিটি, যথা—

৭। মীমাংসা }
৮। ন্যায় } —Science of reasoning; "মীমাংসা" enquires into the meaning and the aim of all the Vedas & "ন্যায়" deals with the characteristic of "প্রমাণ"—an authoritative source of knowledge,

৯। পুরাণ —That which relates the stories of government and urges on the pursuit of true aim in life,

১০। স্মৃতি —i. e., "ধর্ম্মশাস্ত্র", that which regulates the duties to be performed by all in life and deserves to be accepted and acted upon by all—by the classification of right and wrong deeds,

"উপবেদ" চারিটি, যথা—

১১। আয়ুর্ব্বেদ— Science of medicine,
১২। অর্থবেদ— Science of wealth & Government,
১৩। ধনুর্ব্বেদ— Archary & the Science of war,
১৪। গন্ধর্ব্ববেদ—Science and art of music.

এই চতুর্দ্দশ বিদ্যার সাধনার ফলে আর্য্য ঋষিগণ জীবের দুঃখ নিবারণ কল্পে যে সত্য-দর্শন লাভ করিয়াছিলেন তাহাই ভারতীয় দর্শন নামে খ্যাত।

প্রধানতঃ ভারতীয় ষড়্-দর্শনই বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ, যথা—

"ব্যাসঃ বেদান্ত কর্ত্তাস্যাৎ মীমাংসা খলু জৈমিনিঃ,
বৈশেষিকো কণাদস্যাৎ পাতঞ্জলঃ পতঞ্জলিঃ,
সাংখ্যস্ত কপিলঃ কর্ত্তা ন্যায়কৃৎ গোতমোমুনিঃ।"

১ম—মহর্ষি কপিল প্রবর্ত্তিত "সাংখ্য" দর্শন,
২য়—মহর্ষি পতঞ্জলি প্রবর্ত্তিত "পাতঞ্জল" দর্শন,
৩য়—মহর্ষি গোতম প্রবর্ত্তিত "ন্যায়" দর্শন,
৪র্থ—মহর্ষি কণাদ প্রবর্ত্তিত "বৈশেষিক" দর্শন,
৫ম—মহর্ষি জৈমিনি প্রবর্ত্তিত "মীমাংসা" দর্শন বা পূর্ব্বমীমাংসা,
৬ষ্ঠ—মহর্ষি বেদব্যাস প্রবর্ত্তিত "বেদান্ত" দর্শন বা "ব্রহ্মসূত্র" বা
"বৈয়াসিকী ন্যায়মালা" বা "উত্তর মীমাংসা"।

এই ছয়খানি দর্শন শাস্ত্র ব্যতিরেকে ভারতবর্ষে আরও অনেকগুলি দর্শনশাস্ত্রের প্রচলন ছিল। "সর্ব্ব-দর্শন-সংগ্রহ" শ্রীমন্ মাধবাচার্য্য প্রণীত একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ, ইহাতে তিনি দশখানি দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন এবং গ্রন্থ-শেষে লিখিয়াছেন—

"ইতঃ পরং সর্ব্বদর্শনশিরোমণিভূতং শাঙ্করদর্শনমন্যত্র লিখিতম্
ইত্যত্র উপেক্ষিতমিতি।"

এই একাদশখানি দর্শন যথাক্রমে—চার্ব্বাক্দর্শন, অর্হত্ বা জৈনদর্শন, বৌদ্ধদর্শন, রামানুজদর্শন, শঙ্করদর্শন, পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন, শৈবদর্শন, নকুলীশপাশুপতদর্শন, প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন, রসেশ্বরদর্শন ও পাণিনিদর্শন।

উক্ত দর্শনগুলির মধ্যে রামানুজদর্শন, শঙ্করদর্শন ও পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন বেদান্তদর্শনের প্রস্থান বিশেষ; এবং নকুলীশপাশুপতদর্শন, প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শন ও রসেশ্বরদর্শন শৈবদর্শনের প্রস্থান-বিশেষ মাত্র। কাজেই মূলতঃ পূর্ব্বোক্ত ষড়্‌দর্শন ও এই দর্শনগুলির মধ্যে শৈবদর্শন, পাণিনিদর্শন, চার্ব্বাক্‌দর্শন, অর্হত্‌ বা জৈনদর্শন ও বৌদ্ধদর্শন এই একাদশ সংখ্যক দর্শনই ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। সাংখ্যাদি ষড়্‌দর্শনই বেদমার্গ-বিহিত দর্শন বা "বৈদিকদর্শন" নামে খ্যাত, এবং শৈবদর্শনগুলি ও পাণিনিদর্শন ব্যতিরেকে অপর তিনখানি দর্শন, যথা—চার্ব্বাক্‌দর্শন, অর্হত্‌ বা জৈনদর্শন ও বৌদ্ধদর্শন "তথাকথিত বেদমার্গ-বিরোধী-দর্শন" আখ্যায় সাধারণের মধ্যে পরিচিত। এতদ্‌ব্যতীত ভারতীয় ভাব-দর্শন অর্থাৎ 'মানবতদর্শন' (Folk Philosophy) ভারতবর্ষের একটি বিশিষ্ট সম্পদ।

মানবের ত্রিবিধ দুঃখ নাশের উপায় স্বরূপ এই দর্শনগুলিতে বর্ণিত জ্ঞানের পূর্ণ সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে ও তৎসমুদয়ের বিস্তারিত আলোচনা ও তত্তৎবিষয়ের বিশিষ্ট জ্ঞান সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত করিয়া মনে প্রাণে তাহা অনুভব করিতে হইলে বুঝিবা একটি জীবনে কুলায় না—মানব-জীবনও ক্ষণস্থায়ী, জীবন-সংগ্রামে বিঘ্নও যথেষ্ট, এ কারণ পূর্ব্বোক্ত দর্শনগুলির প্রতিপাদ্য বিষয়-বস্তুর অবতারণা মাত্র করিয়া, সেগুলির আলোচনায় জনসাধারণের কথঞ্চিৎ কৌতূহল ও আকাঙ্ক্ষা জাগরিত করিতে যত্নশীল হইয়া, কয়েকটি মাত্র প্রবন্ধে সেগুলির যথাসাধ্য সংক্ষেপে শুধুই পরিচয় দিয়া "দর্শনপরিচয়" রচিত হইল। ভগবান আমাদের সহায় হউন, ইহাই আমাদের একান্ত কামনা—

"য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥"

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ৪—১।

—যিনি এক হইয়াও সর্ব্বব্যাপী, এবং যিনি নিষ্ক্রিয় হইয়াও স্বীয় শক্তিযোগের প্রভাবে সর্ব্বকালে সকল জীবের যাবতীয় অভাব ও দুঃখ মোচন করেন—যে পরম পুরুষ বিশ্বের আদি ও অন্তঃ স্বরূপ, তিনি, আমাদিগের সকলকে, সত্যের পথে, প্রীতির পথে, কল্যাণের পথে, মিলিত করুন।[১]

ত্রিলোকীস্থ সকলের কল্যাণ হউক—

"ওঁ শিবসঙ্কল্পমস্তু।"

১। "He who is one, and who dispenses the inherent need of all peoples and all times, who is in the beginning and the end of all things, may He unite us with the bond of truth, of common fellowship, of righteousness"—from the translation of Poet Rabindranath in his "Hibert Lecture for 1930."

সাংখ্যদর্শন

যে শাস্ত্রে সম্যক্ জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে তাহার নাম সাংখ্য। বস্তুতঃ—

"সংখ্যান্ প্রকুর্ব্বতে যেতু প্রকৃতিঞ্চ প্রচক্ষতে।
তত্ত্বানিচ চতুর্ব্বিংশৎ তেন সাংখ্যঃ প্রকীর্ত্তিতা॥"

—প্রকৃতির ব্যক্তরূপই প্রতীয়মান জগৎ, এই ব্যক্ত প্রকৃতির প্রকৃতি, বিকৃতি ও বিকার নিবন্ধন যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের [১] উদ্ভব হয়, তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া সাংখ্য শাস্ত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে। 'সং' অর্থে সম্যক্ ও 'খ্যা' অর্থে জ্ঞান—এই দুইটি শব্দ হইতে 'সাংখ্য' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

মহর্ষি কপিল দেব সাংখ্যদর্শনের প্রথম আচার্য্য ও প্রবর্ত্তক এবং তাঁহার প্রণীত সাংখ্য-সূত্রের নাম "তত্ত্বসমাস"। তত্ত্বসমাস নিতান্ত সংক্ষিপ্তগ্রন্থ, ইহাকে সাংখ্যদর্শনের সূচীপত্র বলা চলে, কারণ ইহাতে সাংখ্য-দর্শনের সমস্ত তত্ত্বগুলি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মহর্ষি কপিল বলিতেছেন—"অথাতস্তত্ত্ব (সমাসঃ) সমাম্নায়ঃ",—'তত্ত্বসমাস' সাংখ্য-সূত্র ব্যাখ্যা করিতেছি। সর্ব্বসমেত তেইশটি সূত্র ইহাতে আছে,—

১। ১ম—প্রকৃতির অব্যক্তরূপ, ইহাই প্রকৃতির স্বরূপ। ২য়—মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব। ৩য়—সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কার। ৪র্থ—৮ম, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চতন্মাত্র। ৯ম—১৯শ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন, এই সর্ব্বসমেত একাদশ ইন্দ্রিয়। ২০শ—২৪শ, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ বা বায়ু ও ব্যোম্, এই পঞ্চ মহাভূত—এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব।

সূত্রগুলি এইরূপ—

১ম সূত্র—"অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ।"

২য় সূত্র—"ষোড়শকস্তু বিকারঃ।"

৩য় সূত্র—"পুরুষঃ।"

৪র্থ সূত্র—"ত্রৈগুণ্যম্।"

৫ম সূত্র—"সঞ্চরঃ প্রতিসঞ্চরঃ।"

৬ষ্ঠ সূত্র—"আধ্যাত্মমধিভূতমধিদৈবম্।"

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই মূল গ্রন্থ "তত্ত্বসমাসের" প্রপঞ্চন বা বিবিধ ব্যাখ্যানই সাংখ্যদর্শনের প্রচলিত গ্রন্থ, এবং এইজন্যই সাংখ্যদর্শনের অপর নাম সাংখ্য-প্রবচন। বিজ্ঞানভিক্ষু বিরচিত "সাংখ্য-প্রবচনসূত্রই" ষড়ধ্যায়ী "সাংখ্য-প্রবচন দর্শন" বলিয়া বিখ্যাত; কিন্তু ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত "সাংখ্যকারিকার" তুলনায় ইহা আধুনিক গ্রন্থ। স্বরচিত গ্রন্থ সম্বন্ধে বিজ্ঞানভিক্ষু লিখিয়াছেন—

"কালার্কভক্ষিতং সাংখ্য-শাস্ত্রং জ্ঞানসুধাকরম্।
কলাবশিষ্টং ভূয়োঽপি পূরয়িষ্যে বচোঽমৃতৈঃ॥"

—জ্ঞানের উৎস যে সাংখ্য-শাস্ত্র তাহা কালকবলিতপ্রায়, এই সাংখ্যকে আমি নিজের কথা দ্বারা পূর্ণ করিব।

ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত "সাংখ্যকারিকা" গ্রন্থই দার্শনিকদিগের মধ্যে সুপরিচিত ও প্রামাণ্য, এবং ইহাই সাংখ্যদর্শন বলিয়া বিখ্যাত। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই "সাংখ্যকারিকা" গ্রন্থই চীন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ঈশ্বরকৃষ্ণ লিখিয়াছেন যে তাঁহার গ্রন্থ পঞ্চশিখাচার্য্যের "ষষ্টিতন্ত্র" নামক গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসারমাত্র, যথা—

"সপ্তত্যা কিল যেঽর্থাস্তেঽর্থাঃ কৃৎস্নস্য ষষ্টিতন্ত্রস্য।
আখ্যায়িকাবিরহিতাঃ পরবাদবিবর্জ্জিতাশ্চাপি ॥"

—সাংখ্যকারিকা, ৭২শ সূত্র।

—পঞ্চশিখাচার্য্য প্রণীত ষষ্টিতন্ত্রে যে সমুদয় বিষয় আলোচিত হইয়াছে কারিকায় (১ম সূত্র হইতে ৭০শ সূত্র পর্য্যন্ত) সেই সমুদয় বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে; পরমত খণ্ডন বা আখ্যায়িকা ভাগ, যাহা ষষ্টিতন্ত্রে আছে, কারিকায় তাহা বিবর্জ্জিত হইয়াছে।

এই বিরাট গ্রন্থ ষষ্টিতন্ত্র এখন লুপ্ত। ষাট অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া পঞ্চশিখাচার্য্য এই গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছিলেন "ষষ্টিতন্ত্র"। "রাজবার্ত্তিকে" উক্ত হইয়াছে—

"প্রধানাস্তিত্বমেকত্বমর্থবত্ত্বমথান্যতা।
পরার্থ্যঞ্চ তথানৈক্যং বিয়োগো যোগ এব চ ॥
শেষ-বৃত্তিরকর্ত্তৃত্বং মৌলিকার্থাঃ স্মৃতা দশ।
বিপর্য্যয়ঃ পঞ্চবিধস্তথোক্তা নব তুষ্টয়ঃ ॥
করণানামসামর্থ্য-মষ্টাবিংশতিধা মতং।
ইতি ষষ্টিঃ পদার্থানামষ্টাভিঃ সহ সিদ্ধিভিরিতি ॥"

দশটি প্রধান বা মৌলিক পদার্থ[১] সম্বন্ধে দশ অধ্যায়; পাঁচ প্রকার

১। মৌলিক পদার্থ দশটি যথা, ১ম—প্রকৃতি ও পুরুষের অস্তিত্ব; ২য়—প্রকৃতির একত্ব; ৩য়—প্রীতি, অপ্রীতি, বিষাদাত্মক ও ত্রিগুণাত্মক জগৎ ইত্যাদি বলিয়া অর্থবত্ত্ব; ৪র্থ—নানাবিধ উপায়ের দ্বারা আত্মার কার্য্য করিতেছে বলিয়া পরার্থত্ব; ৫ম—ত্রিগুণ অবিবেকী ও বিষয়াত্মক বলিয়া ইহার অন্যত্ব অর্থাৎ পুরুষ হইতে অভিন্ন; ৬ষ্ঠ—জন্ম মরণ ও ইন্দ্রিয়ের বিফলতা হেতু পুরুষ এক নহে বহু; ৭ম—পুরুষ দেখিতে পাইবে এবং

বিপর্য্যায় বা মিথ্যা-জ্ঞান [১] সম্বন্ধে পাঁচ অধ্যায় ; নবম তুষ্টি [২] সম্বন্ধে নয় অধ্যায় ; বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের অপূর্ণতা হেতু অষ্টাবিংশ আশক্তি [৩] সম্বন্ধে অষ্টাবিংশ অধ্যায় এবং পুরুষার্থ প্রয়োজক অষ্টসিদ্ধি [৪] সম্বন্ধে আট অধ্যায়—এই সর্ব্বসমেত ষাট পদার্থ সম্বন্ধে ষাট অধ্যায়। বিপর্য্যায়

দেখিয়া মুক্ত হইবে বলিয়া এবং প্রকৃতিরও সেই অভিপ্রায়ে পরস্পরের যোগ ; ৮ম—পুরুষ চরিতার্থ হইলে শরীর হইতে তাহার বিচ্ছেদ সম্পাদিত হয় বলিয়া প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে বিয়োগ ; ৯ম—চক্রভ্রমণবৎ পূর্ব্ব-বেগ বশে শরীরের স্থিতি ; ১০ম—প্রকৃতির বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পুরুষের অকর্ত্তৃত্ব।

১। পাঁচটি বিপর্য্যয়, যথা—তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্রঃ, অন্ধতামিস্রঃ। ইহাদের অন্য সংজ্ঞা—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও ভয়। ইহাদের মূলে অবিদ্যা ; অবিদ্যা ক্ষেত্র, মোহাদি ক্ষেত্রের ফসল।

২। তুষ্টি নয়টি, যথা—আধ্যাত্মিক তুষ্টি চারটি—প্রকৃতি, উপাদান, কাল ও ভাগ্য। পাঁচটি বাহ্য তুষ্টি, ইহারা ধনোপার্জ্জনাদি দোষজাত। তুষ্টি অর্থে 'এতেই হ'বে আর আবশ্যক নাই' এইরূপ ভাব ; বিজ্ঞান পথে ইহারা বাধা স্বরূপ, ইহারা মোক্ষেরও অনুকূল নহে, নিশ্চেষ্ট ভাবই তুষ্টি, ইহা বিবেক বিরোধী।

৩। আশক্তি আটাশটি, যথা—আট প্রকার সিদ্ধির অভাব ও নয় প্রকার তুষ্টি জ্ঞানের অনুকূল নহে বলিয়া এই সাতরটি বুদ্ধিবধ, অর্থাৎ বুদ্ধির অসামর্থ বা অপূর্ণতা রূপ বধের সহিত সহযোগে তৃতীয়া। বাকি এগারটি ইন্দ্রিয়বধ, যথা—বধিরতা, কুষ্ঠ, অন্ধতা, জড়তা, অজিঘ্রতা (ঘ্রাণ লইতে অসক্ত), মূকত্ব, কৌণ্য, পঙ্গুতা, ষণ্ঢ, বিকলাঙ্গ ও মন্দতা *(মনের দোষ)*—সর্ব্বসমেত এই আটাশটি আশক্তি। উক্ত আটাশটি বধকে আশক্তি বলে, অপূর্ণতায়ই ইহাদের স্থিতি।

৪। অষ্ট সিদ্ধি, যথা—পুরুষার্থ অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করিতে হইলে যাহা প্রয়োজন তাহাকেই সিদ্ধি বলে। দুঃখবিঘাত অর্থাৎ দুঃখ নাশের জন্য মুখ্য প্রয়োজন তিনটি ও গৌণ প্রয়োজন পাঁচটি। তত্ত্ব-কথা পাঠ, শ্রবণ, স্বয়ং স্মরণ, এবং তাহা সুহৃদগণের সহিত মনন ও ধ্যান এই পাঁচটি গৌণ সিদ্ধি, এবং ত্রিবিধ দুঃখের বিনাশ এই তিনটি মুখ্য সিদ্ধি।

"ষষ্টিতন্ত্র" কোথায় যে কোন গ্রন্থাগারে কোন পূর্ব্বসূরি বিজ্ঞানাচার্য্যের বংশধরদিগের গৃহে আবর্জ্জনা স্বরূপ রক্ষিত অবস্থায় কীট-দষ্ট হইতেছে তাহা কে বলিবে ? সে যাহা হউক, সাংখ্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির এখন সংক্ষিপ্ত পরিচয় লওয়া যাউক। 'তত্ত্বসমাস', 'ষষ্টিতন্ত্র', 'সাংখ্যকারিকা', গৌড়পাদাচার্য্যের 'সাংখ্যকারিকাভাষ্য', বাচস্পতি মিশ্রের 'সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী', বিজ্ঞানভিক্ষু কৃত 'সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য' ও 'সাংখ্যসার' প্রভৃতি সাংখ্যদর্শনের প্রামাণিক গ্রন্থ। সাংখ্যের ব্যাখ্যা পুস্তকও অনেকগুলি বিদ্যমান, তন্মধ্যে 'তত্ত্বসমাস-দীপিকা', 'তত্ত্বকৌমুদী', 'সাংখ্য-প্রদীপ', 'সাংখ্যতত্ত্বপ্রদীপ', 'পূর্ণিমা', 'আভাস' প্রভৃতিই বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ।

সাংখ্যকার বলেন,—

"অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ।"

—সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ১-১।

ত্রিবিধ দুঃখের সম্পূর্ণ বিরতি বা নিবারণেই জীবের মুক্তি। ত্রিবিধ দুঃখে জীব প্রপীড়িত। ত্রিবিধ দুঃখ যথা—আধ্যাত্মিক,[১] আধিদৈবিক,[২] আধিভৌতিক[৩]। আধ্যাত্মিক দুঃখ দ্বিবিধ—রোগাদি হেতু শারীরিক দুঃখ এবং রিপুদিগের জন্য মানসিক দুঃখ। বজ্র, ভূমিকম্পনাদি দৈব দুর্ঘটনা হইতে যে দুঃখ তাহাকে আধিদৈবিক দুঃখ বলে ও মানুষ হইতে এবং পশু ও স্থাবর জঙ্গম জনিত যে দুঃখ তাহার নাম আধিভৌতিক দুঃখ। এই দুঃখত্রয়ের একান্ত এবং অত্যন্ত নিবৃত্তি বা নিবারণ সকল জীবেরই অভিপ্রেত। দুঃখ নিবারণের যে সমুদয় উপায় অবলম্বিত হয়

১। Bodily and mental.

২। Divine or supernatural.

৩। Natural and extrinsic.

তন্মধ্যে লৌকিক উপায় নিশ্চিত বা সম্যক নহে, কাজেই সাময়িক মাত্র; বৈদিক অর্থাৎ বেদ-বিহিত যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি উপায়ও অবিশুদ্ধ বা মিশ্র, ক্ষয় ও তারতম্য বিদ্যমান হেতু স্থায়ী নহে, কাজেই দোষযুক্ত। সাংখ্যকার বলেন, জ্ঞানই দুঃখনাশের শ্রেষ্ঠ উপায়।

সাংখ্যের দুইটি মূল তত্ত্ব—প্রকৃতি ও পুরুষ। পুরুষ বা জ্ঞ, অর্থাৎ যে জানে—আত্মা, আমি, (জ্ঞা+ড)—ইনি নির্গুণ, নিত্য ও চৈতন্য স্বরূপ। প্র+করোতি=প্রকৃতি, অর্থাৎ বিশ্ব যাঁহার কৃতি তিনিই প্রকৃতি—ইনিই জড়াত্মক সর্ব্ব বাহ্য-জগতের মূল। সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই ত্রিগুণের † সাম্য এবং সাম্য-বিচ্যুতি অবস্থানুসারে প্রকৃতির অব্যক্ত (প্রকৃতির স্বরূপ, নিত্য ও সচেতন) ও ব্যক্ত (প্রকৃতির প্রতীয়মান বাহ্য রূপ) এই দুই আখ্যা। জড় প্রকৃতি ও চিৎ পুরুষ উভয়ই নিষ্ক্রিয়; কিন্তু উভয়ের সান্নিধ্য ও সংযোগ হেতু যে পরিণাম হয় তাহাই ব্যক্ত ও ক্রিয়াশীল, এবং ইহাই সৃষ্টিতত্ত্ব। জ্ঞ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত (অর্থাৎ আমি ছাড়া আর যাহা কিছু, অর্থাৎ প্রকৃতি) এই তিনের বিজ্ঞান হইতেই দুঃখের চরম নিবৃত্তি হয়—ইহাই সাংখ্য মত। "চেতন পুরুষ এবং অচেতন প্রকৃতি পরস্পর সন্নিহিত হইলে যে জ্ঞানরূপ ফল উৎপন্ন হয়, যাহাতে চেতনের আভাস এবং অচেতনের পরিণাম একত্রিত হয় সেই ফলের নাম মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব। ক্ষুদ্রাক্ষুদ্র জ্ঞান-পুষ্পাবলী আমি-রূপ সূত্রের দ্বারা গ্রথিত হইয়া জীবনমাল্যে পরিণত হইয়াছে। জ্ঞানের মূলে অনুভূতি।" সাংখ্যকার প্রকৃষ্ট জ্ঞানের উপদেশ মানসে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন, যথা—

† সত্ত্ব—Goodness, রজঃ—passion, তম—darkness—these are the three constituent elements of nature—প্রকৃতি।

জগতের কারণ (জগৎ বিভক্ত) *

- প্রকৃতি—(Nature) —ইঁহার রূপ দুইটি। + { উভয়ের সংযোগে জ্ঞানের উৎপত্তি—জ্ঞানের মূলে অনুভূতি, অনুভূতিতেই ত্রি-তাপের একান্ত নিবৃত্তি ঘটে। } + পুরুষ—(Soul) ইনি নিত্য চৈতন্য স্বরূপ।
  - অব্যক্ত। (এই রূপই প্রকৃতির স্বরূপ)[১]
  - ব্যক্ত। (প্রকৃতির ব্যক্ত রূপই প্রতীয়মান জগৎ)[২]
    - প্রকৃতি + বিকৃতি। (সাতটি)
      - মহৎ বা বুদ্ধি-তত্ত্ব। (ইহা মূল প্রকৃতির বিকৃতি।)
      - অহঙ্কার। (আমি ইতি জ্ঞান, সাধারণ ভাব।)
      - তন্মাত্র। (কেবল সেই মাত্র অর্থাৎ মূল উপাদান—পাঁচটি, যথা—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, এবং গন্ধ) †
    - বিকার—বিকৃতি। (ষোলটি)
      - ইন্দ্রিয় (এগারটি)
        - জ্ঞানেন্দ্রিয়। (পাঁচটি, যথা—কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা এবং নাসা।) ‡
        - কর্ম্মেন্দ্রিয়। (পাঁচটি, যথা—বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ ; ইহাদের কার্য্য যথাক্রমে—উচ্চারণ, গ্রহণশক্তি বা শিল্প, গমন-সামর্থ বা গতি, উৎসর্গ এবং প্রজনন।)
        - মন। জ্ঞান + কর্ম্ম। (অধিকন্তু মন অন্তরেন্দ্রিয়।)
      - ভূত—স্থূল। (পাঁচটি, যথা—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ বা বায়ু এবং ব্যোম।) §

প্রথম তত্ত্ব—মূল প্রকৃতি, অর্থাৎ অবিকৃত প্রকৃতি, ইনিই অব্যক্ত প্রকৃতি।

দ্বিতীয় হইতে অষ্টম তত্ত্ব—মহৎ অর্থাৎ বুদ্ধি আদি সপ্ত তত্ত্ব, এগুলি প্রকৃতি ও বিকৃতি উভয় ভাবাপন্ন।

নবম হইতে চতুর্বিংশ তত্ত্ব—এগুলি বিকৃতি অর্থাৎ বিকার, সংখ্যায় ষোলটি, এ সকল নিছক বিকৃতি, কাহারও প্রকৃতি নহে।

পঞ্চবিংশ তত্ত্ব—পুরুষ বা জ্ঞ, ইনি কাহারও প্রকৃতি অর্থাৎ মূল নন, কাহারও বিকৃতিও নন, ইনি নিত্য চৈতন্য স্বরূপ।

Rf. 'তত্ত্ব-অবতারণিকা' পৃষ্ঠা—২১।

* সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব।

১। Eternal & Self-existing.

২। Product of Primordial Matter hence The Material World

† পঞ্চ তন্মাত্র স্পন্দন মাত্র, যথা—রূপ রূপই, যাহা কেবলমাত্র রূপ তাহাই রূপ তন্মাত্র; মূল রূপ একটি স্পন্দন মাত্র; রূপ নীল, পীত, লোহিতাদি নানারূপ হইতে পারে—বস্তুতঃ বহুবিধ স্পন্দনের একত্রীভূত সংখ্যা অনুসারে রূপ কখনও নীলবর্ণ কখনও পীতবর্ণ, কখনও লোহিতবর্ণ।

‡ ইহারা পঞ্চ-তন্মাত্র শব্দাদি গ্রাহী।

§ পঞ্চ ভূত সহজ অর্থে গন্ধাদির কারণ, কিন্তু ইহারা সংজ্ঞা মাত্র, যথা—যে ভূতের কারণ শব্দ তন্মাত্র, অর্থাৎ যে ভূত হইতে শব্দ আমাদের দ্বারা অনুভূত হয় তাহা আকাশ ভূত বা ব্যোম। আকাশ শুধু 'ঈথার' (ether) নহে। ব্যোম প্রভৃতি পঞ্চভূত, মন প্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয়, গন্ধ ইত্যাদি পঞ্চ তন্মাত্র এই সকলগুলি ও অহঙ্কার, ইহারা প্রত্যেকটিই যথাক্রমে একটি পূর্ব্ববর্ত্তীটির প্রকৃতি কারণ। প্রকৃতির প্রকৃতি-বিকৃতি বিকার এমনই ভাবে পরম্পরা-সম্বন্ধে জগৎ-প্রপঞ্চে যোগসূত্রে অভিব্যক্ত।

ইন্দ্রিয়ের অপর নাম "করণ" ।*

সাংখ্য মতে ত্রিবিধ অন্তঃকরণ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন, সমস্ত বিষয় উপলব্ধি করিবার মূল কারণ এবং দশটি বাহ্য ইন্দ্রিয় ইহাদেরই দ্বার স্বরূপ।

এই ত্রয়োদশ কারণ পরস্পর বিভিন্ন, ইহারা ত্রিগুণ হইতে জাত অথচ প্রদীপের ন্যায় বিষয় সকল প্রকাশ করে। ইহারা পুরুষের জন্যই বিষয় সকল প্রকাশ করিয়া বুদ্ধিতে প্রেরণ করে এবং ইহারা বুদ্ধিস্থ হইলেই পুরুষের তাহা উপলব্ধি হয়।

যে বুদ্ধি হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থ পুরুষ উপলব্ধি করেন, সেই বুদ্ধি হইতেই আবার মূল প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে যে সূক্ষ্ম প্রভেদ তাহা অবগত হইতে পারা যায়।

এই অবগত হওয়ার নাম "বিবেক খ্যাতি" বা "বিজ্ঞান"।

এই বিজ্ঞান আসিলে আমাদের প্রকৃতিজ 'অহং জ্ঞান' বিদূরিত হয়, প্রকৃতির সহিত পুরুষের বন্ধন ঘুচিয়া যায়, পুরুষ মুক্ত হন।

সাংখ্যকার বলেন—"পঙ্গ্বন্ধবৎ উভয়োরপি সংযোগঃ তৎকৃতঃ সর্গঃ।"

—সাংখ্যকারিকা, ২১শ সূত্রার্দ্ধ।

—অর্থাৎ, ক্রিয়াশীল চক্ষুহীন অন্ধের সহিত চক্ষুষ্মান্ অথচ ক্রিয়াশূন্য পঙ্গুর সংযোগের ন্যায় প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ। প্রকৃতি অন্ধ, পুরুষ পঙ্গু, উভয়ের সংযোগের ফলে সৃষ্টি ঘটে, অর্থাৎ অব্যক্ত ব্যক্তে পরিণত হয়।

এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক, 'ঈশ্বর' শব্দ তত্ত্বসমাস বা সাংখ্যকরিকায়—কোথায়ও ব্যবহৃত হয় নাই। "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ"—

* "করণং সাধকতমং ক্ষেত্রগাত্রেন্দ্রিয়েষ্বপি।"

সাংখ্যপ্রবচন, ১।৯২ সূত্র, বা "প্রমাণাভাবান্নতৎসিদ্ধিঃ"—ঐ, ৫।১০ প্রভৃতি সূত্রগুলি বিজ্ঞানভিক্ষু প্রণীত একমাত্র সাংখ্যপ্রবচন-সূত্রেই পাওয়া যায়। অতএব ঈশ্বর আছেন কি নাই অথবা ঈশ্বরকে সিদ্ধ করিবার কোন প্রমাণ আছে বা নাই প্রভৃতি অজ্ঞেয়বাদ প্রবর্ত্তিত তর্কজাল বিস্তারের কোনই যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উপরন্তু বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ, তন্ত্রের শিবশক্তি, রামানুজাচার্য্য প্রদর্শিত বেদান্তের সোপান, সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি-পুরুষের উপরই প্রতিষ্ঠিত। † শ্রীমদ্ভগবতগীতায়ও এ বিষয়ের বেশ সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। গীতা বলেন, সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ও পুরুষ ভগবানের দুইটি বিভাব (aspect)—অপরা ও পরা; অপরা সাংখ্যোক্ত প্রধান বা মূল প্রকৃতি এবং পরা সাংখ্যোক্ত পুরুষ। অপিচ, জ্ঞানীরা যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, যোগীরা তাঁহাকেই পরমাত্মা বলেন, আর ভক্তেরা তাঁহাকেই ভগবান বলেন। ‡ অতএব ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবান লইয়া বাক বিতণ্ডা করার কোনই আবশ্যকতা নাই। ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মের স্বরূপ, তাঁহার শক্তি ও মহিমার কথা, ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপকতা, তাঁহার নিগু'ণত্ব ও নিস্ক্রিয়ত্ব বেদ উপনিষদ প্রভৃতি শ্রুতিতে বেশ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল বুঝিতে হইলে চাই জ্ঞান, চাই সাধনা—আর মানবের পক্ষে নিজের স্বরূপ বুঝিতে শিক্ষা করাই তাহার পক্ষে প্রথম ও শ্রেষ্ঠ সাধনা। সাংখ্যকার সেই পরমার্থতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব উপদেশ

† *Cf.* "এতাবদ্ বা ইদম্ সর্ব্বম্। অন্নং চৈবান্নাদশ্চ।"—বৃহদারণ্যক, ১।৪।৬—অন্ন ও অন্নাদ, এই উভয় মিলিয়াই সমস্ত জগৎ।

‡ *Cf.* "ত্বামামনন্তি প্রকৃতিং পুরুষার্থ প্রবর্ত্তিনীম্।
তদ্দর্শিনমুদাসীনং ত্বামেব পুরুষং বিদুঃ॥"
—"কুমারসম্ভব", ২য় সর্গ—১৩শ শ্লোক, কালিদাস।

করিয়াছেন, যে জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে মানুষ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে পারে ও ব্রহ্মনির্ব্বাণ অর্থাৎ মোক্ষ† পায়।

প্রকৃতি ও পুরুষ সম্বন্ধে আরও একটু বিশেষ জ্ঞান সাংখ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক এবং পুরুষ নির্গুণ। পুরুষ কোন কারণ হইতে উদ্ভূত হন না, এবং পুরুষ হইতেও কোন কিছুরই উদ্ভব হয় না। প্রকৃতির রজঃ, সত্ত্ব ও তম গুণ দ্বারা যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধিত হয়। সৃষ্টি অর্থে আবির্ভাব ও প্রলয় অর্থে তিরোভাব বুঝায়। প্রকৃতির স্থূল ক্রিয়া দ্বারা যখন জগৎ স্থূল রূপ ধারণ করে তখনই প্রকৃতির আবির্ভাব এবং যখন প্রকৃতির সূক্ষ্মক্রিয়া দ্বারা জগৎ সূক্ষ্ম ভাবাপন্ন হয় তখনই প্রকৃতির তিরোভাব হয়। বস্তুতঃ প্রকৃতির বিনাশ নাই। সৃষ্টির প্রবৃত্তি ও ভোগের উপাদান প্রকৃতিতে বিদ্যমান এবং পুরুষের সংযোগে প্রকৃতির সৃষ্টি ও ভোগ হইয়া থাকে—প্রকৃতিই ভোক্ত্রী ও কর্ত্রী, পুরুষ ভোক্তাও নন কর্ত্তাও নন—প্রকৃতিতে সংযোগ বশতঃ পুরুষ কর্ম্মারূপে প্রতীয়মান হন—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মানি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"—গীতা, ৩।২৭ শ্লোক।

[কর্ম্মানি সর্ব্বশঃ (সমস্ত কর্ম্মই) প্রকৃতেঃ গুণৈঃ (প্রকৃতির গুণের দ্বারা, অর্থাৎ মনোবুদ্ধি সমন্বিত ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত সত্ত্বাদি গুণবিশিষ্ট এই বিশ্ব প্রকৃতির দ্বারাই) ক্রিয়মানানি (সম্পাদিত হইতেছে)—(তথাপি) অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা (অহঙ্কার-বিমূঢ় মানুষ) মন্যতে অহম্ কর্ত্তা ইতি (মনে

† Prof. Max Muller "ব্রহ্মনির্ব্বাণের" অর্থ করিয়াছেন, "The entire absorption of individuality, ইহাই মোক্ষ—final emancipation of the soul.

করে আমিই কর্ত্তা)]—এই অহঙ্কার-বিমূঢ় ভাবই যত দুঃখের মূল। জীব যখন এই 'অহং' ভাব ত্যাগ করিয়া জ্ঞানের আশ্রয়ে নিজ স্বরূপ জানিতে পারে তখনই প্রকৃতির গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা আ'সে—প্রকৃতি নিষ্ক্রিয় হন।

জীব নিঃসঙ্গ, নিষ্ক্রিয় ও নিগুর্ণ হইলেও অদৃষ্ট বশতঃ অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া নিজেই নিজের দুঃখের বীজ রোপন করে। কর্ম্মফল হইতে অদৃষ্টের উৎপত্তি। সাংখ্যকার বলেন, সৃষ্টি অনাদি বলিয়াই কর্ম্মের প্রথম নাই এবং জীবের অদৃষ্টও অনাদি। তবে কর্ম্ম অনাদি হইলেও কর্ম্মফল শান্ত, তাহার ধ্বংস সম্ভবপর। জ্ঞানই কর্ম্ম ধ্বংস করে ; অর্থাৎ, জ্ঞানলাভ হইলেই কর্ম্মের অবসান হয় বা জ্ঞানের অভ্যুদয়ে কর্ম্মের পরিসমাপ্তি এবং কর্ম্মফলের অবসানে পুরুষের মুক্তি। "জ্ঞানাৎ মুক্তি"—নিজের স্বরূপ বোধই এই জ্ঞান। প্রকৃতিই সমস্ত ভোগের আধার ও বোধক এবং পুরুষ সমস্ত ভোগ হইতে পৃথক এইরূপ জ্ঞান দ্বারা নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারিলেই জীব কর্ম্মবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পায়, কর্ম্মের বন্ধনে আর তাহাকে আবদ্ধ হইতে হয় না—জীব মুক্তি পায়। ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধানবিনিবৃত্তৌ ;
ঐকান্তিকমাত্যন্তিকমুভয়ং কৈবল্যমাপ্নোতি ॥"

—সাংখ্যকারিকা, ৬৮ম সূত্র।

—প্রকৃতির দুই প্রয়োজন (ভোগ এবং বিবেকরূপ যে পুরুষার্থ তাহার চরিতার্থতা, এই দুইটি) সিদ্ধ হইলে প্রকৃতি নিজেই সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হন এবং ভোগায়ত দেহেরও আর আবশ্যক থাকে না—পুরুষ তখন সম্পূর্ণরূপে নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকেন। ব্যক্ত-প্রকৃতি হইতে 'জ্ঞ' ভিন্ন হইয়া যান, আর ত্রিতাপ 'জ্ঞ'কে স্পর্শ করিতে পারে না। এই অবস্থার নাম

কৈবল্য বা মুক্তি। ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং 'জ্ঞ'-বিজ্ঞান (অর্থাৎ, রহস্য পরিপূর্ণ এই পরম পুরুষার্থের বা দুঃখ-নিবৃত্তির জ্ঞান) হইতে মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে, ইহাই সাংখ্যের মূলতত্ত্ব।

সাংখ্য দর্শনে বর্ণিত জ্ঞানকে 'গুহ্যম্' অর্থাৎ রহস্য পরিপূর্ণ বলা হইয়াছে, তাহার কারণ—

"স্থিত্যুৎপত্তিপ্রলযাশ্চিন্ত্যন্তে যত্র ভূতানাম্।"

—সাংখ্যকারিকা, ৬৯ম সূত্রার্দ্ধ।

—অর্থাৎ এই জ্ঞানলাভের নিমিত্ত ভূত সকল কি ভাবে আদি কারণে স্থিত ছিল, কি ভাবে তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে, আবার কি ভাবে তাহারা আদি কারণে মিশিয়া যাইবে এই সমুদয় চিন্তা করিতে হয়। গীতায় শ্রীভগবান এই রহস্যপূর্ণ তত্ত্বেরই উপদেশ করিয়াছেন, যথা—

"ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্॥"

—গীতা, ১৩।৩৫শ শ্লোক।

—যাঁহারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের (প্রকৃতি ও পুরুষের) এই প্রকার প্রভেদ (এবং—মদুক্তবিষয়ান্তরং ভেদম্) এবং জীব প্রকৃতি হইতে অব্যাহতি বা মোক্ষলাভের উপায়, জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা জানিতে পারেন, তাঁহারা ব্রহ্মলাভ করেন, অর্থাৎ মুক্তি পান।

"ওঁ নমঃ বাসুদেবায়।"

পাতঞ্জলদর্শন

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥"

—ব্রহ্মোপনিষদ্, ২৯শ সূত্র।

—ব্রহ্মোপনিষদ্ বলিতেছেন, এক অনির্ব্বচনীয় দিব্য পদার্থ সর্ব্বজীবে গূঢ়ভাবে (কাষ্ঠে অগ্নির ন্যায়) অবস্থান করিতেছেন। তিনি সর্ব্বব্যাপক, নিখিল জীবের অন্তরাত্মা, সর্ব্বকর্ম্মের অধ্যক্ষ ও সর্ব্বভূতের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ। তিনি সাক্ষাৎ দর্শন করেন—কোন ইন্দ্রিয় সাহায্যই তাঁহার প্রয়োজন হয় না, তিনি চিন্ময়, অদ্বিতীয় ও গুণাতীত—যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়, যাঁহার প্রসাদে দিব্যদৃষ্টি লাভ করা যায় এবং যিনি মৃত্যুকবল হইতে পরিত্রাণ করেন, তাঁহাকে স্তুতি করি।

দর্শনে এই দিব্য-পদার্থের অবতারণা করিয়াছেন পতঞ্জলি মুনি। ভগবান পতঞ্জলি মহামুনি কপিল প্রবর্ত্তিত সাংখ্যমত স্বীকার করিয়া সাংখ্যোক্ত পদার্থ-নির্ণয়-তত্ত্বের উপর আরও একটি দিব্যপদার্থ অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্বের অবতারণা করিয়া অমূল্য যোগরত্ন উপদেশ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত পাতঞ্জলদর্শনের অপর আর এক নাম সেশ্বর-সাংখ্য।

পাতঞ্জলদর্শনে তর্ক নাই, যুক্তি নাই, বিচার নাই, আছে যোগের † কথা, সাধনা ও সিদ্ধির কথা, শুধুই কাজের কথা। কাজ করিলেই যোগতত্ত্ব আয়ত্ত করিতে পারা যায়—কথার পর কথা গাঁথিয়া বা পাহাড় প্রমাণ তর্কের জাল বুনিয়া তুলিলেও যোগতত্ত্বের বিন্দু বিসর্গও বুঝিতে পারা যায় না—মানুষ ত্রিবিধ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না।

এখানে একটি কথার উল্লেখ করা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। যোগ সাধন অতীব দুরূহ ব্যাপার, যৌগিক ক্রিয়া মহা কষ্টসাধ্য, যোগ-অভ্যাস বড়ই কঠিন, এমনই সব ভ্রান্ত ধারণা সাধারণতঃ আমরা সকলেই মনে মনে পোষণ করি। কিন্তু, যথার্থ বলিতে গেলে, আমরা সকলেই প্রায় অল্পবিস্তর যোগী ; হাসির কথা নয়, দুই একটি সামান্য সামান্য দৈনিক ঘটনা হইতে উদাহরণ প্রদত্ত হইল—

১ম। কোন একটি বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের সাম্বাৎসরিক মিলনোৎসবে যোগদান করিয়া রসার্ণব চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর রঙ্গকৌতুক দেখিতেছিলাম, সে আজ অনেক দিনের কথা। আমার পার্শ্বেই একটি আট নয় বৎসরের বালক বসিয়াছিল, সে হঠাৎ আমাকে বলিল 'আচ্ছা লোকে এত হাসিতেছে কেন।' আমি অবশ্য তাহাকে সাধারণ উত্তরই দিলাম। সে বলিল 'না হাসিয়া কি থাকা যায় না'—আমার কৌতুহল হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কি না হাসিয়া থাকিতে পার ?' সে সহজ ভাবেই বলিল 'হাঁ পারি।' আমি বলিলাম 'আচ্ছা না হাসিয়া চুপটি করিয়া বসিয়া থাক ত দেখি।' আশ্চর্য্য, বালকটি প্রায় আধ ঘণ্টা কাল চুপটি করিয়া বসিয়া রহিল, সকলেই হাসিতেছিল সে মোটেই হাসিল না—সে 'হাসিব

† যুজ্‌ ধাতু + ঘঙ্‌ = যোগ, "যুজির্‌ সমাধৌ"—'addition' নহে।

না' বলিয়া হাসিল না। বালকটি অবশ্য জানিল না যে সে যোগতন্ত্রের এক অঙ্গ আয়ত্ব করিয়াছে, যোগের কথায় বলিতে গেলে তাহা অনেকটা—

"বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্।"

—পাতঞ্জল, ২য় পাদ ৩৩ সূত্র।

—বিতর্ক বুদ্ধি (যোগের শত্রু তামস মনোবৃত্তি—হিংসাদি) তন্নিবারক বৃত্তি উত্তেজিত করিলেই বিনষ্ট হয়। যাহা হউক আমি আশ্চর্য্য হইলাম।

২য়। তপস্যা যোগের একটি অঙ্গ; "ছাত্রানাম্ অধ্যয়নং তপঃ"—কোন ছাত্র একদা একমনে পড়িতেছিল; তাহার হাতের কাছে একটি ছোট্ট ঘড়ি ছিল ও সে পড়িতে পড়িতে খেয়াল বশতঃ ঘড়িটিকে হাতে লইয়া আস্তে আস্তে ঠুকিতেছিল। ছাত্রটি এক মনেই পড়িতেছিল, কিন্তু কখন যে ইতিমধ্যে ঘড়িটির কাচ ও কাঁটা ভাঙ্গিয়া গিয়া তাহার হাতে বিঁধিয়া গিয়াছিল ও তাহার হাত হইতে রক্তক্ষরণ হইতেছিল তাহা সে মোটেই লক্ষ্য করে নাই বা বুঝিতে পারে নাই। বাহ্য-বস্তুর জ্ঞান তাহার ফিরিয়া আসিল তখন, যখন তাহার সহোদর ভ্রাতা, কাণ্ড দেখিয়া, অবাক হইয়া, সে বিষয়ে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল!

উক্ত উদাহরণগুলির মত আরও অনেক দৃষ্টান্ত বোধ হয় অনেকেরই জানা থাকিতে পারে। চিকিৎসক যখন তাহার রোগীকে 'chloroform' দিয়া অস্ত্রোপচার করেন তখন তিনি কি যোগের প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন না? আবার, পাশা খেলিতে খেলিতে সময়ে সময়ে খেলোয়াড় এমনই তন্ময় হইয়া যায়, যখন, তাহারই পুত্রের সর্পাঘাতের দুঃসংবাদ শুনিয়া তাহাকে বলিতে শুনা গিয়াছে 'কা'দের সাপ'! 'কচে বার' বা 'ঘুটির চালে' তাহার মন এমনই 'মসগুল্' ছিল যে সম্পূর্ণভাবে অন্যমনস্ক

অবস্থায়, একান্ত অসম্ভব হইলেও, সে সাপটির মালিকের সংবাদই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। খেলোয়াড়টির এ'হেন অবস্থার কিছু প্রশংসা করা চলে না, কিন্তু এ অবস্থা যে তাহার যোগের অবস্থা তাহা ত অস্বীকার করা যায় না। তা'ই বলিতে হয়, যোগ-সাধন সহজ-সাধ্য না হইলেও, যোগতত্ত্ব যে আজগুবি বা অসম্ভব কিছু, তা' মোটেই নয়।

পাতঞ্জলদর্শনের আরও একটি নাম সাংখ্য-প্রবচন। তাহার কারণ মহর্ষি পতঞ্জলি সাংখ্য-প্রবর্ত্তীত পঞ্চ-বিংশতিতত্ত্ব (যথা—পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত) স্বীকার করিয়াছেন এবং আরও একটি অধিক তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। সেই তত্ত্বটিই ঈশ্বর-তত্ত্ব।

"অথ প্রধান পুরুষব্যতিরিক্তঃ কোঽয়ং ঈশ্বরোনাম।"

—পাতঞ্জলদর্শনের 'ব্যাসভাষ্যে' ঈশ্বর প্রসঙ্গে এইরূপ উক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র এই যে ঈশ্বর, তিনি কে? ভগবান পতঞ্জলি বলিলেন, ঈশ্বর "পুরুষ বিশেষ"[১]। সাংখ্যোক্ত পুরুষ (জীব) যেমন বহু, পুরুষ-বিশেষ (ঈশ্বর) সেরূপ বহু নহেন, তিনি এক ও অদ্বিতীয়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে পাতঞ্জল দর্শনের অপর এক নাম সেশ্বর-সাংখ্য। মহর্ষি কপিল প্রবর্ত্তিত সাংখ্যদর্শনে দুইটি মূল তত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে, প্রকৃতি ও পুরুষ; প্রকৃতি জড়াত্মক, সর্ব্ব বাহ্য জগতের মূল এবং পুরুষ নির্গুণ, নিত্য ও চৈতন্য স্বরূপ—এবং এতদুভয়ের সান্নিধ্য হেতু জীব-জগতের সৃষ্টি; ইহাদের সান্নিধ্য ঘটে

১। "পুরি (আত্মনি) শেতে যঃ স পুরুষঃ"—যিনি আত্মাতে অবস্থান করেন তিনিই পুরুষ।

অদৃষ্ট বশতঃ। মহর্ষি পতঞ্জলি এ বিষয়ে আরও একটু আলোক দেখাইয়া বলিলেন, অদৃষ্ট কিছু প্রকৃতিকে চালিত করিতে পারে না, কারণ উভয়ই জড়াত্মক ;—কাজেই এই অদৃষ্টের যিনি পরিচালক তিনিই ঈশ্বর।

ঈশ্বর-তত্ত্ব বিষয়ক প্রস্তাবটি আরও একটু পরিষ্কার করিয়া মহর্ষি পতঞ্জলি বলিলেন, যেমন স্ফটিক জবা পুষ্পের সান্নিধ্য-হেতু রক্তবর্ণ ধারণ করে, নিঃসঙ্গ পুরুষও তদ্রূপ অদৃষ্ট বশতঃ প্রকৃতির সান্নিধ্য-হেতু [illegible] ও ভোক্তৃরূপে প্রতীয়মান হন। অদৃষ্ট শান্ত, ঈশ্বরই এই অদৃষ্টের [illegible]শ সাধন করেন, এবং প্রকৃতি ও পুরুষ আবার স্বস্বরূপে অবস্থান করে[illegible] আমরা জগতে পরিমাণের তারতম্য বা উৎকর্ষ অপকর্ষ হিসাবে অনে[illegible] কিছু দেখিতে পাই, উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর বহু বিষয় লক্ষ্য করি— যাঁহাতে সর্ব্বতত্ত্ব-বীজ নিত্যই চরমোৎকর্ষ বা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহাকেই ঈশ্বর নামে অভিহিত করিয়াছেন। ঈশ্বরত[illegible] ও তাহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

"ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাকাশয়ৈ-রপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥
"তত্র নিরাতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্ ॥
"পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥
"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।"

—পাতঞ্জল, ১ম পাদ, ২৪শ-২৭শ সূত্র।

—ক্লেশ[১], কর্ম্ম বিপাক[২] ও আশয়[৩] যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, যিনি

১। ক্লেশ পঞ্চবিধ, যথা—অবিদ্যা (মিথ্যা জ্ঞান), অস্মিতা (বিভিন্ন বস্তুতে অভেদ প্রতীতি), রাগ (অনুরাগ), দ্বেষ (বিরাগ), ও অভিনিবেশ (মরণ ভয়)।

২। বিপাক অর্থে ত্রিবিধ কর্ম্মফল অর্থাৎ পরিণাম বুঝায়। জন্ম হেতু, আয়ু হেতু, ও ভোগ হেতু—এই ত্রিবিধ কর্ম্মফল।

৩। আশয় অর্থে ইচ্ছা বা বাসনা বুঝায়।

পুরুষ-বিশেষ অর্থাৎ যাবতীয় সংসারী-আত্মা ও মুক্তাত্মা হইতে যিনি পৃথক বা স্বতন্ত্র, তিনিই ঈশ্বর। তাঁহার নিরতিশয় জ্ঞান থাকায়, অর্থাৎ তাঁহাতে জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ বিদ্যমান-হেতু, তিনি সর্ব্বজ্ঞ (omniscient)। তিনি ব্রহ্মাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণেরও গুরু অর্থাৎ উপদেষ্টা; কারণ কালের দ্বারা তিনি অনবচ্ছিন্ন (eternal & primeval) অর্থাৎ তিনি কালের অতীত, সর্ব্বকালেই তাঁহার অস্তিত্ব বিদ্যমান—তিনি এক, অনাদি ও নিত্যমুক্ত। তাঁহার বোধক-শব্দ বা প্রকাশক (indicating syllable) প্রণব অর্থাৎ ওঁকার।

পাতঞ্জলদর্শনের "ব্যাসভাষ্য" নামে বেদব্যাস বিরচিত একখানি অতীব প্রাচীন ভাষ্য প্রচলিত আছে, এবং বাচস্পতি মিশ্রের "তত্ত্ববৈশারদী" ও বিজ্ঞানভিক্ষুর "যোগবার্ত্তিক" এই ব্যাসভাষ্যেরই টীকা। ইহা ব্যতীত ভোজরাজকৃত একখানি উপাদেয় পাতঞ্জলদর্শনের বৃত্তিও প্রচলিত আছে। বিজ্ঞানভিক্ষু রচিত "যোগবার্ত্তিক" ব্যতীত তাঁহার প্রণীত "যোগসার-সংগ্রহ" ও পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত "পদবোধিনী বৃত্তি" নামে পাতঞ্জলদর্শনের আরও দুইখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আছে।

মহর্ষি পতঞ্জলি স্বীয় দর্শন ১৯৪ সূত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ও সেগুলি চারিটি পাদ বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—'সমাধি-পাদ'[১], 'সাধন-পাদ'—(ক্রিয়াযোগাদি সাধন-প্রকরণ), 'বিভূতি-পাদ' (ধ্যান ধারণাদি বিভূতি-বিবরণ) ও 'কৈবল্য-পাদ'[২]। তিনি সাংখ্যোক্ত

১। 'সমাধি পাদ' অনেক স্থলে 'যোগ-পাদ' নামে উল্লিখিত আছে, কারণ যোগই পাতঞ্জলদর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। যোগের লক্ষণাদি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

২। কৈবল্য পাদে সিদ্ধি পঞ্চক নিরূপণ, বিজ্ঞানবাদ নিরাকরণ, সাকারবাদ সংস্থাপন ও কৈবল্য বিবৃত হইয়াছে।

পঞ্চবিংশতত্ত্ব ও ঈশ্বর-তত্ত্ব এই ষড়্‌বিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ সকল তত্ত্ব গৌণভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন মাত্র, আলোচনা করেন নাই। যোগই পাতঞ্জলদর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

যোগশাস্ত্রের চারি পর্ব্ব বা অধ্যায়, যথা—হেয়, হেয়-হেতু, হান ও হানোপায়।[১] অন্যান্য দর্শনের ন্যায় পাতঞ্জলদর্শনেরও মতে সংসার দুঃখময়, অতএব হেয়। এই হেয় সংসারের নিদান বা হেতু কি? প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ জন্য এই সংসারের তথা জীবের ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি অর্থাৎ উচ্ছেদ সাধিত হইতে পারে—ইহারই নাম হান। এই হানের উপায় কি? প্রকৃতি ও পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান। পাতঞ্জল মতে এই ভেদজ্ঞান লাভ করাই মোক্ষ লাভের একমাত্র উপায়। ভগবান পতঞ্জলি বলিলেন, শুধুই তত্ত্ব সমূহের সহিত পরিচিত হইলেই এই ভেদজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় না—এই পরম-জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় যোগ। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে তাই প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে—

"অথ যোগানুশাসনম্ ॥"

"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥"

—পাতঞ্জল, ১ম পাদ ১ম ও ২য় সূত্র।

১। "যথা চিকিৎসাশাস্ত্রং চতুর্ব্যূহং রোগঃ রোগহেতুঃ, আরোগ্যং ভৈষজ্যমিতি এবমিদমপি শাস্ত্রং চতুর্ব্যূহমেব, তদ্ যথা সংসারঃ, সংসারহেতুঃ, মোক্ষঃ, মোক্ষোপায় ইতি।" —পাতঞ্জল, ২য়—১৫শ সূত্রের ব্যাসভাষ্য। অর্থাৎ যেমন চিকিৎসা শাস্ত্র—রোগ, নিদান, আরোগ্য ও ঔষধ—এই চারি অধ্যায়ে বিভক্ত, সেইরূপ যোগশাস্ত্রও চারি অধ্যায়ে বিভক্ত, যথা—সংসার (দুঃখ বহুল তাই হেয়), সংসারহেতু (প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ হেয়হেতু), মুক্তি (উক্ত সংযোগের অত্যন্ত নিবৃত্তি—হান) ও মুক্তির উপায় (হানোপায়—সম্যগ্‌দর্শন)।

—যোগের অনুশাসন (উপদেশের পুনরুপদেশ) বিবৃত করা যাইতেছে, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতির উপদিষ্ট যোগ-শিক্ষা পুনরায় আরম্ভ করা যাইতেছে। মনের বৃত্তি সমূহকে (functions of the mind) একান্ত ভাবে রুদ্ধ করার নাম যোগ; অর্থাৎ, মনোবৃত্তিকে বহির্মুখ (retrospective) হইতে অন্তর্মুখীন (introspective) করাই যোগ। মনের পাঁচ প্রকার বৃত্তি (অবস্থা) বর্ত্তমান, যথা—ক্ষিপ্ততা, মূঢ়তা, বিক্ষিপ্ত, একাগ্রতা ও নিরুদ্ধতা। ক্ষিপ্ত ও মূঢ় চিত্তে যোগ অসম্ভব; বিক্ষিপ্ত চিত্তে যোগের আরম্ভ। বিক্ষিপ্ত চিত্তকে 'ক্রিয়াযোগের' * দ্বারা একাগ্র করিতে হয়; চিত্ত একাগ্র হইলে সাধক তবেই প্রকৃত যোগের অধিকারী হন—কারণ, একাগ্র ও নিরুদ্ধ চিত্তই যোগের উপযোগী এবং অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইতে পারে। এই চিত্তবৃত্তির নিরোধ দ্বারা সমাধি ও সিদ্ধির নামই যোগ।

তবে, এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে চিত্তবৃত্তির নিরোধের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানেরও নিরোধ হয়, কারণ চিত্তবৃত্তিই জ্ঞান স্বরূপ এবং জ্ঞানের নিরোধ হইলে আত্মার নিত্যত্বের ব্যাঘাত ঘটে, কারণ আত্মা জ্ঞান স্বরূপ। ইহার উত্তর, উক্ত জ্ঞান প্রকৃতিজ, চিত্তবৃত্তির নিরোধের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিজ এই খণ্ড-জ্ঞানেরই নিরোধ হয়, কিন্তু আত্মার স্বরূপ যে পূর্ণজ্ঞান তাহা নিত্য, প্রকৃতি-দুষ্ট নহে। যোগ-উপদেষ্টা পতঞ্জলি বলিতেছেন, চিত্তবৃত্তির একান্ত নিরোধ দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষ—জগতের এই দুই তত্ত্বের স্বরূপ বোধ হয়, আর সেই স্বরূপ-জ্ঞানই আত্মা। সে আত্মা কেমন? গীতাকারের কথায় বলিতে হয়—

* ক্রিয়াযোগের অঙ্গ তিনটি—তপঃ, সাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান।

"ন জায়তেম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
আজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতেহন্যমানে শরীরে॥"
—গীতা, ২।২০শ শ্লোক।

—সকল জীবের হৃদয়স্থিত মণিকোটায় যে আত্মার বসতি,

"জন্ম মৃত্যু নাহি তার দেহের মতন
বার বার নাহি ক'রে জনম গ্রহণ।
পরিণাম শূন্য আত্মা, নাহি বৃদ্ধিক্ষয়,
শরীর হইলে নষ্ট, বিনষ্ট না হয়॥"—"সুধাকর" গীতা।

এই আত্মসাক্ষাৎকারই পাতঞ্জলোক্ত যোগের চরম অবস্থা, সমাধি-প্রজ্ঞার পরম পরিণতি। আত্মদর্শন হইলেই পুরুষ স্বরূপে অবস্থান করেন, সুখ ও দুঃখের অতীত কৈবল্য * অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জীব মুক্তি লাভ করে।

মহর্ষি পতঞ্জলি যোগশব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। পাতঞ্জল প্রদর্শিত যোগ অর্থে সংযোগ নহে বরং বিয়োগ বা উদ্‌যোগ বুঝায়। পাতঞ্জলের 'ভোজবৃত্তিতে' উক্ত হইয়াছে—

"পুং প্রকৃত্যোর্বিয়োগোঽপি যোগ ইত্যুদিতো যয়া"

—প্রকৃতি ও পুরুষের যে বিয়োগ বা বিবেকজ্ঞান বা পার্থক্যজ্ঞান পাতঞ্জল শাস্ত্রে তাহাকেই যোগ বলে। 'পাতঞ্জলদর্শনে যোগশব্দে ঈশ্বরের সহিত জীবের সংযোগ বুঝায় না, কিন্তু চিত্ত নিরোধের উদ্‌যোগ বা ব্যাপার

* "Kaivalya. from Kevala (কেবল) alone, means the isolation of the Soul from Universe (objective world—প্রকৃতি) and its return to itself and not any other else"—Prof. Max Muller in "Indian Philosophy."

(process) মাত্র বুঝায়'—"যুজির্ সমাধৌ।" * পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে কিন্তু যোগশব্দ ব্যাপক অর্থে, সংযোগ অর্থেই, ব্যবহৃত হইয়াছে। মুনি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

"সংযোগোযোগ ইত্যুক্তো জীবাত্ম পরমাত্মনোঃ।"

—জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে সংযোগ তাহারই নাম যোগ; অবশ্য ইহা সংযোগ, প্রযত্ন বা উদ্‌যোগ ভিন্ন সিদ্ধ হয় না। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥"

—গীতা, ৬।২৯শ শ্লোক।

—সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিশীল, সমাহিত চিত্ত যোগী সমস্ত ভূতে আত্মাকে এবং ভূতগণকে আত্মাতে অবলোকন করেন। সমস্ত ভূতে যে আত্মা বিরাজিত—যোগসিদ্ধ যোগী যাঁহাকে দর্শন করেন, তিনি পরমাত্মা (ভগবান) ভিন্ন আর কে? যোগীর এই যে সিদ্ধ-অবস্থা, এ অবস্থার বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতকার আরও স্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়াছেন, যথা—

"..................................

আত্মানমত্র পুরুষোঽব্যবধানমেকম্
অন্বীক্ষতে প্রতিনিবৃত্ত গুণ প্রবাহঃ॥

---

* Yoga in the Philosophy of Patanjali does not mean union with God or anything, but effort (উদ্‌যোগ), pulling oneself together, exertion, concentration. The idea of absorption into the supreme Godhead (লয়) orms no part of the Yoga theory—Prof. Max Muller in "Indian Philosophy".

সোঽপ্যেতয়া চরময়া মনসোনিবৃত্ত্যা
তস্মিন্ মহিম্ন্যবসিতঃ সুখদুঃখবাহ্যে ॥"

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৩।২৮।৩৫-৩৬ শ্লোকার্দ্ধ।

—সে অবস্থায় প্রকৃতির প্রবাহ নিবৃত্ত হইলে, পুরুষ অখণ্ড অব্যবধান (ধ্যান, ধ্যাতা ও ধ্যেয়ের ভেদহীন) আত্মাকে দর্শন করেন এবং চিত্তবৃত্তির চরম নিবৃত্তিতে সুখ দুঃখের অতীত মহিমময় ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

ভগবান পতঞ্জলি যোগ শিক্ষাকল্পে চিত্তপ্রসাধন অর্থাৎ চিত্তনির্ম্মল করিবার উপায় ব্যক্ত করিয়া যোগের আটটি সাধন-অঙ্গের (অর্থাৎ "বৃত্তিলয়" নামক চরম-যোগের পূর্ব্ব-সাধক বা করণ) বর্ণন করিয়াছেন। অষ্টম সাধন-অঙ্গের মধ্যে বহিরঙ্গ পাঁচটি ও অন্তরঙ্গ তিনটি।

(ক) বহিরঙ্গ সাধন-অঙ্গ, যথা—

১। যম (abstinence)

২। নিয়ম (obligation to perform certain acts)

৩। আসন (special posture for meditation)

৪। প্রাণায়াম (regulation of the breath)

৫। প্রত্যাহার (abstraction of the organ from their natural functions)

(খ) অন্তরঙ্গ সাধন-অঙ্গ, যথা—

১। ধারণা (steadfastness)

২। ধ্যান (contemplation)

৩। সমাধি (meditation)

যম, যথা—

১। অহিংসা (abstenence from slaughter & evil action).

২। সত্য (abstinence from falsehood)

৩। অস্তেয় বা অচৌর্য্য (abstinence from theft)

৪। ব্রহ্মচর্য্য (abstinence from inconstinence)

৫। অপরিগ্রহ (অর্থাৎ ত্যাগশক্তি, ভোগ্যবস্তুর গ্রহণে আশক্তি ত্যাগ, অগ্রহণ—abstinence from accepting)

নিয়ম, যথা—

১। বাহ্য ও অন্তঃশৌচ (অর্থাৎ শুদ্ধ থাকা—purification)

২। সন্তোষ (তৃপ্তি—contentment)

৩। তপস্যা (penance)

৪। স্বাধ্যায় (study of the Vedas, বেদাভ্যাস, মন্ত্র ও জপ)

৫। ঈশ্বরোপাসনা[১] (devotion to God)

যেভাবে স্থিরভাবে অধিকক্ষণ সুখে বসিয়া থাকিতে পারা যায় তাহার নাম আসন।[২] অনেকে হয়ত বলিবেন 'বিলক্ষণ! আমাদের সুখে কাজ নাই, যোগের আসন করিয়া স্থির হওয়া ত দূরের কথা অস্থিরই হইতে হয়।' কিন্তু, কোন ভয় নাই—আজ যাহা কষ্টকর, অভ্যাস বশতঃ কাল তাহাই সুখদায়ক হয়, ইহা কিছু নূতন কথা নয়। শিশু

১। "ঈশ্বরোপাসনা করিতে হইলে কায়িক, বাচিক ও মানসিক সমস্ত ব্যাপারই ঈশ্বরে অর্পণ করিবে। যখন যে কার্য্য করিবে, ফলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, সুখের অনুসন্ধান না করিয়া, সমস্ত কার্য্যই সেই পরমগুরু পরমেশ্বরে সমর্পণ করিবে। সকল সময়ে কেবল তাঁহারই ধ্যানে রত থাকিবে—তোমার সমাধি লাভ হইবে।"—"চরিতাভিধান।"

২। "স্থিরসুখমাসনম্"—পাতঞ্জল, ২য় পাদ ৪৬শ সূত্র।

প্রথমে হামা দিতে থাকে, দাঁড়ান তখন তাহার পক্ষে বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তাই বলিয়া সে যখন আবার বড় হয় তখন সে কিছু হামা টানিতে থাকেনা এবং দাঁড়ানও তখন তাহার পক্ষে তেমন একটা কষ্টসাধ্য কাজ নয়—কিন্তু যা'ক সে কথা। কথা হইতেছিল আসনের কথা, যোগের কথা; পদ্মাসন, সিদ্ধাসন প্রভৃতি আসন বিভিন্ন প্রকার ও সর্ব্বশুদ্ধ চৌরাশী আসন আছে।

এই আসন জয়ের পর শ্বাস ও প্রশ্বাস উভয়ের গতি সংযত হইয়া যায়, ইহাকে 'প্রাণায়াম' বলে—প্রাণ+আয়াম, অর্থাৎ প্রাণ-বায়ুকে সম্যকরূপে সংযত করণ, প্রাণ ইচ্ছাধীন হইলে চিত্ত সহজেই অনুকূল বা স্থির হয়। ইন্দ্রিয়গণ যখন সাধারণ ভাবে নিজ নিজ গ্রহণীয় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া চিত্তের অনুগত হইয়া তাহার স্বরূপ গ্রহণে তৎপর হয় সেই অবস্থাকে 'প্রত্যাহার' বলে।

চিত্তকে কোন বিশেষ স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখার নাম 'ধারণা' ও সেই বস্তু বিষয়ক জ্ঞান স্থায়ী হইয়া নিয়ত এক চিত্তে স্থির হইলে তাহাকে 'ধ্যান' বলে। ধ্যান যখন ধ্যেয় বস্তুকেই উদ্ভাসিত বা প্রকাশিত করিয়া ধ্যান, ধ্যেয় ও ধাতা এই তিনের ভেদ লুপ্ত করিয়া দেয় (অর্থাৎ, 'আমি ধ্যান করিতেছি' ইত্যাদি প্রকার ভেদ-জ্ঞান লুপ্ত করিয়া দেয়) ও চিত্তবৃত্তি যখন থাকিয়াও না থাকার ন্যায় ভাসমান হয়, তখন তাহা 'সমাধি' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সমাধি দুই প্রকার, 'সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি' ও 'সমাধি-প্রজ্ঞা'। একাগ্রচিত্তের যোগের নাম সম্প্রজ্ঞাত, অর্থাৎ নির্ম্মল চিত্ত অভিমত বস্তুতে তন্ময় হইলে তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে, কারণ ধ্যেয়-বস্তু তৎকালে সম্যকরূপ জানিতে পারা যায়। নিরুদ্ধ চিত্তের যোগের নাম সমাধি-প্রজ্ঞা, ইহাকে ঋতম্ভরা-প্রজ্ঞাও বলে, কারণ এই

প্রজ্ঞা ঋত বা সত্যকেই প্রকাশ করে—ইহাকে অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধিও বলা হয়, কারণ ধ্যেয়-বস্তুর বৃত্তিও নিরুদ্ধ হয় বা বিলীন হইয়া যায় বলিয়া তৎকালে তাহার কিছুই জানা যায় না, তাহার সমস্ত বৃত্তি তিরোহিত হয়, শুধু সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে—ইহাই যোগের চরম অবস্থা। চিত্ত পুনরায় তখন প্রকৃতিকে আশ্রয় করে, ভোগায়তন দেহেরও তখন আর আবশ্যক থাকে না এবং এইরূপে প্রকৃতি নিবৃত্ত হইলে সৎ চিৎ আনন্দময় পুরুষও সম্পূর্ণভাবে নিঃসঙ্গ হন অর্থাৎ প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হন, আর তাঁহার শরীর হয় না, জন্ম মৃত্যু হয় না, সুখ দুঃখের আত্যন্ত ভোগ করিতেও হয় না।

সাধনাবস্থায় যোগাভ্যাসের ফলে যোগীর কতকগুলি অলৌকিক শক্তির সঞ্চার হয়, ইহাদিগকে 'বিভূতি বা সিদ্ধি' (occult power) বলে। পাতঞ্জলদর্শনের তৃতীয় পাদে সিদ্ধির সবিস্তার উল্লেখ আছে; যোগ সাধনার পক্ষে এই সকল মোটেই সহায়ক নহে, অন্তরায় স্বরূপ। সমাধি-রহিত যোগীর পক্ষে এই সকল সিদ্ধি বিভূতি বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু সমাধিযুক্ত যোগীর পক্ষে ইহারা উপসর্গ মাত্র, ইহারা তাঁহাদের কিছুই ক্ষতি করিতে পারে না, বরং সহায়করূপে কার্য্য করে।

বস্তুতঃ, বাহ্য বিষয় হইতে মনকে আকৃষ্ট করিয়া 'চিন্ত' (চিন্তনীয়) পরমার্থ বিষয়ে তাহাকে নিবেশ করিবার পুনঃ পুনঃ প্রচেষ্টাকে যোগাভ্যাস বলে। চিন্ত বস্তু দুই প্রকার, 'ঈশ্বর ও অন্যান্য তত্ত্ব'—ঈশ্বর, চৈতন্য ও অপরিণামী এবং অন্যান্য তত্ত্ব জড় ও পরিণামী। পরিণামী তত্ত্বকে অপরিণামী এবং অনাত্মাকে আত্মা মনে করার নামই 'বন্ধন'। সমাধি দ্বারা চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদিত হইলে যোগীর বন্ধন বিনষ্ট হয়, ত্রিতাপের

লয় হয় ও পরিণামী ও আত্মার স্বরূপ বোধ ঘটে। অদৃষ্টের বিনাশ তখনই হয় এবং অদৃষ্ট নষ্ট হইলে সৃষ্টিও আর হয় না—যোগী মুক্তি বা কৈবল্য পান—আর এই বিশেষ অবস্থায়েই চিৎশক্তি (পুরুষ) স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে তাই কথিত হইয়াছে—

"আলোক্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং যোগশাস্ত্রমতং তথা॥
যস্মিন্ যাতি সর্ব্বমিদং জাতং ভবতি নিশ্চিতম্।
তস্মিন্ পরিশ্রমঃ কার্য্যঃ কিমন্যৎ শাস্ত্রভাষিতম্॥"

—শিবসংহিতা, ১।১৮শ সূত্র।

—সর্ব্বশাস্ত্র দর্শন করিয়া এবং পুনঃ পুনঃ তাহার বিচার করিয়া এই মাত্রঃনিশ্চয় করা হইয়াছে, এবং যোগশাস্ত্রেরও এই মত, যে যাঁহাতে সমস্ত পদার্থ গমন করে ও যাঁহা হইতে জন্মে প্রধানতঃ তাঁহাকে জানিবার জন্য পরিশ্রম করাই কর্ত্তব্য—শাস্ত্রলিখিত অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করিয়া কালক্ষেপ করার কি প্রয়োজন আছে? একমাত্র ঈশ্বরোপাসনা দ্বারাই জীব এই বিভূকে জানিতে পারে ও স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। মহর্ষি পতঞ্জলি বর্ণিত এই বিভূ বা ঈশ্বর নিত্য ও নিরতিশয় —অনাদি ও অনন্ত। তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং তিনিই জ্ঞানের পূর্ণ প্রতীক। "অল্পতার চূড়ান্ত যেমন পরমাণু, বৃহত্ত্বের শেষ সীমা যেমন আকাশ— পরমাণু হইতে ক্ষুদ্রতর এবং আকাশ অপেক্ষা বৃহত্তর কোন জিনিষেরই যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনই জ্ঞান-শক্তির অল্পতার সীমা ক্ষুদ্র জীব এবং ঐ জ্ঞান-শক্তির আতিশয্যের পরাকাষ্ঠা ঈশ্বর।" [১]

"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।"

১। "চরিতাভিধান"—উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ন্যায়দর্শন

ন্যায়ের কথা উত্থাপন করিলে স্বতঃই অজ্ঞতা-প্রসূত অন্যায় প্রসঙ্গই আসিয়া পড়ে। নৈয়ায়িকের প্রতি আবহমানকাল হইতে বিদ্রূপবাক্য-বাণও কিছু কম বর্ষিত হয় নাই।

"স্বীয়ং কল্পনমেব শাস্ত্রমিতি যে জানন্তি তে তার্কিকাঃ।"

—ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনায় নিজ নিজ কল্পনাকে শাস্ত্র বলিয়া যাঁহারা বিবেচনা করেন জনসমাজে তাঁহারাই তার্কিক বলিয়া পরিচিত—ইহাই নৈয়ায়িকদিগের প্রতি "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" নাটক প্রণেতা কবি কর্ণপূরের বিদ্রূপোক্তি। এমন কি পুরাণেও উক্ত হইয়াছে—

"আন্বীক্ষিকীমধীয়ানঃ শার্গালীং যোনিমাপ্নুয়াৎ।"

—আন্বীক্ষিকী বা ন্যায়-বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া লোকে ধূর্ত্তের প্রতীক শৃগালত্ব প্রাপ্ত হয়। ইউরোপের দর্শন-বিজ্ঞানের বিভূতির 'জৌলুসে' আমরা এখনও ন্যায়শাস্ত্রের প্রতি বিদ্রূপ করিয়া অনেক কিছুই বলিয়া থাকি, যেমন—

"তৈলাধার পাত্র কিম্বা পাত্রাধার তৈল?"—অথবা,

"তাল ঢিপ্ করিয়া পড়ে, না পড়িয়া ঢিপ্ করে?"—অথবা,

"পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" না "পর্ব্বতো ধূমমান্ বহ্নেঃ?"

—এমনই আরও কত কি; কিন্তু এইগুলির প্রত্যেকটিই যে ন্যায়-শাস্ত্রের এক একটি তত্ত্ব নিরূপক প্রাঞ্জল দৃষ্টান্ত এবং জ্ঞান নির্ণয়ের হেতু, তাহা

ধীরভাবে বিবেচনা করিবার মত শিক্ষা আমাদের নাই এবং সে চেষ্টাও আমরা অনেকদিন পূর্ব্বেই ত্যাগ করিয়াছি। বস্তুতঃ, যে শাস্ত্রের দ্বারা জ্ঞান কি এবং অজ্ঞানই বা কি, উভয়ের রূপ ও পার্থক্যের স্বরূপ বুঝিতে পারা যায় তাহাই ন্যায়শাস্ত্র। 'প্রমাণ' কাহাকে বলে, কিরূপে জ্ঞানের প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য বুঝিতে পারা যায়, প্রকৃত জ্ঞান আমরা কিরূপে লাভ করিতে পারি, কিরূপই বা দোষ থাকিলে যথার্থ জ্ঞানোদয় আমাদের হয়না প্রভৃতি, যাহা অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে একান্ত উপেক্ষণীয়, এবম্বিধ বিষয়গুলি যে শাস্ত্রে বিশেষভাবে বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে তাহার নাম ন্যায়শাস্ত্র। বস্তুতঃ যে তত্ত্বসমূহের নির্ণয় ব্যতিরেকে কোন শাস্ত্রেরই একান্ত বুৎপত্তি লাভ করিতে পারা যায় না, সেই জ্ঞান-প্রমাণ্য-তত্ত্বের নির্ণয় যে শাস্ত্র-পাঠে করিতে পারা যায় সেই শাস্ত্রই ন্যায়শাস্ত্র বলিয়া খ্যাত।

পাশ্চাত্য দর্শন, জ্ঞানের প্রকৃষ্ট তত্ত্ব-কথনে নীরব। পাশ্চাত্য দর্শনে জ্ঞানের চরম ব্যাখ্যা অনুভূতি (introspection)। "মণিরত্নমালায় ভগবান শঙ্কর স্বামী বলিতেছেন, "বোধোহি কঃ—যস্ত বিমুক্তি হেতুঃ।"— জ্ঞান কি? যাহা মুক্তিলাভের উপায় তাহাই জ্ঞান। অর্থাৎ, যাহার দ্বারা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা "ব্রহ্মকে" জানা যায়, দেখা যায়, লাভ করা যায়, তাহাই জ্ঞান ; এবং এই জ্ঞানই মুক্তির হেতু—"জ্ঞানাৎ মুক্তি"।

শ্রুতি তাই বলিতেছেন—

"নিত্যোঽনিত্যানাঞ্চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥"

—কঠোপনিষৎ, ২।২।১৩শ সূত্র।

—সকল অনিত্য বস্তুর মধ্যে যিনি একমাত্র নিত্য, চেতনপদার্থ, সকলের যিনি একমাত্র চৈতন্যের হেতু, যিনি এক হইয়াও সকলের কামনা পূর্ণ করেন, তাঁহাকে যে সকল পণ্ডিত ব্যক্তি আত্মস্থ জানিয়া সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করেন তাঁহারাই নিত্য-শান্তি অর্থাৎ মুক্তি বা কৈবল্য প্রাপ্ত হন; অন্য আর কেহই এই নিত্য-শান্তি পাইবার অধিকারী নহে। ভক্তিও জ্ঞান-ভিন্ন বা জ্ঞান-শূন্য নহে, ভক্তি 'সম্বিৎরূপা'।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে "আন্বীক্ষিকী" ন্যায়দর্শনের অপর আর একটি নাম। অনু অর্থে পশ্চাৎ এবং ঈক্ষা অর্থে দর্শন—অর্থাৎ, শ্রবণের পর আত্মার মনন বা আলোচনার নাম 'অন্বীক্ষা'। ন্যায়শাস্ত্র অন্বীক্ষার নির্ব্বাহ করে বলিয়া তাহার নাম আন্বীক্ষিকী। ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন অন্বীক্ষিকী-বিদ্যাকে সকল বিদ্যার প্রদীপরূপে (Science of Sciences) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "সেয়মান্বীক্ষিকী—

প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা॥"

—বাৎস্যায়ন, ন্যায়ভাষ্য।

—ন্যায়শাস্ত্র সর্ব্ববিদ্যার প্রদীপস্বরূপ, সর্ব্বকর্ম্মের উপায় ও সর্ব্ব ধর্ম্মের আশ্রয়। কিন্তু এমন যে ন্যায়শাস্ত্র, ইহার প্রতি অহেতুক উপেক্ষা করিয়া অনেকেই বলিয়া থাকেন, 'এত ন্যায়ের কচ্‌কচিতে কাজ কি বাপু! প্রচলিত বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের অনুশীলন করিলেই যখন জগতের প্রায় সকল জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারা যায় (?) তখন দর্শনশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য আত্মা বা মুক্তি বা ব্রহ্মকে না জানিলেই বা ক্ষতি কি?' আপাত দৃষ্টিতে যুক্তি বেশ সমীচীন বোধ হইলেও এই প্রকার উক্তিতে বেশ একটু অদ্ভুতরস

বিদ্যমান। ইহসংসারে সকল বিষয়ই আত্মার প্রয়োজন সাধক ; সমস্ত বস্তু আত্মার্থ বলিয়াই প্রিয়, আত্মার অভিলষিত সম্পাদক বলিয়াই আমরা ধন, ঐশ্বর্য্য, যশ, স্ত্রী, পুত্র পরিবার প্রভৃতি সকলই ভালবাসি। কাজেই আত্মাই নিরতিশয় প্রিয়, আত্মা অপেক্ষা প্রিয়-বস্তু নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলিতেছেন—

"ন বা অরে (মৈত্রেয়ি !)
সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি,
আত্মনস্ত কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।"

—বৃহদারণ্যক, ২।৪।৫ ম সূত্রাংশ।

সুতরাং এই আত্মতত্ত্ব না জানিয়া যাঁহারা আত্মার প্রীতিসাধক বিষয়গুলি জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে মোহান্ধ বই আর কি বলা যাইতে পারে? তাঁহাদের এহেন যুক্তিজাল বিস্তার করা একান্তই হাস্যা[illegible]। আর এক কথা, দেশে দেশে প্রথিতযশা "মনীষিগণ যে ভারতীয়দর্শনে সমধিক আস্থাবান্ ও ভক্তিমান, যে ভারতীয়দর্শন বুদ্ধির নির্ম্মলতা-সম্পাদনের উপায়, প্রতিভার আকর, তর্কের[1] লীলাক্ষেত্র, আত্মজ্ঞানের উৎস, মুক্তির সোপান এবং মৃত্যুভয়রোগের অদ্বিতীয় মহৌষধ, যে ভারতসন্তান সেই ভারতীয়দর্শনের অনুশীলনের জন্য যত্ন ও পরিশ্রম করিতে পরাঙ্মুখ তাঁহাকে বিচারমূঢ় ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। দর্শনশাস্ত্রকে দূর হইতে ব্যাঘ্ররূপে কল্পনা করিয়া ভীত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। সাহসপূর্ব্বক নিকটে গেলে দৃষ্ট হইবে যে, উহা

১। ন্যায়দর্শনের আলোচনায় তর্ক শক্তি বৃদ্ধি পায় বলিয়া এই দর্শনের অপর আর এক নাম "তর্কশাস্ত্র"।

ব্যাঘ্র নহে, পরন্তু বিচিত্রবর্ণশোভিত সুরভি। উহা হইতে তীক্ষ্ণ-নখদংষ্ট্রাঘাতের ভয় নাই, যত্নপূর্ব্বক উহাকে দোহন করিলে পুষ্টিকর সুমধুর ক্ষীর পাওয়া যাইবে—"আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্"—যাহাকে অগ্নি বলিয়া আশঙ্কা করিতেছ, তাহা অগ্নি নহে, স্পর্শযোগ্য রত্ন।" †

ন্যায় দর্শন মহর্ষি অক্ষপাদ গোতম প্রণীত। 'অক্ষপাদ' মহর্ষি গোতমের আর এক নাম ; এই জন্য তাঁহার প্রবর্ত্তিত দর্শনকে অক্ষপাদ দর্শনও বলে। অক্ষপাদীয় ন্যায়সূত্র পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটি করিয়া পরিচ্ছেদ বা আহ্নিক আছে। ন্যায়দর্শনের সূত্র সংখ্যা ৫২৮টি। বাৎস্যায়ন প্রণীত "ন্যায়-ভাষ্য", উদ্যোতকরের "ন্যায়-বার্ত্তিক", মল্লিনাথের "নিষ্কণ্টকা", জয়ন্তভট্টের "ন্যায়মঞ্জরী" ও ন্যায়-বার্ত্তিকের বাচস্পতি মিশ্র কৃত "তাৎপর্য্যটীকা" ও উহারই উদয়নাচার্য্য প্রণীত "তাৎপর্য্য পরিশুদ্ধি" প্রভৃতি ন্যায়দর্শনের অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রাচীন গ্রন্থ প্রচলিত আছে।

ইহা ব্যতিরেকে 'ন্যায়দর্শনের' প্রমাণতত্ত্ব সংক্রান্ত নব্যন্যায়শাস্ত্র বাঙ্গালী জাতির গৌরব স্বরূপে দেশে দেশে আদৃত হইয়া আসিতেছে। "কুসুমাঞ্জলি", "বৌদ্ধাধিকার", "তত্ত্বচিন্তামণি", "শব্দশক্তি-প্রকাশিকা", "মুক্তিবাদ" প্রভৃতি গ্রন্থ নব্যন্যায়ের বিশেষ পরিচিত গ্রন্থ এবং রঘুনাথ শিরোমণি কৃত "দীধিতিপ্রকাশ" ও 'তত্ত্বচিন্তামণির টীকা' হরিরাম কৃত টীকা, জগদীশ তর্কালঙ্কারের "তর্কামৃত" ও "মাথুরী", অন্নম্ভট্ট বিরচিত "তর্কসংগ্রহ", গদাধর ভট্টাচার্য্যের "গাদাধরী",

† "শ্রীগোপাল বসু মল্লিক ফেলোশিপ্" বক্তৃতা—মঃ মঃ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।

জয়ানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের টীকা এবং ঐ টীকারই মহাদেব পুস্তামকর কৃত টীকা, বিশ্বনাথের "ন্যায়কারিকা" ও "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী" এবং তাঁহার টীকাকার মারহাট্টী মহাদেব দিনকরের নাম সকলই বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। মিথিলার পক্ষধর মিশ্র ও তাঁহার শিষ্য বাসুদেব সার্ব্বভৌম, নবদ্বীপের এই দুইজন অনন্যসাধারণ নৈয়ায়িকের শিষ্য, রঘুনাথ শিরোমণিই নব্য-ন্যায়ের প্রবর্ত্তক হিসাবে ভারতের যাবতীয় নৈয়ায়িকদিগের পূজ্য ও নমস্য।

ন্যায়দর্শনের মতেও সংসার দুঃখময়। সুখ দুঃখানুবিদ্ধ, অতএব সুখকেও এক প্রকার দুঃখ বলিয়া গণ্য করা উচিত। "নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে"—দুঃখের কশাঘাত না থাকিলে জগতে সুখের এত আদর হইত না। জন্মিলেই দুঃখ, কাজেই দুঃখের নিবারণ কল্পে জন্মগ্রহণ রহিত করিতে হইবে। জন্মের হেতু প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তি ধর্ম্মাধর্ম্মের কারণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম সুখ দুঃখের কারণ ; জন্ম না থাকিলে ফল ভোগ হয় না, অতএব কর্ম্মফল জন্মের কারণ। বস্তুতঃ, জীব প্রবৃত্তির বশে কর্ম্ম করে এবং তাহারই ফলে তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। প্রবৃত্তির হেতু কি? প্রবৃত্তির হেতু দোষ। দোষ ত্রিবিধ, রাগ অর্থাৎ আসক্তি, দ্বেষ ও মোহ অর্থাৎ প্রমাদ—এই তিনটি ভিন্ন কোনও বিষয়ে জীবের প্রবৃত্তি জন্মে না। আবার, এই দোষের হেতু কি? দোষের হেতু মিথ্যাজ্ঞান ; কাজেই এই মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ সাধন করিতে না পারিলে দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি হয় না। শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধ থাকিলে দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি হইতে পারে না ; অতএব, আত্মাকে শরীরাদি হইতে পৃথক করিতে হইবে এবং এই অবস্থায় উপনীত হইলেই আত্মার মুক্তি। আত্মাকে পাষাণাদি জড়-পদার্থের ন্যায় সুখ-দুঃখের ও জ্ঞানাদির অতীত করিতে হইবে ; বস্তুতঃ,

আত্মার জড়াবস্থা-প্রাপ্তিই মুক্তি। ন্যায়দর্শন বলিতেছেন, একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করিয়াই জীব মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ সাধন করিতে পারে এবং জন্ম-মৃত্যুর মুখ্য কারণ দেহাত্মবোধকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে। দেহাদিতে আত্মবোধই আমাদের সমস্ত অনর্থের কারণ এবং দেহাদির অনুকূল বিষয়েই রাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ হইয়া থাকে। অতএব, ইহসংসারে যাবতীয় পদার্থ-বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই মুমুক্ষুব্যক্তির আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান উপজাত হইবে, তাহার দুঃখের চিরাবসান হইবে এবং জীব 'নিঃশ্রেয়স' বা নিশ্চিত-মঙ্গলের [১] অধিকারী হইবে।

অধ্যাত্ম-বিদ্যার নিঃশ্রেয়স কি? অধ্যাত্ম-বিদ্যার নিঃশ্রেয়স, [২] মুক্তি বা মোক্ষ। অবশ্য, গোতম বর্ণিত 'মুক্তির' কিছু তারতম্য আছে, 'শঙ্করজয়ে' আমরা পাই—

"মুক্তস্তদীয়ে চরণাক্ষপক্ষে
সানন্দসংবিৎ সহিতাবিমুক্তিঃ।"
—শ্রীমন্‌মাধবাচার্য্যের 'শঙ্করজয়', ১৬।৬৯ সূত্রার্দ্ধ।

—অক্ষপাদ বা গোতমের মতে মুক্তিতে আনন্দসংবিৎ থাকে; অর্থাৎ, গোতম প্রবর্ত্তিত ন্যায়দর্শনে মোক্ষে আনন্দের সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে। বস্তুত, মোক্ষলাভের প্রকৃত অবস্থায়, সৎ চিৎ আনন্দময়ের আনন্দ সত্তাতেই, মুক্ত জীব লীন হয়। তাই ন্যায়শাস্ত্রের উদ্দেশ্য 'নিঃশ্রেয়স' লাভ করে

১। পাণিনি ব্যাকরণের ৫অঃ—৪র্থপাদে 'নিঃশ্রেয়সম্' শব্দ বু্যৎপাদিত হইয়াছে। বৃত্তিকার বলেন—"নিশ্চিতং শ্রেয়ো নিঃশ্রেয়সম্।"

২। Max Muller কথিত—'the non plus ultra of blessedness' নহে।

জীবকে ষোড়শ-পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান [১] প্রদান করা। এই ষোড়শ-পদার্থ কি কি ; তাহাদের স্বরূপই বা কি ? ন্যায়দর্শন বলিতেছেন—

"প্রমাণ প্রমেয় সংশয় প্রয়োজন দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্তাবয়ব
তর্ক নির্ণয় বাদ জল্প বিতণ্ডা হেত্বাভাস ছল জাতি নিগ্রহস্থানানাং
তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।"

—ন্যায়সূত্র, ১।১।১

প্রথম পদার্থ 'প্রমাণ', অর্থাৎ যাহা দ্বারা যথার্থ জ্ঞান বা প্রমা জন্মে তাহাকে 'প্রমাণ' ব'লে। প্রমাণ, i.e., means of knowledge. প্রমাণ চারি প্রকার, যথা—প্রত্যক্ষ (perception), অনুমান (inference), উপমান (analogy) ও শব্দ বা আপ্তবাক্য অর্থাৎ শাস্ত্র প্রমাণ—বিশ্বস্ত ব্যক্তির বাক্য, ঋষিবাক্য—বেদবাক্য।

দ্বিতীয় পদার্থ 'প্রমেয়', অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়—object of knowledge. প্রমেয় দ্বাদশ প্রকার, তন্মধ্যে প্রথম ছয়টি যথাক্রমে আত্মা শরীর, ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি), বিষয় (ইন্দ্রিয়-বিষয় বা অর্থ, ক্ষিত্যাদি সংযোগে গন্ধাদি), বুদ্ধি ও মন। আত্মা যাহাকে আশ্রয় করিয়া ভোগ করেন তাহার নাম শরীর, যাহার দ্বারা ভোগ করেন তাহা ইন্দ্রিয়, যাহা ভোগ করেন (ভোগ্য যাহা) তাহা বিষয়, ভোগ্যবস্তুর জ্ঞানের নাম বুদ্ধি, যাহার সংযোগে ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ের উপলব্ধি হয় এবং যাহার বিয়োগে তাহা হয় না তাহার নাম মন—স্মরণ, অনুমান ও সংশয় মনেরই ধর্ম্ম। অপর ছয়টি প্রমেয় পদার্থ যথা, প্রবৃত্তি (activity—

১। তত্ত্বজ্ঞান অর্থে, Max Muller বর্ণিত 'enumeration & classification of all nameable things' কিম্বা 'classification of existence' বহে।

শারীরিক, কায়িক ও মানসিক এই তিন প্রকার) ; দোষ (ইহা প্রবৃত্তির হেতু বা কারণ, দোষ তিন প্রকার—রাগ, দ্বেষ ও মোহ) ; প্রেত্যভাব (পুনর্জ্জন্ম ও পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর নাম প্রেত্যভাব) ; ফল (কর্ম্মফল, প্রবৃত্তি জাত সুখ ও দুঃখ) ; দুঃখ (অসৎ কর্ম্মের ফলই দুঃখ, সুখও দুঃখানুবিদ্ধ, উভয়ের সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গীভাব) ; অপবর্গ (অর্থাৎ আত্যন্তিক দুঃখনাশ বা মুক্তি—ইহা আনন্দসংবিৎযুক্ত)।

তৃতীয় পদার্থ—সংশয়, সন্দেহ, i.e., doubt.

চতুর্থ পদার্থ—প্রয়োজন, অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে লোকের প্রবৃত্তি হয়, i. e., purpose.

পঞ্চম পদার্থ—দৃষ্টান্ত, i. e., instance.

ষষ্ঠ পদার্থ—অবয়ব, ন্যায়ের একদেশ বা এক অংশ i. e., major or minor premisses.

সপ্তম পদার্থ—সিদ্ধান্ত, বিষয়ের নিশ্চয়, i. e., solution,

অষ্টম পদার্থ—তর্ক, i. e., reasoning.

নবম পদার্থ—নির্ণয়, অর্থের নিশ্চয়, i. e., conclusion.

দশম পদার্থ—বাদ, i. e., argumentation.

একাদশ পদার্থ—জল্প, i. e., sophistry.

দ্বাদশ পদার্থ—বিতণ্ডা, i. e., wrangling.

ত্রয়োদশ পদার্থ—হেত্বাভাস, i. e., fallacies.

চতুর্দ্দশ পদার্থ—ছল, i. e., quibble.

পঞ্চদশ পদার্থ—জাতি, i. e., false analogy.

ষোড়শ পদার্থ—নিগ্রহস্থান, i. e., ignorance or mistake of one with whom discussion is made.

উক্ত ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের বিশেষ বিচার ও নিরূপণ নব্যন্যায় শাস্ত্রে আরও বিশদ ও অভিনব উপায়ে আলোচিত হইয়াছে [১] এবং এই জন্যই প্রত্যেকের পক্ষেই নব্যন্যায়ের পরিভাষা-বোধ শাস্ত্রানুশীলনে একান্তই আবশ্যক ও বিশেষ সুফল প্রদ।

ন্যায়দর্শন প্রথমে শুধুই পদার্থবিদ্যা ছিল, কিন্তু কালক্রমে ইহা আধ্যাত্ম বিদ্যায় পরিণত হইয়াছে। সমস্ত ন্যায়শাস্ত্রকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়, যথা—
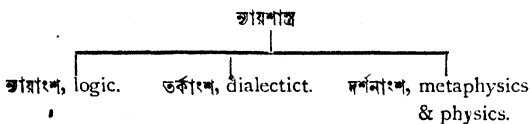
ন্যায়াংশে প্রথম পদার্থ প্রমাণের বিচারসহ পঞ্চাবয়ব-ন্যায়ের [২] গবেষণাপূর্ণ আলোচনা আছে। তর্কাংশ জল্প, বিতণ্ডা, ছল প্রভৃতির বিচারে পূর্ণ। দর্শনাংশে প্রমেয় পদার্থ, অর্থাৎ—আত্মা, শরীর, মন প্রভৃতির আলোচনা আছে এবং ইহাদের জ্ঞানই যে মুখ্যভাবে মুক্তির হেতু তাহারই নির্দ্দেশ আছে। প্রসঙ্গক্রমে পঞ্চভূত, ষড়্‌গুণ ও সংক্ষেপে পরমাণুবাদের

১। বিশেষতঃ, ১ম পদার্থ 'প্রমাণ-তত্ত্ব' সংক্রান্ত বিষয়গুলি।

২। ন্যায়ের পাঁচটি অবয়ব (syllogism) আছে, যথা—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ উপনয় ও নিগমন—"অয়ং বহ্নিমান্, (ক) ধূমাৎ, (খ) যো যো ধূমবান্ স বহ্নিমান্, (গ) বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ অয়ং (ঘ) তস্মাৎ বহ্নিমান্ ইতি।" (ঙ)—তর্কামৃত, ৩৭শ সূত্র। (ক) প্রতিজ্ঞা (general proposition); (খ) হেতু (reasoning); (গ) যথা, মহানসম্ (kitchen) উদাহরণ (instance); (ঘ) উপনয় (proof); (ঙ) ইতি নিগমন (conclusion) সিদ্ধান্ত।

উল্লেখ আছে। ন্যায়ের এই অংশে আত্মা যে নিত্য, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং আত্মাই যে দ্রষ্টা, ভোক্তা ও জ্ঞাতা, তাহা যুক্তি ও বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

মহর্ষি গোতম বলেন, জ্ঞান আত্মার স্বরূপ নয়, জ্ঞান আত্মা হইতে উদ্ভূত—জ্ঞান ক্ষণস্থায়ী, সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের অধীন। একই সময়ে দুই বা ততোধিক জ্ঞান একই ভাবে থাকিতে পারে না, একটি জ্ঞান লয় হইলে তবেই অপর একটি জ্ঞানের উদয় হয়। আমাদিগের অনেক সময়েই অবশ্য মনে হয় বুঝিবা একাধিক জ্ঞান একই সময়ে আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে; কিন্তু একাধিক জ্ঞান এত দ্রুত মনের মধ্যে কার্য্য করে এবং উহাদের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় এত দ্রুত ভাবে সংঘটিত হয় যে স্বতঃই আমাদের মনে হয় বুঝি বা সকলগুলিই একই সময়ে যুগপৎ আমাদের মধ্যে কার্য্যকরী হইয়া রহিয়াছে—বস্তুতঃ, পূর্ব্ব-জ্ঞানের সম্পূর্ণ ভাবে বিনাশ যে হয়, তাহা হয় না। প্রত্যুত, পূর্ব্ববর্ত্তী-জ্ঞান পরবর্ত্তী-জ্ঞানের কারণীভূত হয়; উদাহরণ স্বরূপে 'শতকমলপত্র বেধনবৎ', বলা যাইতে পারে। জ্ঞানের ক্ষণে ক্ষণে উক্তরূপ পরিবর্ত্তন অনেকটা ছায়াচিত্রের পট-পরিবর্ত্তনের ন্যায় —যদিও প্রতিক্ষণে ছায়াচিত্রপটের পরিবর্ত্তন হইতেছে তত্রাচ দর্শকমণ্ডলীর মনে তাহা একই পটের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। জ্ঞানের বিকাশ ও তাহার স্থিতি ও নিবৃত্তি এমনই ভাবে জীবের আত্মা হইতে উদ্ভূত হয় এবং জীব এই জ্ঞানে অভিমণ্ডিত হইয়া আত্মপরিচয় ও আত্মানুভূতি লাভ করে।

ন্যায় দর্শনের ৪র্থ অধ্যায়ের ১ম আহ্নিকে মহর্ষি গোতম অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি-নিরাস প্রসঙ্গে ঈশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনিই যে জগতের কারণ ও জীবের কর্ম্মফলদাতা তাহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যথা—

"ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মফলস্য দর্শনাৎ"

—ন্যায়সূত্র, ৪।১

ইহার ভাষ্যে বাৎস্যায়ন লিখিয়াছেন—

"পরাধীনং পুরুষস্য কর্ম্মফলারাধনম্ ইতি,
যদধীনং স ঈশ্বরঃ, তস্মাৎ ঈশ্বরঃ কারণম্ ইতি।"

—মানুষের কর্ম্মফলভোগ যাহার অধীন তিনিই ঈশ্বর। কুম্ভকার মাটি দিয়া ঘট নির্ম্মাণ করে, কুম্ভকার বা মাটির অভাবে কিন্তু ঘট নির্ম্মিত হইতে পারে না—এইরূপ প্রত্যেক কার্য্যের কর্ত্তা আছে; অর্থাৎ, কার্য্য যখন বিদ্যমান তখন তাহার নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ উভয়ই বিদ্যমান। এইরূপে ইহজগতের যিনি কর্ত্তা বা নিমিত্ত-কারণ তিনিই ঈশ্বর, এবং যাহা উপাদান-কারণ, ন্যায়দর্শনে মহর্ষি গোতম তাহাকে 'সৎ' বা 'পরমাণু' আখ্যা দিয়াছেন।

পরমাণু নিরবয়ব, অবিভাজ্য, অজ ও নিত্য। পরমাণু জড় বলিয়া তাহার কোনই স্বতন্ত্র ক্রিয়া নাই—ঈশ্বরেচ্ছায় পঞ্চভূতের পরমাণু মিলিত হইয়াই জগতরূপে প্রকাশিত হয়। দুইটি পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুক ও তিনটি দ্ব্যণুক সংযোগে ত্রসরেণু, এইরূপে ক্রমে ক্রমে মহাবয়বী পদার্থের উৎপত্তি। পদার্থ সমূহ কিন্তু অবয়বী এবং বিভাজ্য, কাজেই তাহাদের বিনাশ আছে। পরমাণু ও দ্ব্যণুক ইহারা প্রত্যক্ষ গোচরীভূত নহে, ত্রসরেণু প্রভৃতিই আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য।

জগতের প্রকাশ যেমন ঈশ্বরেচ্ছায় সংসাধিত হয়, তেমনই আবার ঈশ্বরেচ্ছায়—জগৎ ক্রম-বিভাগ দ্বারা যখন নিজ-কারণ পরমাণুতে মিলিত হয়, তখনই তাহার বিনাশ বা প্রলয় বা তিরোভাব হয়।

"ওঁ নমঃ পরমাত্মনে।"

বৈশেষিক দর্শন

মনু উপদেশ দিয়াছেন,—

"প্রশাসিতারং সর্ব্বেষামণীয়াংসমণোরপি।
রুক্মাভং স্বপ্নধীগম্যং বিদ্যাত্তং পুরুষংপরম্ ॥"

—মনুসংহিতা—১২।১২২

—যিনি আব্রহ্ম স্তম্ভ (ডাঁটা—stalk) পর্য্যন্ত সকল পদার্থের শাসনকর্ত্তা, যিনি অণু অপেক্ষাও অণু (অর্থাৎ, নিরাকার সূক্ষ্ম পদার্থ), যিনি সুবর্ণের আভার ন্যায় (অর্থাৎ জ্যোতিঃ-স্বরূপ, বিজ্ঞান প্রকাশমাত্র), যিনি স্বপ্ন-ধীগম্য (অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নন, কেবল মন দ্বারা দর্শনীয়), এমন যে শ্রেষ্ঠ-পুরুষ ঈশ্বর তাঁহাকে অবগত হও।" কেমন করিয়া এই পরম পুরুষকে অবগত হওয়া যায়? শ্রুতি বলিতেছেন,—

"ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মনা বা।
জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ত্বঃ
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানাঃ ॥"

—মণ্ডূকোপনিষৎ, ৩।১।৮

—চক্ষুঃ দ্বারা, কি বাক্য দ্বারা, কি অপরাপর ইন্দ্রিয় দ্বারা, কি তপস্যা কিম্বা যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেবল মাত্র বিশুদ্ধ-ভাব ব্যক্তিগণ জ্ঞান-প্রসাদে ধ্যান-নিরত হইয়া স্তুতি করিলে সেই নিষ্কলঙ্ক পরম-পুরুষকে দেখিতে পান।

"সম্‌-অনোরপি", অর্থাৎ অণু অপেক্ষাও অণু এই নিরাকার সূক্ষ্ম-অণু 'পুরুষ বিশেষকে' অবগত হইতে হইলে—দর্শন লাভ করিতে হইলে যে তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক বৈশেষিক দর্শনকার সেই বিশেষ-জ্ঞানই উপদেশ করিয়াছেন।

বৈশেষিকদর্শনের প্রবর্ত্তক কশ্যপবংশীয় 'পরম-বিপ্র' মহর্ষি উলূক, এবং তাঁহার রচিত দর্শনশাস্ত্রের নাম 'ঔলূক্য দর্শন'। প্রবাদ আছে মাত্র তণ্ডুলকণা ভক্ষণ করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া তাঁহারই আজ্ঞানুসারে মহর্ষি এই দর্শন খানি লিখিয়া গিয়াছেন এবং এই জন্যই তাঁহার অপর নাম 'কণাদ' এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত দর্শনের অন্য এক নাম কণাদ-দর্শন। বৈশেষিকদর্শন 'শাস্ত্র শিক্ষাকল্পে সোপান-স্বরূপ' বলিতে, পারা যায়; ইহাতে ঈশ্বরতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, জগতের উৎপত্তি কথন বা জীবের সহিত জগতের সম্বন্ধ বিচার প্রভৃতি দর্শনের জটিলতম বিচার-গুলির অবতারণা বা সিদ্ধান্ত নাই, আছে উক্ত তত্ত্বগুলি সম্যকরূপে যাহাতে বুঝিতে পারা যায়—প্রথম শিক্ষার্থীর মন দর্শনের উক্ত কঠিনতম প্রশ্ন গুলির মীমাংসা-কল্পে যাহাতে ক্রমশঃ প্রস্তুত হইতে পারে প্রধানতঃ এবংবিধ জড়-বিজ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয়, তথা পদার্থ-নিচয়ের ক্ষুদ্রতম অবয়ব পরমাণুর তত্ত্ব-নির্ণয়। এই প্রধানতম উদ্দেশ্যের সন্ধান না পাইয়া বা না লইয়া বৈশেষিক দর্শনের পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণ, "বৈশেষিকগণ", দর্শন শাস্ত্র প্রতিপাদ্য উক্ত জটিলতম বিষয় গুলির বিচার বা মীমাংসা করিতে গিয়া অন্যান্য দর্শন ও শ্রুতি-বিরুদ্ধ কণাদ-দর্শনের নানা মত স্থাপন করিয়াছেন এবং এই প্রবচন রচয়িতাদিগের মতই পরবর্ত্তী বেদান্তদর্শনে খণ্ডিত হইয়াছে।

কণাদ প্রণীত বৈশেষিকদর্শন-সূত্রের মূল গ্রন্থে মহর্ষি লিখিয়াছেন—

"অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ।" —১ম সূত্র।

"যতোভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি স ধর্ম্মঃ।" —২য় সূত্র।

"তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্।" —৩য় সূত্র।

"ধর্ম্ম বিশেষ প্রসূতাদ্ দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-
সমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং
তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সম্।" —৪র্থ সূত্র।

—অথ (শিষ্যগণ জিজ্ঞাসু হইয়া সমবেত হওয়ায়) অতঃ (তাহাদের মঙ্গল হেতু, তাহাদের ধর্ম্ম বিষয়ে মতিগতি বিধান মানসে) গুরু কণাদ মুনি বলিতেছেন, আমি ধর্ম্ম (জ্ঞান ও কর্ম্ম) ব্যাখ্যা করিব (তোমরা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর) । ১। যাহাতে অভ্যুদয় অর্থাৎ ইহকালে ও পরকালে সুখ লাভ হয় এবং যদ্দ্বারা নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ দুঃখের একান্ত-নিবৃত্তি হেতু মোক্ষ লাভ করা যায় তাহাই ধর্ম্ম। ২। ধর্ম্মের উক্ত উভয়বিধ রূপ—জ্ঞান ও কর্ম্ম, বেদোক্ত ঈশ্বরবাক্য, সুতরাং তাহাই প্রামাণ্য। ৩। বেদোক্ত ধর্ম্ম-বিশেষের অনুষ্ঠান হইতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ষড়বিধ ভাব-পদার্থের (of these six categories) সাধর্ম্ম ও বৈধর্ম্মজ্ঞান জনিত (their similarities & dis-similarities) তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইলে এবং তাহার বিকাশে নিঃশ্রেয়স বা দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি-হেতু জীব মুক্তি লাভ করিতে পারে; জীবের আত্ম-পরিচয় হয় ও জীব জগৎ-কারণ পরমেশ্বরকে অবগত হইতে পারে, দর্শন লাভ করিতে পারে—ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হয়। ৪।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, তথা-কথিত "বৈশেষিকগণ" কিন্তু এই মূল সরল-তত্ত্বের বিভিন্ন অর্থ করিয়া ও কণাদ-সূত্রের স্থানে স্থানে স্বরচিত কল্পিত-ব্যাখ্যার অবতারণা করিয়া অপরাপর দর্শনশাস্ত্র ও শ্রুতি-বিরুদ্ধ

নানা মত স্থাপন করিয়াছেন এবং উক্ত ব্যাখ্যাগুলি পরবর্তী দার্শনি পণ্ডিতগণ বৈশেষিক-সূত্রকার কণাদের মত বলিয়া ধরিয়া লইয়া মহর্ষি অহেতুক বিদ্রূপ করিতেও ছাড়েন নাই। যথা,

"ধর্ম্মং ব্যাখ্যাতু কামস্য ষট্‌পদার্থোপবর্ণনম্।
সাগরং গন্তুকামস্য হিমবদ্গমনোপমম্॥"

—ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির ষট্‌পদার্থ বর্ণন, সাগর গমনেচ্ছু ব্যক্তির হিমালয় গমনের ন্যায় উপহাসাস্পদ। আমরা দেখিয়াছি—মহর্ষি কণাদই "অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ" প্রথম সূত্রে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ষট্‌পদার্থের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই পরস্পর বিবদমান দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন প্রস্থান অনুসরণকারী পণ্ডিত-মণ্ডলী যদি একটু ধীর ভাবে বিবেচনা করিতেন তাহা হইলে কবি পুষ্পদন্তের উক্তির তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া বাগ্‌বিতণ্ডার বৃথা আড়ম্বরের মধ্য হইতে অক্লেশে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতেন। পুষ্পদন্ত বলিতেছেন—

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানপথজুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

—হে ভগবন্ জল যে পথেই যাউক না কেন পরিশেষে তাহা সমুদ্রেই যাইয়া পড়ে, সেইরূপ রুচির বৈচিত্র্য-হেতু সরল বা কুটিল পথগামী মানুষ, অর্থাৎ, রুচির তারতম্য অনুযায়ী মানুষ সত্যের যে প্রস্থান-বিশেষই অনুসরণ করুক না কেন, সকলেরই পক্ষে তুমিই একমাত্র গম্য অর্থাৎ সকলের মোক্ষই একমাত্র লক্ষ্য—ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সকলেরই একান্ত ঈপ্সিত বস্তু। তাহাই যদি, তবে বিবাদ বা মতান্তরের সার্থকতা কোথায়!

বৈশেষিকদর্শন দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটি করিয়া পরিচ্ছেদ আছে, ইহাদিগকে "আহ্নিক" বলে। সমগ্র দর্শনে ৩৭০টি সূত্র আছে। লঙ্কেশ্বর রাবণ এই বৈশেষিকদর্শনের একজন প্রাচীন ভাষ্যকার। প্রশস্তপাদ আচার্য্যের 'পদার্থ ধর্ম্ম সংগ্রহ' বৈশেষিক-দর্শন বিষয়ে একখানি প্রামাণিক বৃত্তি। উদয়নাচার্য্যের 'কিরণাবলী-প্রকাশ' ও 'লীলাবতী-প্রকাশ' এবং মথুরানাথ তর্কবাগীশের 'কিরণাবলী-রহস্য'—ও 'লীলাবতী-রহস্য' ও পঞ্চানন তর্করত্নের 'পরিষ্কার' নামক ব্যাখ্যা বৈশেষিকের কয়েকখানি উপাদেয় গ্রন্থ। উপরন্তু শঙ্করমিশ্রকৃত 'বৈশেষিক-সূত্রোপস্কার', জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন প্রণীত 'কণাদসূত্র-বিবৃতি', বিজ্ঞানভিক্ষুর অধুনা-দুষ্প্রাপ্য 'বৈশেষিক-বার্ত্তিক' প্রভৃতি বৈশেষিকদর্শনের গ্রন্থ-সমূহ বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, মহর্ষি কণাদ ষট্‌পদার্থবাদী। কণাদ বর্ণিত এই ছয় পদার্থের সহিত গ্রীক্‌দর্শনের 'categories of objects'-এর বিশেষ সাদৃশ্য বর্ত্তমান। ছয়টি পদার্থের বিবৃতি অতীব সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

(ক) প্রথম পদার্থ—দ্রব্য। দ্রব্য (substance) নয় প্রকার, যথা—

১। ক্ষিতি—Solid, শুধুই Earth নহে—attributive quality, smell—গন্ধ।

২। অপ—Liquid, শুধুই Water নহে—attributive quality, taste—রস।

৩। তেজ—Energy, Light or Heat নহে—attributive quality, Illumination—রূপ।

৪। বায়ু—Gas, air নহে—attributive quality neither hot or cold to the touch—স্পর্শ।

৫। আকাশ বা ব্যোম—Heaven, শুধুই Ether নহে
attributive quality, sound—*

৬। কাল—Period,
শুধু Time নহে } উভয়ই আকাশের গুণ *
৭। দিক—Space

৮। আত্মা—Soul, proved by the "I" idea—বিভু।

৯। মন, mind, internal organ of soul.—আত্মা।

ইহাদের মধ্যে প্রথম চারিটি দ্রব্য যথা, ক্ষিতি, অপ, তেজ ও ব (মরুৎ) *নিত্য ও অনিত্য ভেদে দুই প্রকার*—পরমাণু রূপে নিত্য এ পরমাণুর সঙ্ঘাতজনিত শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়রূপে অনিত্য। বৈশেষি মতে এই চতুর্ব্বিধ পরমাণু ও আকাশ প্রভৃতি পঞ্চদ্রব্য (আকাশ, কা দিক, আত্মা ও মন) নিত্য। একটা কথা এখানে বলিয়া রাখা বিশে প্রয়োজন বলিয়া বোধ করি। বৈশেষিকদর্শনে "নিত্য" শব্দ বিশে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; নিত্য দ্রব্য তাহাই, দৃষ্টতঃ যাহার উৎপত্তি ধ্বংস প্রতীয়মান হয় না—এই উভয় লক্ষণ যে দ্রব্যসমূহে থাটে না শ্রুতিতে কীর্ত্তিত 'অনাদি বা অনন্ত' অর্থে 'নিত্য' শব্দ বৈশেষিককা ব্যবহার করেন নাই। বৈশেষিক বলেন, আত্মা জ্ঞানের আশ্রয়, ইহা

---

* পাশ্চাত্য বিজ্ঞান উপস্থিত 'Time & Space'-এ সীমাবদ্ধ। Attributiv quality of কাল, Time—arrieved at by means of the idea quick or slow motion—Attributive quality of দিক—Space, indicate by the idea of east & west.

মানস-প্রত্যক্ষ হয়—আত্মা বিভু, কিন্তু শরীর-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। তাই শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন—

"দ্রব্যান্তর্গত এবাত্মা ভিন্নো জীবপরত্বতঃ।
দেবা মনুষ্যাস্তির্য্যঞ্চো জীবাস্ত্বন্যোমহেশ্বরঃ॥"

—সর্ব্ব-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, বৈশেষিক পক্ষ, ৩১ সূত্র।

—দ্রব্য অন্তর্গত এই যে আত্মা ইহা বিভিন্ন প্রকার, জীবস্বরূপ ও শিবস্বরূপ (in the form of individual soul & supreme soul)। দেবতা, মানুষ ও মনুষ্যেতর জীব (lower animals) ইহারা জীবাত্মা (individual soul), এবং পরমেশ্বর জীবাত্মা হইতে পৃথক—শুদ্ধাত্মা, শিবস্বরূপ (supreme soul)। কণাদ মতে 'মন অণু' (internal organ of the soul), ইহা আত্মা ও সুখ-দুঃখাদির প্রত্যক্ষের কারণ-স্বরূপ।

(খ) দ্বিতীয় পদার্থ—গুণ। এক। একাধিক জ্ঞান (attribute or quality) আশ্রয় করিয়া প্রত্যেক দ্রব্যই অবস্থিত। গুণ চব্বিশ প্রকার, যথা—

রূপ—Colour, Form etc., রস—Taste or Savour ; গন্ধ—Smell or Odour ; স্পর্শ—Touch or Tangibility ; সংখ্যা—Number ; পরিমাণ—Extension or Dimension, having Length, Height, Breadth—expanse, Space ; সংযোগ—Conjunction ; পৃথকত্ব—Severalty ; বিভাগ—Dividedness or Disjunction ; পরত্ব—Priority ; অপরত্ব—আগে পরে, Posteriority ; বুদ্ধি—Intellectious ; সুখ—Pleasure ; দুঃখ—Pain ; ইচ্ছা—Desire ; দ্বেষ—Aversion ; প্রযত্ন—

Effort or Volition ; শব্দ—Sound ; গুরুত্ব—Weight, Heaviness, Density ; দ্রবত্ব—Fluidity ; স্নেহ—Viscidity, Vicousity or Affection ; সংস্কার—Impresed Intimate Influence ; অদৃষ্ট বা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম—Merits & Demerits.

(গ) তৃতীয় পদার্থ কর্ম্ম। কর্ম্ম (action) পাঁচ প্রকার, যথা—
উৎক্ষেপণ—ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ—Movements upwards, Negative Force ; অবক্ষেপণ—নিম্নে ক্ষেপণ, Movement Downwards, Positive Force ; আকুঞ্চন—Contraction ; প্রসারণ—Expansion or Dilation ; গমন—Locomotion or General Motion).

. এই পাঁচ প্রকার কর্ম্ম ব্যতিরেকে অপর যাহা কিছু কর্ম্ম তৎসমুদয়ই গমনের অন্তর্গত।

(ঘ) চতুর্থ পদার্থ সামান্য। সামান্য—Generality as denoted by existence, এক কথায় Community বলা যাইতে পারে) বা জাতি ; সামান্য দুই প্রকার, যথা—
পরা—অধিক-দেশ ব্যাপী, যথা—প্রাণিত্ব জাতি (Genera), এবং অপরা—অল্প-দেশ ব্যাপী, যথা—মনুষ্যত্ব বা গোত্ব জাতি প্রভৃতি (Species).

(ঙ) পঞ্চম পদার্থ বিশেষ। বিশেষ অর্থে আত্মা, মন, কাল, স্থান, জগতের অবয়বী পদার্থ ও পরমাণু বুঝায় অর্থাৎ যে পদার্থ-ধর্ম্ম দ্বারা পরমাণু পরস্পরের পার্থক্য সিদ্ধ হয় (generality as denoted by substantiality & comparatively more comprehensive and of a higher order বা এক কথায় Particularity বলা

যাইতে পারে।) বিশেষ-পদার্থ কেবলমাত্র পরমাণু সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়। জগতের সমস্ত অবয়বী-পদার্থ নিজ নিজ অবয়ব-ভেদে পৃথক বলিয়া বোধ হয়, যেমন ঘট এবং পট উভয়ের মধ্যে আকার-ভেদ আছে বলিয়াই আমরা উহাদের পার্থক্য-বোধ ধারণা করিতে পারি। বৈশেষিক মতে পরমাণুরও প্রকার-ভেদ আছে, তবে তাহারা নিরবয়ব বলিয়া তাহাদের প্রকার-ভেদের কোন স্থূল নিদর্শন আমরা পাই না। যে সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয় পদার্থ পরমাণুদিগের প্রকার-ভেদ সংঘটিত করে (are understood as forming particularities) মহর্ষি কণাদ তাহাকেই "বিশেষ" আখ্যা দিয়াছেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ইহাকে 'Sub-atomic energy' বলা যাইতে পারে।

(চ) ষষ্ঠ পদার্থ সমবায়। সমবায় বা নিত্য-সম্বন্ধ, 'intimate relation or syntactical connection' বুঝায়, কিম্বা এক কথায় 'coherence' বলা যাইতে পারে। অবয়বীর সহিত অবয়বের, জাতির সহিত ব্যক্তির, গুণের সহিত গুণীর, ক্রিয়ার সহিত দ্রব্যের এবং বিশেষের সহিত নিত্য-পরমাণুর যে সম্বন্ধ, তাহার নাম সমবায়—বস্ত্র ও সূতার যে সম্বন্ধ, তাহাই সমবায়।

উক্ত এই ষড়-বিধ পদার্থ ব্যতিরেকে প্রশস্তপাদাচার্য্য স্বরচিত "পদার্থ-ধর্ম্ম-সংগ্রহ" গ্রন্থে "অভাবসপ্তমানাম্"—এইরূপ ভাবে অভাব-পদার্থের অবতারণা করিয়া অভাব (Non-existence) নামে অপর একটি সপ্তম-পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন। বল্লভাচার্য্যও সপ্ত-পদার্থবাদী, তিনি কণাদের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়া, "অভাবশ্চ বক্তব্যঃ", এইরূপ বাক্-চাতুর্য্যে কণাদের মুখ হইতে অভাবের কথা বাহির করিয়া লইয়াছেন এবং অনেকে এই কারণেই কণাদকে সপ্ত-পদার্থবাদী বলিয়া মত প্রকাশ

করিয়াছেন। কিন্তু, সাংখ্য ও মীমাংসাদি দর্শনশাস্ত্রে অভাবের বিষয় উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও এই সকল দর্শনে কেহই অভাবকে পদার্থরূপে বর্ণনা করেন নাই। বস্তুতঃ, অভাব বা অসৎ একটি স্বতন্ত্র পদার্থ নহে—কেন, পরে উক্ত হইতেছে। অভাব দুই প্রকার, যথা—

১। সংসর্গাভাব বা সম্বন্ধের অভাব।

২। অন্যোন্যাভাব বা ভেদ, যথা ঘটে পটের যে অভাব—এ অভাব "একরূপে সৎ অপররূপে অসৎ।"

আবার, সংসর্গাভাব ত্রিবিধ যথা—(ক) প্রাগ্‌ভাব. (খ) ধ্বংসাভাব, (গ) অত্যন্তাভাব।

(ক) পূর্ব্বে যাহা ছিল না, এখন আছে, তাহাই প্রাগ্‌ভাব, যথা—সূত্রে বস্ত্রাভাব। বস্ত্রকে 'প্রাগ্‌সৎ' বস্তু বলে।

(খ) পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখন নাই, তাহাই ধ্বংসাভাব—বিনষ্ট বস্তুকে 'সদসৎ' বলে।

(গ) পূর্ব্বে যাহা ছিল না এবং আর কখনও হইবে না, তাহার নাম অত্যন্তাভাব, যথা—জড়ে চেতনের অভাব বা 'অসৎ'-এ 'সৎ'-এর অভাব।

অভাব কি? তাহার স্বরূপই বা কি? অভাব 'পদার্থ' কি না? এ সকল বিষয়ের মীমাংসাচার্য্যভট্ট বেশ পরিষ্কার উত্তর দিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন—

"ভাবান্তরমভাবো হি কয়াচিত্তু ব্যপেক্ষয়া।"

—কোনরূপ বৈলক্ষণ্যের অভিপ্রায়ে এক ভাবপদার্থ অপর ভাবপদার্থের (ষট্‌-পদার্থের) অভাব-রূপে ব্যবহৃত হয়। কাজেই, অভাব লইয়া এত 'কাটাকাটি মারামারি' করিবার কোন আবশ্যকতাই নাই; কারণ, অভাব

বলিয়া কোন স্বতন্ত্র-পদার্থ নাই। একটি উদাহরণ লইলে বিষয়টি বেশ পরিষ্কার হইয়া যাইবে—'বেদীতে ঘট আছে' এই বাক্যে অভাবের কোন কথাই উঠে না। ধরিয়া লওয়া যাউক, ঘটটি স্থানান্তরিত করা হইল—কাজেই তখন বলিতে হইবে 'বেদীতে ঘট নাই' বা 'বেদীতে ঘটাভাব আছে'। কাজেই 'ঘট আছে' একথা ব্যবহার হয় তখন, যখন 'ঘট বেদীতে থাকে' এবং যখন 'বেদীই কেবলমাত্র থাকে' তখনই ঘটাভাবের ব্যবহার হয়—অর্থাৎ, 'ঘটের অভাব বেদীর কেবল অবস্থা' ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব অভাব যে একটি পদার্থ তাহাতে অবশ্য কোনই সন্দেহ নাই, তবে ইহা অতিরিক্ত কোন পদার্থ নহে ; বস্তুতঃ, এক প্রকার ভাব-পদার্থ ই অন্য প্রকার ভাব-পদার্থের অভাব-রূপে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়।

কণাদের পরমাণুবাদ।[১] মহর্ষি কণাদ বলিতেছেন, পরমাণু সৎ, নিত্য, অনুমেয়, অবিভাজ্য ও অকারণ। অকারণ এইজন্য, যে পরমাণুই ঘট বা পট ইত্যাদির কারণ, ঘট বা পট পরমাণুর কারণ নহে। যদি আমরা ঘট প্রভৃতি অবয়ব-বিশিষ্ট দ্রব্যের অবয়ব বিভাগ করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে আমরা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতম অবয়বে উপনীত হইতে হইতে শেষে এমন অবয়বে আসিয়া পৌছিব, যাহা আর বিভাগ করা যায় না—যাহার বিভাগই হইতে পারে না ; যাহা অবিভাজ্য বা অভেদ্য, পরম সূক্ষ্ম পদার্থ, "পরমবিপ্র" কণাদ তাহাকেই "পরমাণু" আখ্যা দিয়াছেন। পরমাণু অতীন্দ্রিয়, তাই তাহা অনুমেয় অর্থাৎ অনুমান সাপেক্ষ। পরমাণুর উৎপত্তি নাই বিনাশ ও নাই, এই অর্থে পরমাণু নিত্য। পরমাণু ভাব-পদার্থের অন্তর্গত, এই জন্য ইহা সৎ। দুইটি

১। ইহাই প্রাচীনতম পরমাণুবাদ— The first Atomic Theory ever propounded.

পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুক ও কয়েকটি দ্ব্যণুকের সংযোগে ত্রসরেণু উৎপন্ন হয় এবং এইরূপে ক্রমে ক্রমে মহাবয়ব-দ্রব্য উৎপন্ন হয়। † পাশ্চাত্য বিজ্ঞানোক্ত 'molecule', দ্ব্যণুক হইতে মহাবয়ব সমস্ত অবয়ব বিশিষ্ট পদার্থের সাধারণ নাম। অত্যন্তাবয়ব পদার্থের নাম 'body', কণাদোক্ত দ্ব্যণুক পাশ্চত্য বিজ্ঞানের (negative 'electron' & positive 'Proton.') এবং তাঁহার বিবৃত ত্রসরেণুকে উক্ত বিজ্ঞানে বিবৃত 'atom' বলা যাইতে পারে। ‡

---

† "The cardinal principle of Kanada is that all material substances are aggregates of atoms. The atoms are simple & eternal, the aggregates or compounds only are perishable by disintegration...The first compound is of four atoms ; the next consists of three double atoms & so on, In this way two earthly atoms acting under an uuseen law, 'adrista', constitute a double atom of earth ; three binary atoms constitute a tertiary atom ; four tertiary atoms make a quarternary atom ; so on to gross, grosser, and grossest masses of earth. In this manner the great earth is produced, the great water is thus produced from aqueous atoms, great light for luminous atoms, and great air from aerial atoms."—R. C. Dutt in 'Early Hindu Civilisation'

‡ "Six drops of water containing several 1000 millions & millions & millions of atoms. Each atom is about 1/100th of an inch in diameter. Here we marvel at the minute delicacy of the workmanship. But this is not the limit, within the atom are the much smaller electrons pursuing elliptic orbits, like planets round the Sun, in a space which relatively to the size is no less roomy than the solar system. The electrons are the lightest thing known weighing 1/1840 of the lightest atom. It is simply a charge of

পরমাণুর আরও একটু বিশিষ্ট-পরিচয় লওয়া যাউক। মহর্ষি কণাদ বলিতেছেন, রূপ ও মহত্ব বহির্দ্রব্য ও তদ্‌গত ক্রিয়া গুণাদির প্রত্যক্ষের কারণ, পরমাণুর রূপও নাই মহত্বও নাই, সেইজন্য পরমাণু অপ্রত্যক্ষ। আবার মহত্বও গুণগত নহে, দ্রব্যগত, তাই সাধারণ ঘট এবং পটাদি দ্রব্য পরমাণুর স্বরূপ নয়, ইহারা পরমাণুপুঞ্জের সমষ্টিবদ্ধ দ্রব্যান্তর এবং এই দ্রব্যান্তরের নাম অবয়বী অর্থাৎ ইহাদের অবয়ব আছে। যে জাতীয় পরমাণু অবয়বীর আরম্ভক বা জনক, অবয়বীও সেই জাতীয় হইবে, পরমাণুপুঞ্জও এই জন্য অতিরিক্ত অবয়বী। রূপ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়,

---

negative electricity wanding about alone. An atom consists of a nuclers which is usually surrounded by a girdle of electrons. It is often compared to a miniature solar system & the com-parson gives a proper idea of the emptiness of an atom. The nucleus is compared to the Sun and the electrons to the planet. Each kind of atom, each chemical element has a different quorum of planet electrons—when we meet with an atom incompletely dressed and lost one or two electrons from its system we call it an 'ion.'—So far as the constitution of the atom is concerned it may be recaled that the real atom contains something which it has not entered into the minds of men to conceive. This "Something" is spread out in a manner by no means comparable to an electron describing an orbit. If the atom is excited into successively higher and higher quautum (quantum of action) states this "Something" begins to draw itself more and more together until It begins sketchily to outline an orbit and even imitates a conden-sation running round. And when the quantum number reaches infinity and the atom bursts, a genuine classical electron flies out and crystallises like a genii emerging from a bottle."

—Sir A, S. Eddington in "Stars & Atoms."

পরমাণুর রূপ নাই—প্রচুর পরিমাণে পরমাণু মিলিত হইলেও উহা দৃষ্টি-গোচর হয় না। বস্তুতঃ, পরমাণু অতীন্দ্রিয়, আর এই জন্যই পরমাণু দ্বারা সমারব্ধ অবয়বী অঙ্গীকৃত হইয়াছে,—প্রমাণ, 'একঃ স্থূলো মহান্ ঘটঃ', এই প্রত্যক্ষ অনুভূতী। কণাদের মতে, অদৃষ্ট কারণ-বিশেষদ্বারা পরমাণু সমুদয়ের সংযোগে হইয়া বিশ্বসংসারের উৎপত্তি হইয়াছে।

কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে বৌদ্ধ দার্শনিকেরা কিন্তু অদৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ হইতে দৃশ্য পরমাণুপুঞ্জের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহারা পরমাণু লইয়া বিশেষ ও বিশদ-ভাবে সমালোচনা করিয়াছেন ; বাহুল্য-ভয়ে এস্থলে সে সকল বিষয়ের অবতারণা করা হইল না।

মহর্ষি কণাদ এই পদার্থতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান ব্যতিরেকেও মুক্তির জন্য যে আত্মার শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্যক শ্রুতিউক্ত এই বিধি বিষয়ে বারংবার উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত বৈশেষিকদর্শনের কোন স্থানেই তিনি বেদ-বিরুদ্ধ কোন কিছুরই অবতারণা করেন নাই। অধিকন্তু গ্রন্থারম্ভে—১ম অধ্যায়ের ১ম আহ্নিকে, যে তৃতীয় সূত্রের উল্লেখ করিয়া 'বেদই ধর্ম্মসম্বন্ধে মুখ্য প্রমাণ' ব্যাখ্যা করিয়াছেন, গ্রন্থ পরিসমাপ্তিতেও সেই একই সূত্রের উল্লেখ করিয়া উক্ত বিষয়ের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, যথা—

"তৎবচনাৎ আম্নায়স্য (বেদস্য) প্রমাণম্ ইতি।"

—বৈশেষিক, ১০ম অঃ ২য় আঃ, ৯ম বা শেষ সূত্র।

কণাদ আরও বলিয়াছেন মনন অনুমানের দ্বারা সাধিত হয়, অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞান না হইলে হইতে পারে না, আবার পদার্থজ্ঞান না জন্মিলে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় না ; কাজেই মহর্ষি বলিলেন, পরম্পরা-সম্বন্ধে পদার্থগুলির

বিশেষ-জ্ঞানই আত্ম-পরিচয়ের হেতু, তথা, মুক্তির উপায়। উপরন্তু আত্মা ও অনাত্মা উভয়বিধ পদার্থের জ্ঞান হইলে অনাত্মা-পদার্থ ত্যাগ করিয়া জীব আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ করে,-মোক্ষের অধিকারী হয়—ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হয়। মহাভারতের মধ্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহর্ষি বেদব্যাসও এই গূঢ়-রহস্যের ইঙ্গিত দিয়া তাই বলিয়াছেন—

"একত্ববুদ্ধি মনসোরিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
আত্মানোব্যাপিনস্তাত জ্ঞানমেতদনুত্তমম্ ॥"

—বৎস, বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় সমূহকে বাহ্য-বৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিয়া সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাতে লীন করাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান বলিয়া জানিও। মহর্ষি কণাদ এই বিশেষ-জ্ঞান লাভের উপায় স্বরূপ একটি প্রকৃষ্ট পন্থারই তাঁহার বৈশেষিকদর্শনে নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

"ওঁ হরিঃ ওঁ।"

মীমাংসাদর্শন

তৈত্তিরীয় সংহিতার প্রথম কাণ্ডে প্রথম প্রপাঠকের প্রথম অনুবাকে উক্ত হইয়াছে—

"বেদাস্তাবৎ কাণ্ডদ্বয়াত্মকঃ।
তত্র পূর্ব্বস্মিন্ কাণ্ডে নিত্যনৈমিত্তিক
কাম্য নিষিদ্ধরূপং চতুর্ব্বিধং কর্ম্ম প্রতিপাদ্যম্॥
অত উত্তরকাণ্ড আরব্ধব্যঃ।
আত্যান্তিক পুরুষার্থসিদ্ধিশ্চ দ্বিবিধা।
সদ্যোমুক্তি ক্রমমুক্তিশ্চেতি।
অস্মাদুত্তরকাণ্ডে ব্রহ্মোপদেশো
ব্রহ্মোপাস্তিশ্চেত্যুভয়ং প্রতিপাদ্যতে॥"

—সমগ্র বেদ দুইকাণ্ডে বিভক্ত। তন্মধ্যে পূর্ব্বকাণ্ডে, ১ম—নিত্য, ২য়—নৈমিত্তিক, ৩য়—কাম্য, ৪র্থ—নিষিদ্ধ, এই চারিপ্রকার কর্ম্মের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে—এ সকলগুলিই প্রবৃত্তিলক্ষণাক্রান্ত ধর্ম্ম। পূর্ব্বকাণ্ড শেষ করিয়া উত্তরকাণ্ড পাঠ আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। সদ্য মুক্তি ও ক্রমমুক্তি এই দুইরূপে আত্যান্তিক পুরুষার্থ-সিদ্ধি বা অপবর্গ বা মুক্তি দুই প্রকার; বেদের উত্তরকাণ্ডে এইজন্য ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ এবং ব্রহ্মোপাসনা এই দুইটি বিষয় প্রতিপন্ন করা হইয়াছে—এ দুইটিই নিবৃত্তিলক্ষণাক্রান্ত ধর্ম্ম। বেদের প্রথম ভাগ, উক্ত পূর্ব্বকাণ্ড বা কর্ম্মকাণ্ড আশ্রয় করিয়া যে মীমাংসাদর্শন প্রবর্ত্তিত তাহা পূর্ব্বমীমাংসা নামে খ্যাত, এবং বেদের

দ্বিতীয় ভাগ উক্ত উত্তরকাণ্ড বা দেবতা ও জ্ঞানকাণ্ড আশ্রয় করিয়া যে মীমাংসাদর্শন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার নাম উত্তরমীমাংসা। কাজেই প্রতিপাদ্য বিষয়ভেদে সমগ্র মীমাংসাদর্শন ত্রিবিধ এবং বিংশ অধ্যায়ে বিভক্ত, যথা—

(ক) প্রথম দ্বাদশ অধ্যায়—জৈমিনি প্রবর্ত্তিত "মীমাংসাদর্শন",

(খ) মধ্য চারি অধ্যায়—বেদব্যাস প্রবর্ত্তিত বেদান্তের অধুনালুপ্ত "দেবতাকাণ্ড,"

(গ) অন্ত চারি অধ্যায়—বেদব্যাস প্রবর্ত্তিত সুপরিচিত "বেদান্তদর্শন।"

বেদব্যাস-শিষ্য মহর্ষি জৈমিনিই পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের প্রথম আচার্য্য এবং কর্ত্তা, অর্থাৎ প্রণেতা এবং সাধারণত ইহা "মীমাংসাদর্শন" বলিয়াই পরিচিত। মীমাংসাদর্শনের আর এক নাম "জৈমিনিদর্শন।"

মহর্ষি জৈমিনি রচিত মীমাংসাদর্শন সুবৃহৎ গ্রন্থ, দ্বাদশ অধ্যায়ে ইহা সমাপ্ত। জৈমিনি এক একটি বিষয়ের সিদ্ধান্তকে 'অধিকরণ' এই আখ্যা দিয়াছেন, প্রতি অধিকরণের পাঁচটি করিয়া অঙ্গ আছে, যথা—
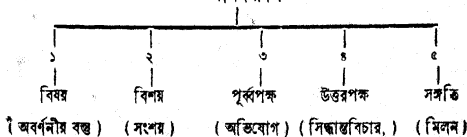
শবরস্বামীভট্ট মীমাংসাদর্শনের ভাষ্যকার। প্রভাকর প্রণীত ভাষ্য ও কুমারিলভট্টের 'মীমাংসা-ভট্টিকা' এই দুইখানিও মীমাংসাদর্শনের ভাষ্য গ্রন্থ।

বেদের কর্ম্মকাণ্ড প্রধানতঃ যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান-প্রক্রিয়া এবং সেগুলির মধ্যে কোনটি সম্পন্ন করিলে কি কি ফল লাভ করা যায় তাহারই বিস্তারিত বিবরণ ও নির্দ্দেশ আছে। জৈমিনি বলেন, বেদ অপৌরুষেয় (revealed) ও নিত্য (eternal) বলিয়া বেদোক্ত যাগ-যজ্ঞ-বিধি সমস্তই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, কর্ম্মবহুল এবং পুরুষার্থ-সিদ্ধির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়।

মহর্ষি জৈমিনি সেই জন্য বেদের সদর্থ-ব্যাখ্যা মানসে, বেদোক্ত মন্ত্রের সন্দেহজনক স্থলে অসদর্থ করিয়া লোকে যাহাতে অসৎগামী না হয় এবং আপাততঃ বিরুদ্ধার্থরূপে প্রতীয়মান বেদবাক্য সমূহের মীমাংসাকল্পে লোকে যাহাতে প্রকৃষ্ট-জ্ঞান লাভ করিতে পারে, এই অতীব মহান উদ্দেশ্য লইয়া মীমাংসাদর্শন রচনা করিয়াছেন। আরও এক কথা, যে যে বিষয়ে বেদের সহিত স্মৃতির বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয়, তত্তদ্বিষয়ের মীমাংসা এই জৈমিনিদর্শনে আছে বলিয়া ইহাকে শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যবর্ত্তী-গ্রন্থ বলা যাইতে পারে।

মীমাংসাদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি স্বনামধন্য স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার রচিত "Early Hindu Civilization" গ্রন্থে পরিষ্কার ভাবে, অতীব সংক্ষেপে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, যথা—

"The Principal topics of the Purva Mimansa Sutras :

First Chapter treats of the authority of enjoined duties.

Second to Fourth Chapters treat of the varieties of duty, supplimental duties and the purpose of the performance of duties.

Fifth Chapter treats of the order of the performance of duties.

Sixth Chapter treats of the qualification of duties.

Seventh to Eighth Chapters treat of the indirect precepts.

Ninth Chapter treats of the inferable changes,

Tenth Chapter treats of the exceptions of changes.

Eleventh Chapter treats of the efficacy.

Twelvth Chapter treats of the co-ordinate effect."

জৈমিনি দর্শনের প্রথমেই আছে—

"অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা।"

—মীমাংসাদর্শন, ১ম সূত্র।

—আচার্য্য প্রেরিত হইয়া যে যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা হয়, জৈমিনিদর্শনে তাহাকেই 'ধর্ম্ম' বলা হইয়াছে; অর্থাৎ, আচার্য্যের উপদেশ অনুসারে অনুষ্ঠিত যাগ-যজ্ঞাদির নামই ধর্ম্ম।

"য এব শ্রেয়স্করঃ স এব ধর্ম্মশব্দেনোচ্যতে।"

—মীমাংসাদর্শন, ১।২য় সূত্রভাষ্য।

—যাহা অনুষ্ঠান করিলে মঙ্গল হয় তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম শব্দের এইরূপ সংক্ষিপ্ত ও সর্ব্বব্যাপক অর্থ-নির্ণয় (definition) খুব অল্পই দৃষ্ট হয়। ধর্ম্ম অর্থে শুধুই 'Religion' বুঝায় না, তবে 'Religion'-এর অর্থ নির্ণয়ে পাশ্চাত্য-দর্শনে সুপণ্ডিত 'Newman Smith' অনেকটাই উপরোক্ত রূপেই ব্যাখ্যা সবিস্তারে দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"Religion is an inward life, a meditation, a waiting,

a listning, a hush and hope of the soul ; man's hour before Heaven's dawn. But religion is also action. It is taking the purse—all the purse which one has—and the traveller's wallet and even if need be, a soldier's sword."

পাশ্চাত্য দার্শনিক 'Max Muller' একস্থানে বলিয়াছেন—

"Religion places the human soul in the presence of its highest ideal, it lifts it above the level of ordinary goodness and produces at least a yearning after the higher and better life—a life in the light of God."

কিন্তু, এইগুলি 'য এব শ্রেয়স্করঃ স এব ধর্ম্ম' এই অর্থ-নির্ণয়ের তুলনায় অনেক নিম্নস্তরের। মহর্ষি জৈমিনি কর্ম্মকেই প্রধান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি "কর্ত্তা" স্বীকার করেন না ; তাঁহার মতে কারণ ব্যতিরেকে যখন কোন কার্য্যই সম্ভবে না তখন কর্ত্তৃত্বেরও কারণ আছে—যাহা একের কর্ত্তা তাহা আবার আর একটির কর্ম্ম, এবং এই প্রকারে ধারাবাহিকরূপে এক মহান-কর্ম্মস্রোত চলিতেছে। "কর্ত্তা" এই ক্রমিক কর্ম্মস্রোতেরই একটি অংশ বা অবস্থা বিশেষ। কর্ম্মের শেষ নাই ; কর্ম্ম হইতেই উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হয়। নদীর জলের পরিবর্ত্তন হইতেছে প্রতিক্ষণেই, কিন্তু নদী যেমন চিরদিনই বহিতেছে তেমনই একটি কর্ম্মের উৎপত্তি, স্থিতি ও ল হইলেই অপর কর্ম্মের উদ্ভব হইতেছে এবং এই কর্ম্মধারার বিরাম কিম্বা বিশ্রাম কিছুই নাই। অন্য যাহা কিছু—সুখ-দুঃখ-ভয়, উন্নতি-অবনতি, বদ্ধতা-মুক্তি, গুরুত্ব-দেবত্ব প্রভৃতি সমস্তই কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন, কর্ম্মেরই রূপান্তর মাত্র।

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মীমাংসাদর্শন সম্বন্ধে যে

মন্তব্য তাঁহার "শ্রীগোপাল বসু মল্লিক ফেলোসিপ" বক্তৃতায় দিয়াছেন, প্রত্যেক শ্রদ্ধান্বিত দর্শন-পন্থির তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—

"সত্য বটে, জৈমিনির কর্ম্ম-মীমাংসা কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদবাক্যাবলীর মীমাংসায় পর্য্যবসিত। মীমাংসাদর্শনের প্রয়োজন মুক্তি নহে, কর্ম্মের অবরোধ মাত্রই (একান্ত অনুষ্ঠানই) তাহার প্রয়োজন। কিন্তু মুক্তি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য হইলেও পরোক্ষভাবে কর্ম্মও মুক্তি সম্পাদন করে, কেন না কর্ম্ম দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধি না হইলে তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হয় না —অতএব মুক্তি মীমাংসাদর্শনের সাক্ষাৎ-প্রয়োজন না হইলেও পরম্পরা-প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ চিত্তশুদ্ধির একমাত্র কারণ কর্ম্ম ও তাহাই মীমাংসাদর্শনের আলোচ্য বিষয়। * * * আর এক কথা, মুক্তি আর অমৃতত্ব এক পদার্থ, ইহা সমস্ত দার্শনিকদিগের অবিসংবাদী সিদ্ধান্ত, আর বেদে আছে সোম যাগ করিলে অমৃতত্ব লাভ হয়—মুক্তি ও অমৃতত্ব এক কথা। অতএব বলা যাইতে পারে যে জৈমিনিদর্শনেরও প্রয়োজন মুক্তি, তবে জৈমিনি যাহাকে মুক্তি বলেন অপর দার্শনিকেরা তাহাকে মুক্তি বলেন না। জৈমিনির মতে মুক্তি আত্মস্বরূপ নহে, স্বর্গাদির ন্যায় লোকান্তর বা স্বর্গবিশেষ, কাজেই জৈমিনি-সম্মত মুক্তি ও অপরাপর দার্শনিকের সম্মত মুক্তি ভিন্ন ভিন্ন, একরূপ নহে, এই মাত্র প্রভেদ—ইহাতে কিন্তু যায় আসে না। প্রচুর পরিমাণে দার্শনিকদিগের পরস্পর মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে দর্শন সকলের প্রস্থান-ভেদই এইরূপ মতভেদের কারণ। * * * রামানুজ স্বামীর মতে জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসা ও বেদব্যাসের উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত, এই দুইটি, ভিন্ন ভিন্ন দর্শন নহে—উভয় মিলিয়া একটি দর্শন, একই

দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন অংশ তাঁহারা প্রণয়ন করিয়াছেন—অর্থাৎ বেদের কর্ম্মকাণ্ডাংশ জৈমিনি ও জ্ঞানকাণ্ডাংশ বেদব্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন—কাজেই উভয় মিলিয়া একই মীমাংসা দর্শন। * * * এই মতে মীমাংসা দর্শনের উদ্দেশ্য যে মুক্তি তাহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। লোক-প্রসিদ্ধি-হেতু একটির নাম মীমাংসাদর্শন এবং অপরটি বেদান্তদর্শন বলিয়া খ্যাত।"

শব্দ প্রমাণ, অর্থাৎ বেদকেই, জৈমিনি সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। প্রত্যক্ষ-প্রমাণ তাঁহার মতে শব্দ-প্রমাণ হইতে নিকৃষ্ট এবং অনুমান ও উপমান এই প্রত্যক্ষেরই অধীন। জৈমিনি বলেন, ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে পারি না, কাজেই প্রকৃষ্ট-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শব্দকেই অর্থাৎ বেদকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে স্বীকার করিতে হইবে।

মহর্ষি জৈমিনির বেদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারে একটু কিন্তু বিশেষত্ব আছে। জৈমিনি বলেন, বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান এবং মন্ত্র-সাধন আমাদের একান্ত ও অবশ্য কর্ত্তব্য। মন্ত্রের নিমিত্তই মন্ত্র-সাধন ও যজ্ঞাদি কর্ম্মের নিমিত্তই যজ্ঞানুষ্ঠান এবং এই যজ্ঞ এবং মন্ত্র কর্ম্মীকে শুভাশুভ ফল দান করে। জৈমিনিদর্শনে মন্ত্রাতিরিক্ত দেবতা স্বীকৃত হয় নাই। যদি কোন ঘটে ইন্দ্রের আবাহন করা যায় এবং দেবরাজ ইন্দ্র তাহাতে অধিষ্ঠিত হন তাহা হইলে ঐরাবতে আরূঢ় ইন্দ্রের ভারে ঘট চূর্ণ বিচূর্ণ হইবারই কথা; অপর পক্ষে ক্ষুদ্র ঘটটিতে যুগপৎ এক অতিকায় ঐরাবত ও তাহার পৃষ্ঠে আরূঢ় ইন্দ্রের স্থিতি অসম্ভব—কাজেই যে মন্ত্রে যে দেবতার আবাহন করা হয় সেই মন্ত্রকেই সেই দেবতা (শরীরীরূপে নহে) বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে আর কোনই গোল থাকে না। আবার মন্ত্রাদিতে বর্ণিত কোন

পিতৃপুরুষ বা দেবতা বা ঈশ্বর আমাদিগকে কর্ম্মফল দান করিবেন এরূপ কল্পনা করা উচিত নহে, কারণ কল্পনা আমাদিগের মানসিক ব্যাপার মাত্র, বেদ-বিহিত নহে। এই বিষয়ে 'মলমাসতত্ত্বে' মুমুক্ষুকৃত্য নামক প্রস্তাবে শ্রীরঘুনন্দনস্মার্ত্ত-ধৃত একটি সুন্দর বচন আছে। বচনটি এই—

"বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতুমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্য লভতে সিদ্ধিং রেচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥"

—অর্থাৎ, বেদোক্ত কার্য্য যাহা করিবে তাহা অনাসক্ত চিত্তে সম্পন্ন করিবে ও তাহার ফল ঈশ্বরে অর্পণ করিবে। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারাই জ্ঞান লাভ করিয়া মানুষ কর্ম্ম হইতে বিরত হইতে পারিলে তবেই সিদ্ধি লাভ করে। স্বর্গসুখাদি নানা প্রকার ফলশ্রুতি যাহা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে তৎসমুদয়ই অজ্ঞান লোকদিগের ধর্ম্মবিষয়ে আসক্তি উৎপাদনের নিমিত্ত প্ররোচনা মাত্র, যথা—

"ভৈষজ্যে ঔষধে রুচ্যৎপাদনং।"

—রঘুনন্দন ধৃত অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব স্মৃতি।

—যেমন চিকিৎসা শাস্ত্রে বর্ণিত ঔষধ সমূহে রুচি করণার্থ নানা প্রকার মোদকের ব্যবস্থা আছে, সেইরূপ।

অনেক দার্শনিকদিগের মতে মহর্ষি জৈমিনি নিরীশ্বরবাদী। বাস্তবিক কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। তিনি বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা ও তাহার স্বরূপ কথনেই ব্যাপৃত, তাঁহার মীমাংসাদর্শনে কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনেই তিনি বদ্ধপরিকর—জ্ঞান বা আত্মতত্ত্ব বা মুক্তি এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণেরই তিনি অবতারণা করেন নাই—'সে পথ দিয়াই

চলেন নাই'—কারণ উক্ত জ্ঞানাদিতত্ত্ব লাভ করিতে হইলে প্রথমে যাহা একান্ত আবশ্যক সেই সত্ত্বশুদ্ধি হেতু কর্ম্মেরই ব্যাখ্যা এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি-পাদন করিয়াছেন।

দর্শন ব্যতিরেকেও মহর্ষি জৈমিনি একখানি সংহিতা রচনা করিয়াছেন, এবং ইহা 'জৈমিনি-ভারত' বলিয়া খ্যাত। মহাভারতের অন্তর্গত অশ্বমেধ পর্ব্ব জৈমিনির রচিত এবং জনসাধারণের মধ্যে ইহাই লোকপ্রবাদ যে পাঁচ জন ঋষির নাম উচ্চারণ করিলে বজ্রাঘাত নিবারিত হয় ও এই বজ্রবারক পাঁচ জন ঋষির মধ্যে জৈমিনি অন্যতম। যথা—

"জৈমিনিশ্চ সুমন্তশ্চ বৈশম্পায়ন এব চ ॥
পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব পঞ্চৈতে বজ্রবারকাঃ ॥"

—ইহাতেই বুঝা যায়, তড়িৎ (Electricity) বিদ্যাতেও জৈমিনি মুনির সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল।

"ওঁ তৎসৎ।"

বেদান্তদর্শন

"গণেশ ব্রহ্মেশ সুরেশ শেষাঃ সুরাশ্চ সর্ব্বে মনবো মুণীন্দ্রাঃ।
সরস্বতী শ্রীগিরিজাদিকা যম্ নমস্তি দেব্যঃ প্রণমামি তং বিভুম্॥"

—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, ১ম সূত্র।

বেদান্ত দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি বাদরায়ণ; ইনিই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস নামে বিখ্যাত—ইহাঁর প্রকৃত নাম কৃষ্ণ, দ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার উপনাম হয় দ্বৈপায়ন, এবং বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ব্যাস (অর্থাৎ বিভাগ কর্ত্তা) এই আখ্যা লাভ করেন।

সমগ্র বেদ "পূর্ব্বকাণ্ড" ও "উত্তরকাণ্ড" এই দুই ভাগে বিভক্ত, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বেদের উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত ব্রহ্ম বিষয়ক উপদেশ ও ব্রহ্মের উপাসনা, তথা আরণ্যক ও উপনিষদ, অর্থাৎ, 'ব্রহ্ম'ই বেদান্তদর্শনের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়—বেদান্তদর্শন এই জন্য 'ব্রহ্মসূত্র' নামেও অভিহিত হয়। বেদের উত্তর অর্থাৎ অন্ত-কাণ্ড অবলম্বনে রচিত বলিয়া বেদান্তদর্শনের সাধারণ নাম "বেদান্ত"।

বেদান্তদর্শন উত্তরমীমাংসা গ্রন্থের একটি ভাগ। সমগ্র উত্তর-মীমাংসার দুই ভাগ, একটি "দেবতাকাণ্ড" অপরটি "জ্ঞানকাণ্ড" এবং প্রত্যেকটি চারি অধ্যায় করিয়া আট অধ্যায়ে ইহা সম্পূর্ণ; উভয় কাণ্ডেরই সূত্রকার বেদব্যাস। প্রথম চারি অধ্যায় মন্ত্রোল্লিখিত দেবতার

মীমাংসায় নিয়োজিত—ইহাই দেবতাকাণ্ড এবং অপর চারি অধ্যায়—অর্থাৎ, জ্ঞানকাণ্ডই সুপরিচিত বেদান্তদর্শন। 'সর্ব্ব-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ' গ্রন্থে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"পূর্বাধ্যায় চতুষ্কেণ মন্ত্রবাচ্যত্র দেবতা।
সঙ্কর্ষণোদিতা তদ্ধি দেবতাকাণ্ডমুচ্যতে॥
ভাষ্যং চতুর্ভিবধ্যায়োর্ভগবদ্ধাদ নির্মিতম।"

—সর্ব্ব-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, উঃ প্রঃ ২১শ-২২শ সূত্র।

—উত্তর মীমাংসার পূর্ব্বার্দ্ধ, যাহা দেবতাকাণ্ড নামে অভিহিত করা হইয়াছে—যাহার ব্যাখ্যা বলরাম করিয়াছিলেন তাহা এখন কোথায়? কে বলিবে? ভাগবৎপাদ গোবিন্দ যে এই দেবতা-কাণ্ডেরই এক অপূর্ব্ব ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন তাহাই বা কোথায় আছে? কেই বা বলিয়া দিবে? ইহা জানিয়া রাখা কিন্তু বিশেষ আবশ্যক; আশা করি দর্শনপন্থিরা এ বিষয়ের অনুসন্ধানে তৎপর থাকিবেন।

ব্যাসদেব বেদান্তদর্শনে অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। জীবাত্মা ও ব্রহ্ম যে এক পদার্থ তাহা প্রতিপাদন করাই বেদান্তদর্শনের উদ্দেশ্য। বেদান্ত বলেন "সর্ব্বংখল্বিদংব্রহ্ম"—সমস্তই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই জগতের আদি কারণ।

"জন্মাদ্যস্য যতঃ।"

—ব্রহ্মসূত্র, ১ম পাদ ২য় সূত্র।

—'অস্য' অর্থাৎ এই বিশ্বের 'জন্মাদি' অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় এই তিন কার্য্যই যাঁহা হইতে সংসাধিত হয় তিনিই 'ব্রহ্ম'। তাঁহার পরিচয় কি? নিরালম্বোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, একসময়ে ঋষি ভরদ্বাজ ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া ব্রহ্মার সমীপে উপনীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"ভগবন্ কিং ব্রহ্মেতি?"—ভগবান! ব্রহ্ম কাহাকে বলে? ব্রহ্মা উত্তর করিলেন—

"অচিন্ত্যোপাধি বিনির্ম্মুক্তমনাদ্যন্তং শুদ্ধং শান্তং নির্গুণং
নিরবয়বং নিত্যানন্দং অখণ্ডৈকরসং অদ্বিতীয় চৈতন্যং ব্রহ্ম।"

—যিনি উপাধি রহিত, আদ্যন্ত রহিত, শুদ্ধ, কর্তৃত্বাদি অহঙ্কার শূন্য, শান্ত, রাগদ্বেষাদি রহিত, নির্গুণ, সত্ত্ব রজঃ ও তম গুণাতীত, শরীর-রহিত, সর্ব্বদা সুখ (আনন্দ) স্বরূপ, যাঁহার নিত্য-জ্ঞানাদির কখন খণ্ডন নাই এবং যাঁহার স্বরূপ আর দ্বিতীয় নাই—এই সকল বাক্য দ্বারা যে চৈতন্য অনুভূত হয়, তিনিই ব্রহ্ম।

ব্রহ্মের দুইটি লক্ষণ, একটি তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ, আর একটি তাঁহার তটস্থ-লক্ষণ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে এই দুইটি লক্ষণেরই নির্দ্দেশ আছে। উক্ত উপনিষদের ৩য়া বল্লী, ১ম অনুবাকে উক্ত হইয়াছে—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে॥
যেন জাতানি জীবন্তি॥
যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি॥
তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব॥
তদ্‌ব্রহ্মেতি॥"

—যাঁহা হইতে যাবতীয় প্রাণী উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহাতে তৎসমুদায় স্থিতি লাভ করে এবং প্রলয় সময়ে আবার সেই সমস্ত যাঁহাতে প্রবেশ লাভ করিয়া লয় পায়, তাঁহারই বিষয় জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারই বিষয় (শ্রবণাদি সাধন দ্বারা) জানিতে চেষ্টা কর, তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের এই যে সকল লক্ষণ কথিত হইল, এ সকলই তাঁহার তটস্থ-লক্ষণ। ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ সম্বন্ধে উক্ত উপনিষদের ২য়া বল্লী, ১ম অনুবাকে উক্ত হইয়াছে—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপমমৃতম্।
যদ্বিভাতি শান্তং শিবমদ্বৈতং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্॥"

—ব্রহ্ম সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ; ব্রহ্ম, অর্থাৎ যিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি আনন্দরূপে, অমৃতরূপে প্রকাশ পান—তিনি শান্তি-স্বরূপ, মঙ্গল-স্বরূপ, অদ্বিতীয়, শুদ্ধ এবং পাপ-স্পর্শ রহিত।

গীতায় ১৫শ অধ্যায়ে ১৫শ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিতেছেন—

"সর্ব্বস্যচাহং হৃদিসন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেববেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেবচাহম্॥"

—"প্রবেশিয়া সমুদায় প্রাণীর হৃদয়ে,
আছি আমি সকলের অন্তর্য্যামী হ'য়ে,
অতীতের স্মৃতি ভাবি—জ্ঞানের উদয়
আমা হ'তে হয়, পুনঃ আমা হ'তে লয়;
আমিই সকল বেদে জ্ঞাতব্য কেবল,
বেদ-বেত্তা, বেদ-কর্ত্তা আমিই সকল।"—সুধাকর গীতা।

এমন যে ব্রহ্ম, তাঁহার স্থিতি ও কার্য্য এবং তাঁহার তটস্থ ও স্বরূপ-লক্ষণ বিষয়ে সম্যক পরিচয় বা জ্ঞান লাভ করা কিন্তু অতীব দুরূহ ব্যাপার। ব্রহ্ম-জ্ঞান সম্বন্ধে শ্রীভগবান স্বয়ং বলিতেছেন—

"অহং বেত্তি, শুকো বেত্তি, ব্যাস বেত্তি ন বেত্তিবা,···
ভক্ত্যা ভাগবতং বেত্তি·······················ইত্যাদি।"

—কাজেই ব্রহ্ম-জ্ঞান জীবের একান্ত কাম্য-বস্তু হইলেও, ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিতে তাহার মন-প্রাণ যতই আকুল হউক না কেন, কিম্বা 'দুঃখ-ত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ' দর্শন-বিশেষের পরিচয় যতই

ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থ অত্যাবশ্যক বিবেচিত হউক না কেন, মানুষের উৎসাহ স্বতঃই কমিয়া আ'সে, ভরসা নির্ম্মূল হইয়া নিশ্চেষ্টতায় পরিণত হয়। আশার অত্যুজ্জ্বল আলোক কিন্তু সর্ব্বদাই বিদ্যমান রহিয়াছে; কবি গাহিয়াছেন—

"সিন্ধু শৈল গ্রহ জ্যোতি সাকার বা নিরাকারে
সমভাবে বিভু হেরে ভাবুক হৃদয়াগারে।
অজ্ঞানতা অভিমানে, বদ্ধ করে নামে স্থানে,
দ্বেষাদ্বেষ ভেদ-জ্ঞানে, তর্ক যুক্তি অহঙ্কারে॥
যথায় বিরাজে শান্তি, দ্বন্দ্ব আসি করে ভ্রান্তি,
সাধু হেরি প্রেমকান্তি ভাসে প্রেম পারাবারে।
মিলে যথা সাধু বর্গ, ধরায় তথায় স্বর্গ
(নিত্য) এ মিলনোৎসর্গ, দ্বেষদ্বন্দ্ব হরিবারে॥"

—সাধু ও সুধীর মিলন হইলে, দ্বেষ বা দ্বন্দ্ব, সাকার বা নিরাকার, তর্ক এবং অহঙ্কারের স্থান থাকে না; তাই সাহস সঞ্চয় করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে, ব্রহ্মের পরিচয় লাভ উদ্দেশ্যে, বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য কয়েকটি মাত্র বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব—সকলেরই সাহায্য প্রার্থনা করি।

উপনিষদ্ শান্তি পাঠ করিলেন—

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥"

—ঈশ, শান্তিপাঠ।

—ইহ-জগতের দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল বস্তুই পূর্ণব্রহ্ম দ্বারা পরিপূর্ণ বা ব্যাপ্ত। এই পূর্ণপ্রকৃতি ব্রহ্মের পূর্ণতা দ্বারা জগৎ প্রকাশিত হইলেও সেই

পরিপূর্ণ সত্বার পূর্ণতার কিছুমাত্রই হ্রাস হয় না—জগতে প্রতিনিয়ত শান্তি বিরাজ করুক।

ঈশোপনিষদই আবার নির্দ্দেশ দিলেন—

"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥"—ঈশ, ১ম সূত্র।

—ইহ-সংসারের সকল বস্তুই ব্রহ্ম দ্বারা পরিব্যাপ্ত। পার্থিব যাহা কিছু সমস্তই নশ্বর ও অকিঞ্চিৎকর; অতএব অপরের উপার্জ্জিত অর্থে লোভ না করিয়া, যাবতীয় মিথ্যা-বস্তু পরিত্যাগ করিয়া, আত্মস্থ হইয়া, তাঁহার (ব্রহ্মের) যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি কর।

কেনোপনিষদ্ প্রশ্ন তুলিলেন—

"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি॥"—কেন, ১।১ সূত্র।

—কাহার ইচ্ছায় আদিষ্ট বা প্রণোদিত হইয়া মন গতিশীল হইতেছে? শরীরাভ্যন্তরস্থ যে প্রাণ, সেই বা কাহার নিয়োগে নিজ কার্য্য সম্পাদন করিতেছে? লোক সকল কাহার ইচ্ছায় নিয়োজিত হইয়া বাক্য (শব্দ) উচ্চারণ করিতেছে এবং কোন সে দেবতা যিনি চক্ষু ও কর্ণকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন?

কেনোপনিষদই আবার প্রশ্নটির উত্তর দিলেন—

"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।

চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ,

প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥" —কেন, ১।২ সূত্র।

—যিনি কর্ণের কর্ণ, মনের মন, বাক্যের বাক্য, তিনিই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষুস্বরূপ—অর্থাৎ তিনিই, সেই ব্রহ্মই, উহাদের প্রবর্ত্তক। জ্ঞানিগণ এইরূপে জ্ঞান দ্বারা ইন্দ্রিয়ে আত্মভাব ত্যাগ করিয়া মৃত্যুর পর অমরত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

কাহাকে দর্শন করিলে নিত্য-শান্তি লাভ করা যায় ও নিত্য-সুখ ভোগ করিতে পারা যায়? কঠোপনিষদ্ তাহার নির্দ্দেশ দিলেন—

"একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা

একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।

তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-

স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥"

—কঠ, ২য়া বল্লী ১২শ সূত্র।

—যিনি এক এবং সর্ব্বনিয়ন্তা এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা হইয়াও স্বীয় অদ্বিতীয় রূপকে দেব-মানুষাদিভেদে বহুরূপ করিয়া থাকেন, যে ধীরব্যক্তি তাঁহাকে নিজ নিজ হৃদয়ে সাক্ষাৎ অনুভব করেন, দর্শন করেন, তাহারাই নিত্যকাল সুখভোগ করেন; অপরের দ্বারা—অবিবেকী (অজ্ঞানী) জীবদিগের দ্বারা, তাহা সম্ভবে না। নিত্য-শান্তি-ভোগ করেন তাঁহারা—

"নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-

মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।

তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-

স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥"

—কঠ, ২য়া বল্লী ১৩শ সূত্র।

—যিনি সকল নশ্বর পদার্থের মধ্যে নিত্য-পদার্থ, যিনি জীবসকলের চৈতন্ত সম্পাদক, যিনি এক হইয়াও সকলের কামনা পূর্ণ করেন, যে সকল ধীর ব্যক্তি সেই বুদ্ধিস্থ আত্মাকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন তাঁহারাই নিত্য-শান্তি লাভ করেন, অন্যে নহে।

ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় কেমন করিয়া তাহাও কঠোপনিষদ্ প্রকাশ করিলেন—

"ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চিদেনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো
য এনং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥"

—কঠ, ৩য়া বল্লী ৯ম সূত্র।

—পরমাত্মার প্রকৃতরূপ সাধারণভাবে দৃষ্ট হয় না, কারণ কেহই তাঁহাকে চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিতে পারে না। তিনি কেবলমাত্র হৃদ্‌গত সংশয়-রহি- বুদ্ধিদ্বারা মনের সাহায্যে সম্যক প্রকাশিত হন; অর্থাৎ, এই উক্ত উপায়েই আত্মাকে জানা যায়। যাঁহারা আত্মাকে ব্রহ্ম ভাবে অবগত হন, তাঁহারা অমরত্ব লাভ করেন—তাঁহারা মুক্ত হন। আবার—

"যস্যামতং তস্য মতং
মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং
বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥"

—কেন, ২।৩ সূত্র।

—যিনি বিবেচনা করেন 'আমি ব্রহ্মকে জানি না,' প্রকৃতপক্ষে তিনিই ব্রহ্মকে জানেন; আর যিনি মনে করেন 'আমি ব্রহ্মকে জানি,' বস্তুতঃ তিনিই ব্রহ্মের বিষয় কিছুই জানেন না। কেন না, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ব্রহ্মকে অজ্ঞেয় বলিয়াই জানেন, আর অজ্ঞ ব্যক্তিরাই তাঁহাকে জ্ঞেয় বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। সে আবার কেমন? বৃহদারণ্যক্ তাহার 'হদিস্' দিলেন, যথা—ভগবান বলিলেন,

"অহং চক্ষুরহং দৃষ্টিরহং রূপমহস্তথা।
দ্রষ্টা চাহং তথা জ্ঞানং জ্ঞাতাহং জ্ঞেয়মপ্যহম্॥"
—বৃহদারণ্যক, ৩য় সূত্র।

—আমিই চক্ষু, আমিই দৃষ্টি. আমিই রূপ, আমিই দ্রষ্টা; সেইরূপ আমিই জ্ঞান, আমিই জ্ঞাতা এবং আমিই জ্ঞেয়।

কেমন করিয়া ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়? কিরূপেই বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়? তাহার লক্ষণই বা কি? পঞ্চদশী গাহিলেন—

"যো ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবত্যেব ইতি শ্রুতিম্।
শ্রুত্বা তদেকচিত্তঃ সন্ ব্রহ্ম বেত্তি ন চেতরঃ॥"
—পঞ্চদশী, ৭।২৪ সূত্র।

—যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই স্বয়ং ব্রহ্ম-স্বরূপ হন। 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি' এবং 'শোভা তস্য মুখে য এবং বেদেতি'—ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে মানুষের মুখ এক প্রকার শোভায় উদ্ভাসিত হইতে দেখা যায়—ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির লক্ষণ। যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম-স্বরূপ হন, এই শ্রুতিবাক্য শ্রবণ করিয়া এবং একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্মকে জানিতে

ইচ্ছা কর ; অপর সকল বিষয় ইহার তুলনায় নিকৃষ্ট, তাহা জানিবার জন্য পরিশ্রম করা নিরর্থক।

মুণ্ডকোপনিষদ্ সন্ধান দিলেন—

"তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।"

—মুণ্ডক, ২।২।৭ সূত্র।

—যিনি আনন্দরূপে, অমৃতরূপে প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাইতেছেন, ধীর ব্যক্তিরা তাঁহাকে জ্ঞান দ্বারা দর্শন করেন।

এই জ্ঞান কিরূপে লাভ করিতে পারা যায়। জানিবার বিষয় ত অনেক, জ্ঞান অনন্ত—শাস্ত্রও অসংখ্য। উত্তর-গীতা পথনির্দ্দেশ দিলেন—

"অনন্তশাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহুবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্॥

—উত্তর গীতা, ৩।১ শ্লোক।

এই সার-পদার্থ কি ? শ্রেষ্ঠ-বিদ্যা কি ?

জ্ঞানের-প্রতীক দেবাদিদেব মহাদেব ব্যক্ত করিলেন—

"ব্রহ্মবিদ্যা সমাবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাসমা ক্রিয়া।
ব্রহ্মবিদ্যা সমং জ্ঞানং নাস্তি নাস্তি কদাচন॥"

—মুণ্ডমালাতন্ত্র, ১১শ পটল।

—ইহা নিশ্চয় করিয়া জানিও, যে ব্রহ্মবিদ্যার তুল্য বিদ্যা নাই, ব্রহ্মবিদ্যার তুল্য ক্রিয়া নাই এবং ব্রহ্মবিদ্যার তুল্য জ্ঞান নাই, নাই—নাই।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, বেদান্তদর্শন এই ব্রহ্মবিদ্যার অবতারণা করিয়া

বেদোক্ত জ্ঞানকাণ্ডের সমন্বয়-সাধনে এবং অবিরোধ-স্থাপনে ব্যাপৃত এবং ব্রহ্মই ইহার চরম ও পরম লক্ষ্য। বেদান্তদর্শনে সর্ব্বসমেত ৫৫৬টি সূত্র আছে ও ইহা চারি অধ্যায়ে বিভক্ত—এক একটি অধ্যায়ে আবার চারিটি করিয়া পাদ আছে, যথা—
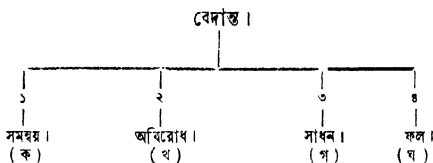
(ক) স্পষ্ট, অস্পষ্ট ও সন্দিগ্ধ শ্রুতিবাক্য সমূহের ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে—ইহাই প্রথম অধ্যায়।

(খ) অন্যান্য দার্শনিক মত খণ্ডন করিয়া যুক্তি ও শাস্ত্রের সহিত বেদান্ত-মতের অবিরোধ স্থাপিত হইয়াছে—ইহাই দ্বিতীয় অধ্যায়।

(গ) সগুণ-জীব ও নির্গুণ-ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া মুক্তির বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ-সাধন উপদিষ্ট হইয়াছে—ইহাই তৃতীয় অধ্যায়।

(ঘ) জীবন্মুক্তি, জীবের উৎক্রান্তি (progressive stage) এবং সগুণ ও নির্গুণ-উপাসনার ফলের তারতম্যের বিষয় বিবেচিত হইয়াছে—ইহাই চতুর্থ অধ্যায়।

বেদান্তদর্শনের বহুবিধ ভাষ্য আছে। শ্রীমদ্‌ভাগবত মহাপুরাণ এই বেদান্তদর্শনেরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাষ্য, এই ভাষ্য-গ্রন্থ মহর্ষি বেদব্যাসের সাধন-লব্ধ বস্তু। কথিত আছে, দেবর্ষি নারদের উপদেশানুসারে বেদব্যাস সমাধিযোগে এই ভাষ্য প্রাপ্ত হন ও নিজে শান্তি পাইয়া

সর্ব্বসাধারণের বিদিতার্থ জগতে ইহা প্রচার করিয়া সংতৃপ্ত হৃদয় হন। কালে অনেকানেক মনীষা-সম্পন্ন মহাপুরুষ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের অনুরোধে বেদান্ত-সূত্রের অনেকগুলি বিভিন্ন প্রকার ভাষ্য প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের "শারীরক-ভাষ্য", রামানুজাচার্য্যের "শ্রীভাষ্য," মধ্বাচার্য্যের "পূর্ণ-প্রজ্ঞ-ভাষ্য" এবং বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত "শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যই" যথাক্রমে অদ্বৈত-বাদী, বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদী, দ্বৈতবাদী এবং গৌড়িয় সম্প্রদায়-ভুক্ত বৈষ্ণবদিগের নিকট বিশেষভাবে আদরণীয়। এই চারিখানি প্রধানতম ভাষ্য-গ্রন্থ ব্যতিরেকে আনন্দগিরি বিরচিত "শারীরক ভাষ্যের টীকা", "ভামতী" নাম্নী বাচষ্পতি মিশ্র কৃত শঙ্কর-ভাষ্যের টীকা, "শ্রুতি-প্রকাশিকা" নামে সুদর্শনের শ্রীভাষ্যের টীকা, বিজ্ঞানভিক্ষু প্রণীত "বেদান্ত-ভাষ্য" প্রভৃতি গ্রন্থ-সমূহ বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। ভাস্কর, যাদবমিশ্র, নিম্বার্ক, বল্লভ ও শ্রীকণ্ঠ, ইহাঁরাও বেদান্তদর্শনের ভাষ্যকার।

বেদান্তদর্শনের আরও কতকগুলি ভাষ্য প্রচলিত আছে, যথা—নীলকণ্ঠ কৃত "শৈবভাষ্য," "বেদান্ত-পারিজাত" নামে সৌরভাষ্য এবং বিশিষ্টাদ্বৈত মতাবলম্বী যমুনাচার্য্যের "সিদ্ধিত্রয়" নামক অপূর্ব্ব ভাষ্য। যদিও রামানুজাচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক বলিয়া বিখ্যাত এবং তাঁহার "বেদান্ত-সংগ্রহ," "বেদান্ত-দীপ," "বেদান্ত-সার," "গদ্যত্রয়" এবং তাঁহার নামে প্রচলিত "বেদান্ত-তত্ত্ব-সার" প্রভৃতি গ্রন্থের বেদান্ত-ভাষ্য হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু তাঁহার বহুকাল পূর্ব্বেই বোধায়ন, টঙ্কর, দ্রাবিড়, গুহদেব, ভারুচি, কপর্দ্দী প্রভৃতি অনেক সুপণ্ডিত ভাষ্যকার উক্ত মত স্থাপন করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শঙ্কর প্রবর্ত্তিত অদ্বৈত মতাবলম্বী অনেক ভাষ্য-গ্রন্থেরও বিশেষ প্রসিদ্ধি পরিলক্ষিত হয়, যথা—"টীকান্বিত," "সূত্রার্থ-সংক্ষেপ," "পঞ্চদশী,"

"অদ্বৈত-ব্রহ্ম-সিদ্ধি," "চিৎসুখী," "তত্ত্ব-প্রদীপিকা," "পঞ্চপাদিকা," "খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য," "বেদান্ত-পরিভাষা," "বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী," "বেদান্ত-সার" প্রভৃতি।

বেদান্ত বলিতেছেন, জগতের আদিকারণ ব্রহ্ম ; ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি এবং প্রকৃতি হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই গুণত্রয়ের উদ্ভব হয়। পরে প্রকৃতি এই গুণত্রয়কে আশ্রয় করিয়া মায়া ও অবিদ্যারূপে দ্বিধা বিভক্ত হন ; মায়াশ্রিত চৈতন্য—ঈশ্বর, ও অবিদ্যাশ্রিত চৈতন্য—জীব। জীব অবিদ্যার বশীভূত এবং এই অবিদ্যাকে অতিক্রম করিতে পারিলেই জীব মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই এই অবিদ্যা বা অজ্ঞানকে জীব অতিক্রম করিতে পারে, জীব আত্ম-পরিচয় লাভ করে এবং এই জগৎ যে মিথ্যা—একমাত্র ব্রহ্মই যে সত্য, তাহা বুঝিতে পারে।

"বেদান্তদর্শনকার বলিতেছেন, আমরা অজ্ঞানতা বশতঃ আত্মাকে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্মের বিক্ষেপ করিয়া থাকি। অবিদ্যার দুই শক্তি, আবরণ ও বিক্ষেপ। অনেক সময়ে রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়া থাকে, রজ্জুর অজ্ঞান ভ্রমের কারণ। রজ্জুর অজ্ঞান, স্বীয় আবরণ শক্তি দ্বারা রজ্জুর স্বরূপ ঢাকিয়া ফেলে ; পরে উহার বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা উহাতে সর্প উদ্ভাবিত করে। আমরা দেখি, মেঘে সূর্য্য আবৃত করে ; কিন্তু এত বড় গ্রহকে সীমাবদ্ধ মেঘে আবৃত করিতে পারে না, মেঘ দ্রষ্টার দৃষ্টি পথ আবৃত করে মাত্র। সেইরূপ, সসীম অজ্ঞান অসীম আত্মাকে আবৃত করিতে পারে না, দ্রষ্টার বা বোদ্ধার বুদ্ধি আবৃত করে মাত্র। আত্মার স্বরূপ আবৃত হইলে প্রকৃত আত্মবোধ হইতে পারে না। এ জন্যই দ্রষ্টা অনাত্মাকে আত্মা ও অনাত্মার ধর্ম্মকে আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। এইরূপ বোধের নাম অধ্যাস। আমি স্থূল, আমি কৃশ ইত্যাদি

বলিবার সময় আমি স্বীয় আত্মাতে দেহ-ধর্ম্মের অধ্যাস সম্পন্ন করি—স্থূলত্বাদি দেহ-ধর্ম্ম আমি আত্মাতে অধ্যস্ত করিতেছি। আত্মার মঙ্গল বা অমঙ্গল কেহই বিধান করিতে পারে না, যে হেতু যিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞ তাঁহার রাগ দ্বেষ হওয়া অসম্ভব। অধ্যাস বশতঃ দেহাদির ইষ্ট বা অনিষ্ট আত্মার ইষ্টানিষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কর্ম্ম-ফল-ভোগ সুখ-দুঃখের উপলব্ধি মাত্র। শরীর ভিন্ন সুখ-দুঃখের উপলব্ধি হয় না। কর্ম্মফল-ভোগের জন্য জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। মোহান্ধ মানব ভোগের জন্য কর্ম্ম করে ও কর্ম্ম করিবার জন্য ভোগ করে।"[১] বস্তুতঃ, অজ্ঞানের বশীভূত হইয়াই জীব এই জগৎকে সত্য জ্ঞান করে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা এই ভ্রম নিরাকৃত হইলে ব্রহ্মানন্দের উদয় হয় এবং জীব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে।

অপরাপর দর্শনের ন্যায় বেদান্তদর্শনেরও উদ্দেশ্য জীবের দুঃখ দূর করা; সংসার দুঃখময়, এই অবস্থা হইতে একান্ত ভাবে মুক্তি লাভ করা জীবের পরম কাম্য-বস্তু, আর তাহার একমাত্র উপায় "ব্রহ্মজ্ঞান"—ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা। মহর্ষি জৈমিনি শ্রুতি হইতে কর্ম্ম-তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া যেমন পূর্ব্বমীমাংসা রচনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ ব্যাসদেব শ্রুতি হইতে অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মহর্ষি বেদব্যাসের মতে—

"একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

—এক মাত্র ব্রহ্মই আছেন, তদতিরিক্ত আর কিছুই নাই। সাংখ্যকার মহামুনি কপিলদেব পুরুষ ও প্রকৃতিরূপ দুইটি তত্ত্ব দেখিয়াছেন; পতঞ্জলি, গোতম ও কণাদ সকল মহর্ষিই দ্বৈতবাদী; জৈমিনি মুনিও

১। মঃ মঃ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার—"শ্রীগোপাল বসু মল্লিক ফেলোশিপ" বক্তৃতা।

দ্বৈতবাদী, কারণ, তিনি কার্য্য ও কারণ দুইই স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু বেদান্ত বলেন দুই নাই, ভেদ নাই, সকলই ব্রহ্ম—

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"

বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে প্রধানতঃ দুইটি ভাষ্য বা মত বিশেষ-ভাবে প্রসিদ্ধ। একটি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের মত, অপরটি যতিরাজ রামানুজ স্বামীর মত। একটি "বিশুদ্ধাদ্বৈত বা অদ্বৈতবাদ", অন্যটি "বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।" উভয় মত একই বেদান্ত-সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও উভয়ের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে প্রচুর প্রভেদ দৃষ্ট হয়—যিনি যেমন দর্শন করিয়াছেন; উভয়েই কিন্তু প্রমাণ প্রয়োগে শ্রুতিকেই আশ্রয় করিয়াছেন। উক্ত দুইটি মত-বাদের পরিচয় ব্যতিরেকে দ্বৈতবাদী শ্রীমৎ মধ্বাচার্য্য প্রবর্ত্তিত "পূর্ণ প্রজ্ঞদর্শন" নামে সুপরিচিত তৃতীয় মত ও শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত "শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য", এই চতুর্থ মতবাদ, অতীব-সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়া বেদান্ত-ভাষ্যের বক্ষ্যমান সার-সঙ্কলন, সর্ব্বদা স্বীয় অক্ষমতা স্মরণ রাখিয়া কয়েকটি পরবর্ত্তী নিবন্ধে বিবৃত হইল।

"ওঁ তৎসৎ ওঁ।"

শঙ্করদর্শন

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য—বেদান্তের বিশুদ্ধাদ্বৈত বা অদ্বৈত মতের প্রবর্ত্তক। শঙ্কর বলেন—

"জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ।"

—জীবই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই সমস্ত। ব্রহ্মই সত্য—শ্রুতি প্রতিপাদ্য, আর জগৎ-প্রপঞ্চ কিছুই সত্য নহে—সমস্তই মিথ্যা ও অবিদ্যায় আবৃত। ব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞান জন্মিলেই জীবের মুক্তিলাভ হয়।

ব্রহ্মের কোনই গুণ বা বিশেষণ নাই, তিনি নির্গুণ। নির্গুণের শঙ্কর এই অর্থ করেন, যে—"নির্ নাস্তি গুণো যস্য, তৎ নির্গুণং"। শ্রুতিতে উক্ত নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, নিরাকার, নিস্ক্রিয় প্রভৃতি বাক্য সমূহই ব্রহ্মের যথার্থ-তত্ত্ব, পারমার্থিক-তত্ত্ব; আর ব্রহ্ম সগুণ, তিনি সৃষ্টি স্থিতি ও লয় কর্ত্তা প্রভৃতি উক্তি সমূহ যথার্থ নয়. এগুলি ব্যবহারিকভাবে প্রযুক্ত। শ্রুতির ব্যবহারিক অংশ সগুণ-বিদ্যা এবং উহার পারমার্থিক অংশ নির্গুণ-বিদ্যা।

শঙ্কর বলেন, জ্ঞান অর্থে বিশেষ-জ্ঞানই বুঝায়, ব্যবহারিক জ্ঞান বুঝায় না; অজ্ঞানীর পক্ষে সগুণ-বিদ্যা, অজ্ঞানীর জ্ঞানোদয় হইলেই সে নির্গুণ বিদ্যার অধিকারী হয়। ব্রহ্ম 'অবাঙ্ মনসো গোচরম্'—বাক্য বা মন দ্বারা তাঁহার উপলব্ধি করা যায় না; 'নেতি নেতি' বলিয়া ব্রহ্মকে সকল বিশেষণের অবর্ণনীয় বলা হইয়াছে—তিনি ব্যবহারিক-

জ্ঞান-গম্য নহেন। কাজেই প্রকৃত জ্ঞানোদয়ে জীব যখন বাহ্য এবং অন্তর্জগতের জ্ঞান শূন্য হইবে, তখনই তাহার ব্রহ্মের অপরোক্ষানুভূতি হইবে—ব্রহ্ম কিন্তু সর্ব্বদাই স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন।

তবে এক কথা, সগুণ-বিদ্যা সম্পূর্ণ ভাবে নিষ্প্রয়োজন নহে, সগুণ বিদ্যা আশ্রয় করিয়াই সাধকের চিত্ত-শুদ্ধি হয়, তিনি জ্ঞানমার্গে আরোহণ করেন। শঙ্করের মতে বেদবেদান্তাদি অধ্যয়ন পূর্ব্বক শমদমাদি গুণ-সম্পন্ন হইলেই ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ হয়, আর এই জ্ঞান-লাভের উপায় সাধন-চতুষ্টয়। চতুর্ব্বিধ সাধনা, যথা—

১ম—নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক,

২য়—ইহামুত্র (ইহলোক ও পরলোকের) ফল ভোগে বিরাগ,

৩য়—শমদমাদি ষট্-সম্পত্তি,

৪র্থ—মুমুক্ষুত্ব (মোক্ষের ইচ্ছা),

—সাধন-লব্ধ এই জ্ঞান ব্যতীত মুক্তির উপায় নাই, কারণ ব্রহ্ম মন ও বুদ্ধির অতীত—"বিজ্ঞাতং অবিজানতাম্" এবং "অবিজ্ঞাতং বিজানতাম্।"

শঙ্করের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে মতবাদ আরও একটু বিশদভাবে বর্ণিত হইতেছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, শঙ্কর বলেন ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা—জগৎ-প্রপঞ্চ কিছুই সত্য নহে, সমস্তই মিথ্যা ও অবিদ্যায় আবৃত। তিনি আরও বলিয়াছেন—

"জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ।"

—জীবই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই সমস্ত। শ্রুতিতে ব্রহ্মের দুইটি লক্ষণের উল্লেখ আছে ইহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—একটি তাঁহার তটস্থ-লক্ষণ, আর একটি তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ।

"জন্মাদ্যস্য যতঃ।"

।—বেদান্ত, ১ম পাদ [illegible]সূত্র।

—ব্রহ্মের উক্ত তটস্থ-লক্ষণেরই পরিচয় দিয়াছেন; অর্থাৎ, বেদান্ত বলিতেছেন, এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় এই তিন কার্য্য যাঁহা হইতে সংসাধিত হইতেছে তিনিই ব্রহ্ম; এই বেদান্ত-সূত্র, শ্রুতিতে উক্ত—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ॥
যেন জাতানি জীবন্তি ॥
যৎ প্রযান্ত্যভিসংবিশন্তি ॥
তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব ॥
তদ্‌ব্রহ্ম ॥"

—তৈত্তিরীয়, ৩।১।২ সূত্র।

—অর্থাৎ, যাহা হইতে ইহ-জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া যাঁহাতে তৎসমুদায়-স্থিতি লাভ করে ও যাঁহাতে আবার সমস্তই লয় পায়, তাঁহারই বিষয় জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম—এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি। আবার বেদান্ত ১ম পাদে,

"শ্রুতত্বাচ্চ।"

এই ১২শ সূত্রের উল্লেখ করিয়া শ্রুতিতে ব্যক্ত ব্রহ্মের নির্গুণ বা স্বরূপ-লক্ষণেরই নির্দ্দেশ দিয়াছেন; তাহাই 'একমেবাদ্বিতীয়ং', 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—অর্থাৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুই নাই, সমস্তই ব্রহ্ম। সে কেমন? না, 'একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ…' ইত্যাদি—বা "যজুঃ ব্রহ্ম।"

—ব্রহ্মের কোন রূপ-ভেদ নাই, তিনি এক অনির্ব্বচনীয় দিব্য-পদার্থ, বিবিধ অদ্ভুত লীলার আধার, সর্ব্বজীবের অন্তর্হৃদয়ে—কাষ্ঠে অগ্নির ন্যায়—গূঢ়ভাবে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। ব্রহ্মের এই যে লক্ষণের ভেদ রহিয়াছে, ইহাই ব্যবহারিক ও পারমার্থিক ভেদ। যতদিন আমাদের অজ্ঞানতা থাকিবে ততদিন জগৎ থাকিবে; অজ্ঞানের নাশ হইলেই জগতের সত্বাও আর থাকিবে না। বস্তুতঃ, অজ্ঞান বা অবিদ্যাই জগতের কারণ। প্রকৃত জ্ঞানোদয় হইলে অজ্ঞান বা অবিদ্যার নাশ হয়, আত্মজ্ঞান আসে, আত্মজ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী। অবিদ্যা তাহার আবরণ ও বিক্ষেপ এই দুই শক্তির দ্বারা প্রথমে ব্রহ্মকে বা আত্মাকে আবরণ করে ও তাঁহাতেই জগৎ-প্রপঞ্চ বোধ করায়। আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে এ সমস্ত কিছুই থাকে না। অনাত্মাকে আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মতে জগৎ জ্ঞান, সত্যকে মিথ্যাজ্ঞান ইহার নাম অধ্যাস। জগতের সমস্তই সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ, ব্রাহ্মণত্ব-শূদ্রত্ব, সকলই অধ্যাসমূলক; আত্মজ্ঞান লাভ করিলে অধ্যাস সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়।

শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ—এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে আত্মা বা ব্রহ্ম যখন সত্যস্বরূপ, তাহাকে অবিদ্যা বা অজ্ঞান বা মায়া কেমন করিয়াই বা আবরণ করে—সত্যতে মিথ্যার বা আলোকেতে অন্ধকারের ব্যাপ্তি কিরূপে সম্ভব হয়; ইহার উত্তরে শঙ্করাচার্য্য পেচকের উদাহরণ দিয়াছেন। দিবালোক সূর্য্যের কিরণে উদ্ভাসিত, আলোকের কিছুই অভাব তখন থাকে না, কিন্তু পেচক তখন কিছুমাত্র দেখিতে পায় না। এখানে আলোকেতেও যেমন অন্ধকারের কার্য্য করে সেইরূপ জ্ঞানময় আত্মাতেও অজ্ঞান বা অবিদ্যার কার্য্য হয়। আরও একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে, যখন অজ্ঞান বা অবিদ্যাই যাবতীয় অধ্যাসের মূল তখন আত্মা বা ব্রহ্ম কেনই

বা তাহাকে আশ্রয় করে ? ইহার উত্তরে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, অনেক সময়ে আমরা জানিয়া শুনিয়া যেমন নিজ নিজ অনিষ্টকর কার্য্য আচরণ করি বা তাহাতে আসক্ত হই, সেইরূপ আত্মা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইয়াই—অধ্যাস প্রভৃত সকল তত্ত্ব অবগত হইয়াই, অবিদ্যাকে আশ্রয় করে। তবে অজ্ঞান বা অবিদ্যা সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিতে, তাহা কি, কেন আসিল, কেমন করিয়া সম্ভব হইল, এ সকল বিষয়ে বিচার বা বিতর্ক পণ্ডশ্রম মাত্র, ইহাকে কেমন করিয়া নাশ করিতে পারা যায় সে বিষয়ে সচেষ্ট হওয়াই যুক্তিযুক্ত। স্বয়ং আত্মাই যখন অজ্ঞান বা অবিদ্যার অধীন তখন উভয়ে যে পরস্পর-বিরোধী নহে তাহা স্বপ্রমাণ—তত্ত্বজ্ঞান হইলে তবেই এই অজ্ঞান বা অবিদ্যার বিনাশ হয়, কাজেই একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই অজ্ঞান বা অবিদ্যার বিরোধী। জীবের অজ্ঞান অবস্থাতেই অবিদ্যা বা মায়ার উদ্ভব হয়, কিন্তু যেখানে জ্ঞান প্রবেশ লাভ করিয়াছে, সেখানে অবিদ্যা মায়া স্থান পায় না ; কাজেই তত্ত্বদৃষ্টিতে মায়ার বা অবিদ্যার অস্তিত্ব না মাত্র ব্যবহারিক-দৃষ্টিতে অবিদ্যা বা মায়ার সৎ ও অসৎ রূপ, কিন্তু পরমার্থ-দৃষ্টিতে অবিদ্যা বা মায়া মিথ্যা। মিথ্যা জগৎ-প্রপঞ্চকে সত্য বলিয়া যে বোধ, ইহাই বন্ধন এবং যে মুহূর্ত্তে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, তখনই সকল বন্ধন তিরোহিত হয়—অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে জগৎ-প্রপঞ্চেরও নিবৃত্তি হইয়া যায় ও জীবের মোক্ষলাভ হয়।

"একং সৎ, বিপ্রা বহুধা বদন্তি।"

রামানুজদর্শন

বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতমত যতিরাজ রামানুজ স্বামী স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম জগৎ-বিশিষ্ট এবং স্বগুণ-ব্রহ্মই সত্য। তিনি বলেন, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারই মুক্তি। ব্রহ্ম বিশেষণ-যুক্ত, বিশেষণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নয়। নির্গুণ বা নির্ব্বিশেষ প্রভৃতি ব্রহ্মে যে সকল তত্ত্ব আরোপ করা হয়, তাহার যথার্থ অর্থের এবং তাৎপর্য্যের মধ্যে কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে। ব্রহ্ম নির্গুণ বা নির্ব্বিশেষ বলিতে ব্রহ্মের গুণ নাই বা তাঁহার কোন বিশেষণ নাই, ইহা বুঝায় না; নির্গুণ বা নির্ব্বিশেষ উক্তিগুলিতে, ব্রহ্ম গুণাতীত, তিনি নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ 'নির্গতো বিশেষঃ যস্মাৎ তৎ ইতি নির্ব্বিশেষং'—ইহাই বুঝায়; উক্তরূপ তাৎপর্য্যও ব্যাকরণ বা শ্রুতি-বিরুদ্ধও নহে।

রামানুজ স্বামী বলেন, পদার্থ তিন প্রকার যথা, ১ম—চিৎ, ২য়—অচিৎ ও ৩য়—ঈশ্বর। চিৎ জীববাচ্য—জীব ভোক্তা, অপরিচ্ছিন্ন, নির্ম্মল-জ্ঞানস্বরূপ, নিত্য এবং অনাদি কর্ম্মরূপ অবিদ্যা দ্বারা বেষ্টিত; জীব সূক্ষ্ম, ভগবত আরাধনা এবং তৎ-পদপ্রাপ্তিই তাহার লক্ষ্য। অচেতন-স্বরূপ জড়াত্মক, ভোগ্য-জগৎ অচিৎ পদবাচ্য। ঈশ্বরই সকলের নিয়ামক (পরিচালক) এবং তিনি হরি (হৃ+ইক্) পদবাচ্য। তিনিই জগতের কর্ত্তা, তিনিই অন্তর্য্যামী এবং তিনি অপরিচ্ছিন্ন (অসীম), জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি যুক্ত। পদার্থের দ্বিবিধ-রূপ, চিৎ ও অচিৎ, সমুদায়ই তাঁহার শরীর স্বরূপ। পুরুষোত্তম বা বাসুদেব বা ভগবান

এগুলি তাঁহারই সংজ্ঞা। ঈশ্বর পরম করুণাময়; তিনি ভক্তবৎ... ও ভক্তকে অভীষ্ট-ফল প্রদান করেন এবং লীলা বশতঃ মূর্তি... তিনি পরিগ্রহ করেন। স্বাধ্যায়াদি (বেদাধ্যয়ন-আদি) উপা... দ্বারা বিজ্ঞান লাভ হইলে, ভগবান স্বীয় ভক্তগণকে নিত্য-পদ প্রদান করেন। জীব নিত্য-পদ প্রাপ্ত হইলে ঈশ্বরের স্বরূপ অবগত হইতে পারে ও তাহার পুনর্জ্জন্ম নিবারিত হয়। চিৎ ও অচিৎ উভয় পদার্থের সহিত ঈশ্বরের ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ এই তিন প্রকার সম্বন্ধই বিদ্যমান। বস্তুতঃ, জীব যখন সাধনা-দ্বারা অনন্ত-ভক্তি লাভ করে, তখনই তাহার মুক্তিলাভের পথ উন্মুক্ত হয়, আর ঐ পরাভক্তিই তাহাকে মুক্তি দান করে। মুক্তি বলিতে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারই বুঝায়।

রামানুজ স্বামী প্রবর্ত্তিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধাদ্বৈত বা অদ্বৈতবাদ এই উভয়বিধ মতের মধ্যে ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ এই দুই ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ব্রহ্ম নির্গুণ, শঙ্করাচার্য্য বলেন, নির্গুণ—অর্থাৎ, "নির্ নাস্তি গুণং যস্য, তৎ নির্গুণং," কিন্তু রামানুজ স্বামী নির্গুণের অর্থ করিয়াছেন গুণাতীত। ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, শঙ্করাচার্য্য ইহার অর্থ করিয়াছেন—ব্রহ্মের কোন বিশেষণ নাই; কিন্তু রামানুজ স্বামী বলেন, নির্ব্বিশেষ অর্থে "নির্গতো বিশেষঃ যস্মাৎ, তৎ ইতি নির্ব্বিশেষ।" শঙ্করাচার্য্য উক্ত উভয়-বিধ ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করেন, যে প্রথম অর্থ-ই (তাঁহার ভাষ্যানুমোদিত অর্থ-ই) যথার্থ-অর্থ এবং দ্বিতীয় অর্থ ব্যবহারিক ভাবে প্রযুক্ত। রামানুজ স্বামী কিন্তু বলেন—

১ম—ব্রহ্ম বিশেষণ-যুক্ত, বিশেষণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। গুণ ও গুণীর নিত্য-অভেদ সদাই বর্ত্তমান। ভোগ্য, ভোক্তা ও পরিচালক রূপে ব্রহ্মই বিদ্যমান রহিয়াছেন। ভোগ্যবস্তু জড় বা অচিৎ এবং চৈতন্যই

ভোক্তা বা পরিচালক (নিয়ামক)। জড়ের পৃথক সত্বা নাই, জড়ত্ব ব্রহ্মের একটি বিশেষণ—ব্রহ্ম জগৎ-বিশিষ্ট ; স্বগুণ ব্রহ্মই সত্য।

২য়—ব্রহ্মের বিশেষণ নিত্য। ইহার প্রকাশ দ্বিবিধ—স্থূল ও সূক্ষ্ম ; জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি হয় তখনই যখন বিশেষণের স্থূল প্রকাশ হয়, আবার স্থূল-ভাব পরিত্যাগ করিয়া বিশেষণ যখন সূক্ষ্ম সত্বারূপে অবস্থান করে তখনই জগতের লয় সংসাধিত হয়। উক্ত উভয়বিধ ব্রহ্ম-বিশেষণের অবস্থান অনেকটা কূর্ম্মের স্বেচ্ছাধীন অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি প্রকাশিত করার মত। বিশেষণই ক্রিয়ার উৎপত্তি করে, ক্রিয়ার স্থিতি ও পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয় বিশেষণের দ্বারা এবং বিশেষণই আবার ক্রিয়াকে কারণে লয় করে। বিশেষণকে এই হেতু নিত্য বলা হইয়াছে।

৩য়—ব্রহ্মের বিশেষণে ব্রহ্ম দূষিত হন না। বিশেষণের অবস্থাভেদে ব্রহ্মের ভেদ হয় না, তাঁহার স্বরূপ ঠিক এক ভাবেই থাকে—অনন্ত শক্তির আধার যিনি, তাঁহার শক্তির আবার ক্ষয়ই বা কি, অভাবই বা কি—পার্থক্যই বা কি ?

৪র্থ—ব্রহ্মের বিশেষণ যদি স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে জগৎ মিথ্যা হইয়া যায়—বেদ মিথ্যা হইয়া যায়, ধর্ম্ম কর্ম্ম সবই মিথ্যা হইয়া যায়—মতামত সবই ভাসিয়া যায়, অর্থাৎ এ সকল কিছুই যেন নাই এইরূপ বোধ হয়। সকলই যদি মিথ্যা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তখন ভাল মন্দ সবই মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায় ; জ্ঞানী ও পাষণ্ড এ-দুয়ের মধ্যে ভেদ কিছুই থাকে না, কারণ উভয়ই ত মিথ্যা—এইরূপে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

৫ম—ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারই মুক্তি, ইহাই শাস্ত্রবাক্য। কিন্তু ব্রহ্মের যদি কোন বিশেষণই না রহিল, তবে কাহারও সহিত দেখাশুনা, কিসেরই বা মুক্তি? সকলিই ত নিরর্থক বাক্য মাত্র হইয়া যায়।

৬ষ্ঠ—ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ হইলে তাঁহাতে কোন প্রকার প্রমাণেরই আরোপ করা চলে না; কাজে-কাজেই ব্রহ্মের ব্রহ্মতত্ত্ব থাকা না থাকা দুইই ত সমান হইয়া দাঁড়ায়!

রামানুজ স্বামী তাই বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ প্রবর্ত্তন করিয়া প্রচার করিলেন—একমাত্র ভক্তিই জীবের মুক্তির হেতু। ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ যোগ, জীব সাধনার দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হয় ও মুক্তির অধিকারী হইতে পারে—'ভক্তেরই ভগবান'। ভক্ত কে? তাহার লক্ষণই বা কি? গীতায় শ্রীভগবান বলিতেছেন—

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখ সুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ।
মর্য্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যোমদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥"

—গীতা, ১২শ অঃ ১৩-১৪ শ্লোক।

"যাঁহার জীবের প্রতি দ্বেষ নাই মনে,
সতত মিত্রতা যাঁর সকলের সনে,
করুণা সকল জীবে নাহি অহঙ্কার,
মায়া-ঘোরে যে না করে 'আমার আমার',
সুখে দুঃখে সমজ্ঞান, সংযত স্বভাব,
স্থির-লক্ষ্য ক্ষমাশীল, সদা তুষ্ট ভাব,

আমাতেই মন বুদ্ধি দিয়েছেন যিনি,
নিঃসংশয় (ধনঞ্জয়) মম ভক্ত তিনি।"

—সুধাকর গীতা।

এই সকল লক্ষণাক্রান্ত যিনি, তিনিই ভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তি, তিনিই ভক্ত—শ্রীভগবান বলিলেন, তিনিই আমার প্রিয়। বেদান্তদর্শনে ভক্তিবাদের এই যে অপূর্ব্ব সমাবেশ, জ্ঞান ও ভক্তির এই যে মাধুর্য্যময়ী সমন্বয় ইহাই রামানুজ স্বামীর অভাবনীয় পরিকল্পনা, ইহাই তাঁহার প্রবর্ত্তিত বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ।

"শ্রুতির কুব্যাখ্যা মেঘে আচ্ছাদিত ছিল।
রামানুজ স্বামী বাতে মেঘ উড়াইল॥
তবে শুদ্ধাভক্তি-রবি উদয় করিয়া।
জগতের অন্ধকার দিলা খেদাড়িয়া॥"

—শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ, ১০ম মালা।

—এবং ভারতের প্রাচীনতম যুগে ঋষিকুলতিলক শ্বেতাশ্বতর তপঃপ্রভাবে ও দেবপ্রসাদে পরম পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া আত্মবুদ্ধি প্রকাশক বেদান্তশাস্ত্রোক্ত এই পরম-গুহ্য-জ্ঞান ভক্ত-মহাত্মাদিগের জন্য তাঁহার রচিত উপনিষদে প্রকাশ করিয়া সেই ভক্তবৎসল পরব্রহ্মের রাতুল চরণ আশ্রয় করিলেন, যিনি—

"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্॥" [১]

১। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬ষ্ঠ অধ্যায় ১৯শ সূত্র।

পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন

বেদান্তের দ্বৈতবাদ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন শ্রীমৎ মধ্বাচার্য্য। মধ্বাচার্য্যের অপর নাম "পূর্ণপ্রজ্ঞ" এবং এই জন্য তাঁহার প্রবর্ত্তিত বেদান্ত-ব্যাখ্যা "পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন" নামে খ্যাত। মধ্বাচার্য্য পরম বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহার প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায় 'ব্রহ্ম-সম্প্রদায়' বা 'চতুর্ম্মুখ-সম্প্রদায়' নামে অভিহিত।

মধ্বাচার্য্য বলেন জীব ও ঈশ্বরে ভেদ বর্ত্তমান; জীব সেবক, ঈশ্বর সেব্য। ঈশ্বরই পরমাত্মা, তিনিই সকলের নিয়ামক। চিৎ, অচিৎ—সকল বস্তুই তাঁহার শরীর স্বরূপ। প্রতিমাদি পূজা করিয়া চিত্ত-শুদ্ধি হইলে এবং ভগবদ্ভক্তির উন্মেষ হইলে পর রামাদি অবতার রূপ ঈশ্বরের বিভবের উপাসনা করিতে হয়। এইরূপে উত্তরোত্তর ঈশ্বরের অন্তর্যামী, ব্যূহ ও পর এই ত্রিমূর্ত্তির উপাসনা করিতে করিতে মোক্ষ লাভ হয়। ঈশ্বর প্রসাদ ব্যতীত কিন্তু মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটেনা, আবার জ্ঞান ব্যতীত ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করা যায় না।

পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শনের সহিত রামানুজ স্বামী প্রবর্ত্তিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অনেকাংশে ঐক্য আছে। পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনও বলেন বেদ অপৌরুষেয় ও নিত্য। পূর্ণপ্রজ্ঞ মতে প্রমাণ তিনটি, যথা—

১। প্রত্যক্ষ i. e., perception.

২। অনুমান i. e., inference.

৩। আগম i. e., The Vedas.

পূর্ণপ্রজ্ঞ বলেন, তিন পদ্ধতিতে ঈশ্বরের সেবা করা যায়। পদ্ধতিগুলি এইরূপ, যথা—অঙ্কন, নামকরণ ও ভজন।

প্রধানতঃ, পূর্ণপ্রজ্ঞ মত অর্থ-পঞ্চকের উপর প্রতিষ্ঠিত, যথা—

১ম—জীব,

২য়—ঈশ্বর,

৩য়—উপায়, অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রাপ্তির উপায়,

৪র্থ—পুরুষার্থ বা ফল,

৫ম—বিরোধী বা ঈশ্বর লাভের প্রতিবন্ধক।

উক্ত অর্থ-পঞ্চকের প্রত্যেকটির পাঁচটি করিয়া স্বরূপ, এই স্বরূপ-উপলব্ধিই প্রকৃত পুরুষার্থ—মোক্ষের উপায়।

প্রতি অর্থ-পঞ্চকের স্বরূপগুলির পঞ্চবিধ ক্রমবিভাগ, যথা—
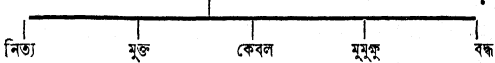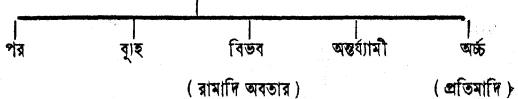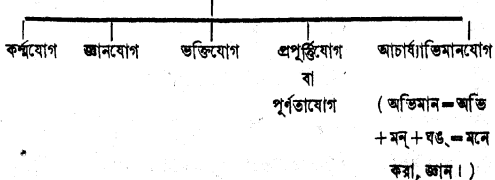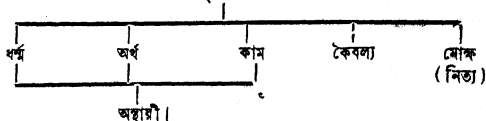
৫। বিরোধী

স্বরূপ বিরোধী। পরস্বরূপ বিরোধী। উপায় বিরোধী। পুরুষার্থ বিরোধী। প্রাপ্তি বিরোধী।

পরম দার্শনিক শ্রীমৎ মধ্বাচার্য্য মহর্ষি বেদব্যাসের শিষ্য ছিলেন। ইনি দাক্ষিণাত্যবাসী পণ্ডিত ও পরম ভাগবত ছিলেন, এবং তাঁহার পাণ্ডিত্যও ছিল অসাধারণ। তিনি ৩৭ খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন ব্যতিরেকে 'গীতাভাষ্য,' 'সূত্রভাষ্য,' 'ঋকৃভাষ্য,' 'দশোপনিষদ্ভাষ্য,' 'তন্ত্রসার,' 'অনুবেদান্তরসপ্রকরণ,' এইগুলিই বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

মধ্ব মুনির সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।"[১]

শ্রী (লক্ষ্মী দেবী) যেমন রামানুজ স্বামীকে সম্প্রদায় প্রবর্ত্তনক্ষম বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা সেইরূপ মধ্বাচার্য্যকে সম্প্রদায় প্রবর্ত্তনক্ষম বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।"

১। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত 'প্রমেয়রত্নাবলী', ১।৬ রত্ন।

শ্রীগোবিন্দভাষ্য

"যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতস্তুন্বন্তি দিব্যৈস্তবৈ-
বেঁদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥"

—এমন যে শ্রীহরি তাঁহার চরণারবৃন্দে কোটী কোটী নমস্কার।

ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন বাখ্যান মানসে শ্রীগোবিন্দভাষ্য শ্রীহরির স্বপ্নাদেশে কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনুগত বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য হিসাবে ভগবদ্ কৃপা লাভ করিয়া শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীগোবিন্দভাষ্য রচনা করেন। কথিত আছে মহর্ষি-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ শ্রীমদ্ভাগবতরূপ বেদান্তের মহাভাষ্য থাকাতে শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং অন্য কোনও ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেন নাই; তিনি শ্রীমৎ মধ্বাচার্য্য বিরচিত পূর্ণপ্রজ্ঞ-দর্শনই শ্রীমদ্ভাগবতের অনুমোদিত দেখিয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের ভাষ্য বলিয়া এক প্রকার স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, এবং মধ্বমুনির রচিত ভাষ্যের যে যে অংশ শ্রীমদ্ভাগবতের আপাততঃ বিরোধী বলিয়া তাঁহার প্রতীয়মান হইয়াছিল সেই সেই স্থলে তিনি তাঁহার প্রকৃত ব্যাখ্যা করিয়া সামঞ্জস্য-বিধান করিয়া দেন, কিন্তু তিনি বা তাঁহার পার্শদ শ্রীশ্রীগোস্বামীপাদগণ কেহই গ্রন্থাকারে কোন ব্যাখ্যাই লিপিবদ্ধ করেন নাই। পরম-ভাগবত অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলদেব

বিদ্যাভূষণই প্রথমে চৈতন্য সম্প্রদায় অনুমোদিত ভাষ্য গ্রন্থাকারে গ্রথিত করেন। ইহাই জনপ্রবাদ, জনৈক অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত তাঁহার মুখে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব স্বীকৃত ভাষ্য শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া ঐ ভাষ্য দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় বলদেব বিদ্যাভূষণ বৃন্দাবনের শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউর স্বপ্নলব্ধ আদেশ লাভ করিয়া এই শ্রীগোবিন্দভাষ্য এক মাসের মধ্যে রচনা করেন। এই ভাষ্য-গ্রন্থ-শেষে বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিতেছেন—

"শ্রীমদ্ গোবিন্দ পদারবিন্দমকরন্দলুব্ধ চেতোভিঃ।
গোবিন্দভাষ্যমেতৎ পাঠ্যং শপথোঽর্পিতোঽন্যেভ্যঃ॥
বিদ্যারূপং ভূষণং মে প্রদায় খ্যাতিং নিন্যে তেন যো মামুদারঃ।
শ্রীগোবিন্দঃ স্বপ্ননির্দ্দিষ্ট ভাষ্যো রাধাবন্ধুর্বন্ধুরাঙ্গঃ স জীয়াৎ॥"

—শ্রীমৎ গোবিন্দ-পদারবিন্দ-মকরন্দ-লুব্ধচিত্ত ব্যক্তিগণই এই গোবিন্দভাষ্য পাঠ করুন, অন্য ব্যক্তি ইহা পাঠ করিতে অধিকারী নহে—নিষেধার্থ শপথ অর্পিত হইল। যে উদার হৃদয় পরম পুরুষ আমাকে বিদ্যরূপ ভূষণ প্রদান করিয়া তদ্দারা জগতে খ্যাত করিয়াছেন, সেই রাধারমণ বঙ্কিমমূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দ জয়যুক্ত হউন। শ্রীহরি, শ্রীহরি, শ্রীহরি।

শ্রীগোবিন্দভাষ্যেও বেদান্তদর্শনের ন্যায় অধ্যায়-বিভাগ আছে। শ্রীগোবিন্দভাষ্যের চারি অধ্যায়ের প্রতি অধ্যায়ে চারিটি করিয়া পাদ আছে আবার প্রতি পাদে কয়েকটি করিয়া অধিকরণ ও সূত্র আছে। প্রতি অধিকরণেই শাস্ত্র-সঙ্গতি, অধ্যায়-সঙ্গতি ও পাদ-সঙ্গতি বিবেচিত হইয়াছে এবং বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত এই চারিটি করিয়া অধিকরণ-অবয়ব প্রকাশিত হইয়াছে। বেদান্তের অধ্যায়গুলির প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহের স্থূল বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

প্রথম অধ্যায়ে নানাবিধ শ্রুতির ব্রহ্মে সমন্বয় করা হইয়াছে ; তাই ইহার নাম 'সমন্বয়াধ্যায়'।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্বপক্ষে স্মৃতিতর্কাদি বিরোধের পরিহার ও পরপক্ষে দোষারোপ, সর্ব্বেশ্বর হইতে তত্ত্বসমূহের উৎপত্তি কথন এবং ভূতবিষয়ক শ্রুতি বিরোধের পরিহার—এইগুলি প্রকাশিত হইয়াছে ; তাই ইহার নাম 'বেদান্ততত্ত্ব-অধ্যায়।'

তৃতীয় অধ্যায়ে সাধনতত্ত্ব বিচার করা হইয়াছে ; তাই ইহার নাম 'সাধনাধ্যায়'।

চতুর্থ অধ্যায়ে সাধন ফল বিচার করা হইয়াছে ; তাই ইহার নাম 'ফলাধ্যায়'।

শ্রীগোবিন্দভাষ্য পাঠে বেদান্তের উক্ত তত্ত্বগুলি বেশ স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হয় এবং ইহাতে তর্ক, যুক্তি ও সিদ্ধান্তগুলি অভিনব উপায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে, যাহা পাঠ করিলে তৎপ্রতিপাদ্য তত্ত্বগুলি পাঠক অতি সহজেই উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়। গোবিন্দভাষ্য ব্যতিরেকে বিদ্যাভূষণ মহাশয় আরও অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে,—'সিদ্ধান্ত রত্ন বা ভাষ্যপিঠক,' 'প্রমেয়রত্নাবলী,' 'বেদান্ত-সামন্তক,' 'গীতাভাষ্য' ও 'দশোপনিষদভাষ্য'-ই সুপরিচিত।

শ্রীগোবিন্দভাষ্যে নয়টি প্রমেয়-বস্তু নির্ণীত হইয়াছে ও সংক্ষেপে সেগুলির অবতারণা করা হইয়াছে—

১ম—শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরতম বস্তু, তিনিই অদ্বিতীয়তত্ত্ব।

২য়—তিনি নিখিল-নিগম-বেদ্য।

৩য়—তিনি বিশ্ব-সত্য।

৪র্থ—তদ্‌গত ভেদও সত্য।

৫ম—জীবমাত্রই শ্রীহরির দাস।

৬ষ্ঠ—জীবের সাধনগত তারতম্য স্বীকার্য্য।

৭ম—শ্রীকৃষ্ণের চরণ-লাভই মোক্ষ।

৮ম—ভক্তিই মুক্তির হেতু এবং ইহাই নির্গুণ হরি-ভজনরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান।

৯ম—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ (শ্রেষ্ঠার্থে, শ্রুতি) এই তিনটি প্রমাণ।

এই প্রমেয়-বস্তুগুলির বিশদ ব্যাখ্যা বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত 'প্রমেয় রত্নাবলী'তে পাওয়া যায়—সুধী পাঠকদিগকে আমরা এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি। উক্ত প্রমেয়বস্তুগুলির বিবৃতি ও বিচার সংক্ষেপে নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল। প্রমেয়-বিচার সমন্বিত ভাষ্যই বেদান্তের শ্রীগোবিন্দভাষ্য।

১ম প্রমেয় বস্তু—'শ্রীকৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতং'" (গোপালতাপনীউপনিষদ্, পূর্ব্ব, ১-ক) শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা, তিনিই অদ্বিতীয়-তত্ত্ব ; 'তস্মাৎ কৃষ্ণ এব ওঁ তৎসদিতি পরো দেবস্তং, ধ্যায়েৎ তৎ রসেৎতৎ ভজেৎ তৎ যজেদিতি' (গোপালতাপনী উপনিষদ্, পূর্ব্ব, ৮৷৩ সূত্র) ভগবান কৃষ্ণই একমাত্র শ্রেষ্ঠ দেবতা তিনিই দেবাদিদেব, অতএব তাঁহারই চিন্তা করিবে, তাঁহারই ধ্যান করিবে, তাঁহারই নাম জপ করিবে ও প্রেম সহকারে তাঁহারই সেবায় ও আরাধনায় ও পূজায় প্রবৃত্ত হইবে। তিনিই ওঁকার স্বরূপ সদ্রূপী ব্রহ্ম।

২য় প্রমেয় বস্তু—সকল বেদই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরম্পরারূপে শ্রীকৃষ্ণকেই গান করেন। 'সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি' (কঠোপনিষদ্)—সকল বেদে আর সমুদায় তপস্যায় সাক্ষাৎ ও পরম্পরারূপে একমাত্র শ্রীহরিরই নাম গান

করে। 'যোঽসৌ সর্ব্বৈর্বেদৈর্গীয়তে'—(গোপালতাপনীউপনিষদ্, উত্তর, ৮-ক সূত্র)।

৩য় প্রমেয় বস্তু—পরব্রহ্ম কৃষ্ণ এই অখিল জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন, এই বিশ্ব সৃষ্টি তাঁহার শক্তিকার্য্য বা সত্য। 'য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান নিহিতার্থোদধাতি।' (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্) —যিনি এক হইয়াও সর্ব্বব্যাপী, অদ্বিতীয় পরমেশ্বর, যিনি নিষ্ক্রিয় হইয়াও স্বীয় শক্তিযোগের প্রভাবে সকল জীব সৃষ্টি করিয়া তাহাদের অভাব-অভিযোগ ও দুঃখ-কষ্ট মোচন করেন তিনি বিশ্বসত্য—প্রতি সৃষ্ট-বস্তুর কারণই যে তাঁহার লীলাসঙ্কল্প।

৪র্থ প্রমেয় বস্তু—ঈশ্বর হইতে জীবের ভেদ, তাহাও সত্য ও নিত্য। যথা— 'যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ইতি॥' (মণ্ডুকোপনিষদ্)—জীব যখন ধ্যাননিরত হইয়া সুবর্ণের আভার ন্যায় জ্যোতি-স্বরূপ সৃষ্টি কর্ত্তা পরম-পুরুষ ব্রহ্মাকে দর্শন করে. তখন সেই তত্ত্বদর্শি জ্ঞানী সাধক পাপ-পুণ্য পরিশূন্য হইয়া, নির্দ্দোষ হইয়া, পরম সাম্য লাভ করে অর্থাৎ মোক্ষের অধিকারী হয়। জীব ও ঈশ্বরের ভেদ নিত্য, তবে অণুচৈতন্যরূপে জীব ঈশ্বরের অংশ বলিয়া ভক্তগণ ভেদ স্থলে উভয়ের অচিন্ত্য ভেদাভেদ পরিকল্পনা করেন।

৫ম প্রমেয় বস্তু—জীব ভগবানের দাস। শ্রীভগবান সকলেরই পূজ্য। যথা—'তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দৈবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদামদেবম্ ভুবনেশমীড্যম্ ইতি॥' (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্)—দেবতারও যিনি দেবতা, ঈশ্বরেরও (ব্রহ্মাদি) যিনি ঈশ্বর, প্রজাপতিগণেরও যিনি পতি এবং যিনি পর হইতেও

পরতম, জগতের একমাত্র ঈশ্বর তিনিই, তাঁহাকেই জানিব। এই পরম-দেবতার পূজা সকলেই করিয়া থাকেন—জীবগণ তাঁহারই দাস।

৬ষ্ঠ প্রমেয় বস্তু—জীব ও ঈশ্বরের সাম্য বিদ্যমান থাকিলেও জীবের সাধনার তারতম্য অনুসারে তাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত ঐহিক বা পারত্রিক ফলেরও তারতম্য হয়; কাজেই জীবের ব্রহ্ম হইতে সম্বরূপে অনুরূপে সাম্য থাকিলেও মায়া-মোহাদি জনিত ব্রহ্ম হইতে তাহার ভেদ ও সাধন-তারতম্য হেতু পরম্পরা-ভেদ স্বীকার্য্য।[১]

৭ম প্রমেয় বস্তু—জীবের শ্রীকৃষ্ণচরণলাভই মোক্ষ। জীব যখন ব্রহ্মতত্ত্ব-লাভ করে তখন সে মোক্ষের অধিকারী হয়। একমাত্র উপাসনায়ই ইহা সম্ভব।

"একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য
একোঽপি সন্ বহুধা যে বিভাতি।
তং পীঠস্থং যেঽনুভজন্তি ধীরা—
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥"

—গোপালতাপনী উপনিষদ্, পূর্ব্ব, ৫ম সূত্র

—পীঠ অর্থাৎ অদ্বিতীয় সর্বব্যাপী বিশ্ববসনকারী শ্রীকৃষ্ণই পূজ্য, যিনি এক হইলেও বহুরূপে প্রকাশিত হন। এমন পূজাপীঠ মধ্যস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে যে স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিগণ পূজা করেন, তাঁহারাই নিত্য সুখের অধিকারী হন—মোক্ষলাভ করিতে পারেন। অপরে সে সুখভাগী হইতে পারেন না।

১। "শান্ত্যাদ্যা রতি পর্য্যন্তা যে ভাবাঃ পঞ্চ কীর্ত্তিতাঃ।
তৈ দেঁবং স্মরতাং পুংসং তারতম্যং মিথো মতং॥"

—প্রমেয়রত্নাবলী, ৬ষ্ঠ প্রমেয় ৪র্থ সূত্র।

৮ম প্রমেয় বস্তু—ভক্তিই মুক্তির হেতু। কিন্তু ভক্তি[১] অহৈতুকি ; সাধুসেবা, গুরুসেবাই একমাত্র ভক্তি লাভের উপায়।

"অতিথিদেবো ভব।"—(তৈত্তিরীয়োপনিষদ্)—দেবভাবে ভগবান্ হরির ন্যায় অতিথির সেবা কর।

"আচার্য্যদেবোভব।"—(তৈত্তিরীয়) দেবভাবে ভগবান্ হরির তুল্য গুরুর সেবা কর। সেবাপরায়ণ হইলে ভক্তির স্ফুর্ত্তি হইবে ; ভক্তির পরাকাষ্ঠাই মুক্তি দান করে।

৯ম প্রমেয় বস্তু—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। এই তিন প্রমাণের মধ্যে শব্দই, অর্থাৎ অপৌরুষেয় শ্রুতিবাক্যই[২] শ্রেষ্ঠ, অপর দুইটি দোষ-দুষ্ট, কারণ দুইটিই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, সুতরাং স্থূল বস্তু-গ্রাহী। শ্রীমদ্ভাগবতে যে 'ঐতিহ্য' প্রমাণের উল্লেখ আছে তাহা প্রত্যক্ষেরই অন্তর্গত।

১। "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥ ইতি॥"

—ইহাই ভক্তির প্রকারভেদ—শ্রীভাগবতে বর্ণিত ও প্রমেয়রত্নাবলী, ৮ম প্রমেয়-প্রসঙ্গে উল্লিখিত।

২। "তথাহি বাজসনেয়িনঃ॥
আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ॥ ইতি॥"

—অরে, মৈত্রেয়ি ! আত্মার সাক্ষাৎকার করিবে এবং তাহার সাধন জন্য বৈদিক গুরু-মুখ হইতে শ্রবণ এবং বেদানুযায়ী তর্ক দ্বারা উহারই মনন অর্থাৎ অর্থ-নিশ্চয় এবং তাহার পর নিদিধ্যাসন—ধ্যান করিবে।

শ্রীগোবিন্দভাষ্যে আরও আছে ভক্তির প্রকৃত লক্ষণ ও ভক্তি-স্বরূপের বিচার, ভক্তিই যে জীবের একমাত্র পুরুষার্থের সাধক তাহার পরিচয় ও ভক্তি যে 'জ্ঞানরূপিণী ও আনন্দদায়িনী' তাহার সূক্ষ্ম বিচার এবং ভক্তিই যে জ্ঞানের সার তাহারও নির্দ্দেশ। বস্তুতঃ, সর্ব্ববিধ উপাধি-পরিশূন্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই ভক্তি এবং ইহাই ভক্তের নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি—ইহাই মোক্ষ পদবাচ্য।

শ্রীভগবানের কৃপায় শ্রীগোবিন্দভাষ্য পাঠে ভক্তগণের ভক্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা—

"ওঁ নমো বিশ্বস্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

শৈবদর্শন

"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসম্।
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্॥
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানম্।
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥"
ওঁ নমঃ শিবায়।

"ঐতরেয়" উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ
নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ
স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি॥"—১।১

—আদিতে এক পরমাত্মা (মহেশ্বরই) বর্ত্তমান ছিলেন। অন্য কোন কিছু ছিল না। তিনি সংকল্প করিলেন আমি লোক সৃষ্টি করিব।

প্রকৃতির সৃষ্টি ব্রহ্মের (মহেশ্বরের) অধীন, তাঁহার সৃষ্ট প্রকৃতি লইয়া ব্রহ্মা নিজ ব্রহ্মাণ্ড রচনা করেন। "ঐতরেয়" তাই বলিতেছেন—মহেশ্বরের সৃষ্টির ইচ্ছা হইলে তিনি "অপ্" সৃষ্টি করিলেন, 'অপই' কারণার্ণব—জগতের কারণ, অব্যক্ত প্রকৃতি। তারপর ব্রহ্মা অর্থাৎ লোকপালের সৃষ্টি।

"সোঽদ্ভ্য এক পুরুষং সমুদ্ধৃত্যামূর্চ্ছয়ৎ"
—ঐতরেয়-উপনিষদ্, ১।৩

—সেই পরমাত্মা মহেশ্বর 'আপ্' হইতে এক পুরুষ উদ্ধৃত করিয়া সংগঠিত করিলেন। এই পুরুষই ব্রহ্মা, তিনি প্রাকৃত উপাদানে গঠিত। বিষ্ণুও

সৌরমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী অধিষ্ঠাতা-পুরুষ, সেইজন্য তাঁহাকে আদিত্যস্থ-পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—পুরাণের ভাষায় ইঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী
নারায়ণ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।"

—বিষ্ণু ব্যাপক, সমস্ত সৌরমণ্ডল ব্যাপিয়া আছেন—ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই শরীর।

"শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে" এই বিশ্বের আদি ও বীজস্বরূপ মহেশ্বরের সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে। "শ্বেতাশ্বতর" বলিতেছেন—

"একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায়তস্থুঃ
য ইমাং লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ॥"—৩।২

—রুদ্র (মহেশ্বর) এক, তাঁহার দ্বিতীয় কেহ নাই, তিনিই জগৎচরাচর সমুদয় নিজের শক্তির দ্বারা শাসিত করেন।

এই রুদ্রই পরমপুরুষ, ইনিই মহেশ্বর—

"তম্ ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্।
....
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ॥"

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ৬।৭

—তিনি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর—তিনি মহেশ্বর। তিনিই পরাৎপর পরমপুরুষ; (প্রজা) পতিরও তিনি পতি। "বেদ-সার" স্তোত্রে তাই শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য গাহিলেন—

"পশূনাং পতিং পাপনাশং পরেশং, গজেন্দ্রস্য কৃত্তিং বসানং বরেণ্যম্।
জটাজূটমধ্যে স্ফুরদ্গাঙ্গবারিং, মহাদেবমেকং স্মরামি স্মরারিম্॥১॥

মহেশং সুরেশং সুরারাতিনাশং, বিভুং বিশ্বনাথং বিভূত্যঙ্গভূষম্।
বিরূপাক্ষমিন্দ্বর্কবহ্নিত্রিনেত্রং, সদানন্দমীড়ে প্রভুং পঞ্চবক্ত্রম্ ॥২॥
গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং, গবেন্দ্রাধিরূঢ়ং গুণাতীতরূপম্।
ভবং ভাস্বরং ভস্মনাভূষিতাঙ্গং, ভবানীকলত্রং ভজে পঞ্চবক্ত্রম্ ॥৩॥

* * * * *

শম্ভো মহেশ করুণাময় শূলপাণে, গৌরীপতে পশুপতে পশুপাশনাশিন্।
কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেকস্তং হংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোঽসি ॥১০॥
ত্বত্তো জগদ্ভবতি দেব ভব স্মরারে, ত্বয্যেব তিষ্ঠতি জগন্মৃড় বিশ্বনাথ।
ত্বয্যেব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ, লিঙ্গাত্মকে হর চরাচর বিশ্বরূপিন্॥১১॥"

—যিনি পশুগণের (জীবাত্মাদিগের) পতি, যিনি পরমেশ্বর (ঈশ্বরের ঈশ্বর), যিনি সকলের পাপ বিনাশ করেন, যিনি গজ-চর্ম্ম পরিধান করেন এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যিনি—যাঁহার জটাগুচ্ছের মধ্যে গঙ্গাজল তরঙ্গায়িত হইতেছে, সেই একমাত্র মদন-রিপু মহাদেবকে আমি স্মরণ করি।

—যিনি দেবগণের ঈশ্বর, যিনি মহেশ্বর, যিনি দেবতাদিগের শত্রুকুল বিনাশ করেন—যিনি বিভু (সর্ব্বব্যাপী), যিনি বিশ্বনাথ ও যিনি বিভূতিদ্বারা (অনিমাদি অষ্টসিদ্ধিদ্বারা) অঙ্গভূষণ করেন—যাঁহার নয়ন বিকৃত (অর্দ্ধনিমীলিত), যাঁহার ত্রিনয়নে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি বিদ্যমান, সেই সদানন্দ পঞ্চাননের আমি স্তব করি। যিনি পর্ব্বতের ঈশ্বর, যিনি প্রমথগণের অধিপতি, যিনি বিষপান করিয়া নিজে নীলকণ্ঠ হইয়াছেন—যিনি বৃষরূঢ়, যিনি সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ের অতীত—যিনি ভবনামে অভিহিত, যিনি পূর্ণজ্ঞানে দীপ্তিমান, যাঁহার অঙ্গ ভস্মদ্বারা বিভূষিত, সেই পঞ্চ-মুখ ভবাণীপতির আমি ভজনা করি।

* * * * *

—হে শম্ভু, হে মহেশ, হে করুণাময়—হে শূলপাণি, হে গৌরীপতি, হে পশুপতি, হে পশুপাশ (মল, কর্ম্ম, মায়া ও বাধা) বিনাশকারী, তুমি একাই স্বীয় করুণায় এই জগৎ পালন কর, রক্ষা কর ও বিনাশ সাধন কর; অতএব তুমিই কাশীপতি মহেশ্বর। হে দেব, হে ভব, হে মদনারি, তোমা হইতে জগতের উৎপত্তি; হে বিশ্বনাথ, তোমাতেই জগতের স্থিতি; হে মহেশ্বর, তোমাতেই জগতের পরিসমাপ্তি—হে হর! এই চরাচর-বিশ্ব তোমারই স্বরূপ।

শৈবদর্শন মতে, শিবই পরমেশ্বর, ইনিই বিশ্বনাথ—এবং যাবতীয় জীব পশুরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। জীবের কর্ম্মানুসারে পরমেশ্বর ফল প্রদান করেন, ইহাই এই দর্শনের নির্দ্দেশ। শৈবদর্শন মতে পরমেশ্বর কর্ম্মাদিসাপেক্ষ-কর্ত্তা—জীবগণের যাহার যেরূপ কর্ম্ম, পরমেশ্বর তাহাকে তদনুরূপ ফলভোগে নিযুক্ত করেন। পরমেশ্বরের কর্ম্মনিরপেক্ষতা স্বীকার করিলে তাঁহার উপর বৈষম্য ও নৈঘৃণ্য এই উভয়-বিধ দোষারোপ করা হয়, কিন্তু তিনি কর্ম্মাদিসাপেক্ষ-কর্ত্তা বলিয়া এ আশঙ্কা করা যুক্তিযুক্ত নহে যে তাঁহার স্বতন্ত্রতা নষ্ট হয়; অন্য কর্তৃক আদিষ্ট না হইয়া যখন তিনি জগৎ নির্ম্মাণ করেন, তখন তাঁহার স্বাতন্ত্র্য অব্যাহতই থাকে।

শৈবদর্শন আরও বলেন, জগতের উপাদানও ঈশ্বর-নিরপেক্ষ, ঈশ্বর জগৎ নির্ম্মাণ করেন বটে, কিন্তু জগতের উপাদান অনাদি, জীবগণও ঈশ্বরভিন্ন ও অনাদি। ন্যায়দর্শনের মতবাদের সঙ্গে শৈবদর্শনের এই মতবাদের মিল দৃষ্ট হয়।

শৈবদর্শন বলিতেছেন, পদার্থ তিন প্রকার, যথা—
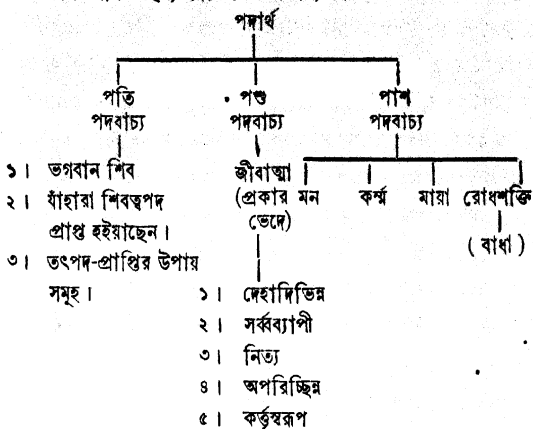
উক্ত ত্রিবিধ পদার্থের মধ্যে পশু অর্থাৎ জীবাত্মা চতুর্ব্বিধ পাশের অধীন। এই পাশ বিমোচন করিবার, বিনাশ করিবার কর্ত্তাই পতি অর্থাৎ ভগবান শিব, স্বয়ং মহেশ্বর।

শৈবদর্শন মধ্যে "নকুলীশপাশুপতদর্শন", "প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন" ও "রসেশ্বরদর্শন", এই তিনটি উক্ত দর্শনের প্রস্থান-বিশেষ মাত্র। অতীব সংক্ষেপে এই তিনটি দর্শনের মাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়-বস্তু আলোচিত হইল। ভগবান শিব আমাদের সহায় হউন—

"রুদ্র! যত্তে দক্ষিণং মুখম্
তেন মাং পাহি নিত্যম্।"

—হে রুদ্র, তোমার যে অপার করুণা, তাহার দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

নকুলীশপাশুপতদর্শন

শৈবদর্শনের 'পাশুপত-মত' অতীব প্রাচীন ; মহাভারতে এই মত বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থসমূহের ন্যায় জ্ঞান প্রদায়িনী বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

এই দর্শন মতে মুক্তি দুই প্রকার, আর তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাধক। সে কিরূপ ?

দর্শন-কার বলিতেছেন—চর্য্যাবিধি দ্বারা ধর্ম্ম সাধন করা যায়, তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, পারমৈশ্চর্য্য-প্রাপ্তি ও চরম-দুঃখ-নিবৃত্তি এই উভয়-বিধ মুক্তি লাভ করিতে "পশু" বা জীব সক্ষম হয়। চর্য্যাবিধি অর্থে প্রধান ধর্ম্ম-সাধন বুঝায়। চর্য্যাবিধি, যথা—
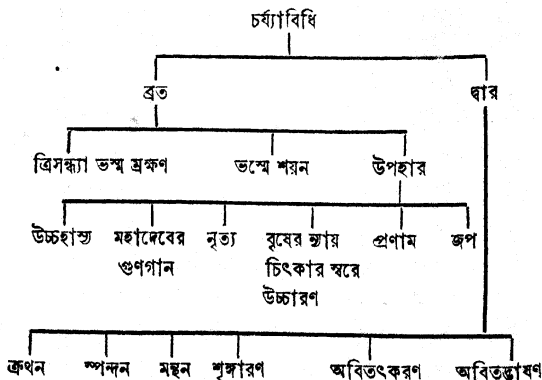
উচ্চহাস্য প্রভৃতি ছয় প্রকার 'উপহার' ভস্মে শয়ন ও ত্রিসন্ধ্যা ভস্ম স্নানই 'ব্রতের' তিনটি অঙ্গ। ক্রথন অর্থাৎ "ক্রথ—বধে", কম্পন, বিলোড়ন, রতিক্রিয়া, রক্ষা করা—পালন করা, সত্যভাষণ প্রভৃতি ছয় প্রকার উপায়ের দ্বারাই 'দ্বার' নিষ্পন্ন হয়। 'ব্রত' ও 'দ্বার' এই দুইটি চর্য্যাবিধি, এই চর্য্যাবিধিই ধর্ম্ম-সাধনের একমাত্র সহায় এবং মুক্তির সোপান স্বরূপ।

নকুলীশপাশুপতদর্শন বলেন, মহাদেবই পরমেশ্বর, জীবগণ 'পশু'—জীবের অধিপতি বলিয়া মহাদেবকে পশুপতি বলে।

মহাদেবই সর্ব্বকার্য্যের কারণ স্বরূপ। জীবগণের কর্ম্ম-নিরপেক্ষ হইয়াই তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, কারণ তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন বা স্বতন্ত্র। পাশুপতদর্শনের এই মত অন্যান্য শৈবদর্শনগুলি হইতে পৃথক।

"ওঁ নমঃ শিবায়।"

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন

"নিরুপাদান সম্ভারমভিত্তাবেব তম্বতে।
জগচ্চিত্রং নমস্তস্মৈ কলাশ্লাঘ্যায় শূলিনে॥"

—প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের প্রবর্ত্তক বসুগুপ্তাচার্য্য বলিতেছেন, বর্ণ ও তুলিকা প্রভৃতি উপাদানাদি ব্যতিরেকে অভিত্তিতে জগচ্চিত্র যিনি অঙ্কিত করেন, সেই অর্দ্ধেন্দুশেখর শূলপাণিকে নমস্কার।

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনেও মহাদেব শূলপাণি জগদীশ্বর বলিয়া স্বীকৃত।

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের মূল পাশুপতদর্শন ; শৈবদর্শনের যাবতীয় পরিভাষা, যথা ত্রৈবিধ্য—মন প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ এই ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বসংখ্যা সমস্তই ইহাতে গৃহীত হইয়াছে।

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে উক্ত হইয়াছে জীবগণ কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করে বটে, কিন্তু জীবাত্মায় (জগদুপাদানে) ও পরমাত্মায় (চিদাত্মায়) ভেদ নাই এবং ভক্তবৎসল মহাদেবই জগতের অধীশ্বর। এই অভেদে যে ভেদ জ্ঞান, ইহাই জীবের ভ্রম, আর এই ভ্রমই তাহার যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের মূল কারণ। জীব যখন সাধন-আরাধনার দ্বারা জানিতে পারে যে তাহার নিজের মধ্যেই সর্ব্বজ্ঞত্বরূপ ঈশ্বর-ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে, তখনই তাহার পূর্ণভাবের আবির্ভাব হয়—সে জানিতে পারে পরমাত্মায় ও তাহাতে কোনই ভেদ নাই। এই পূর্ণভাবের—অর্থাৎ, জীবের স্বরূপাবস্থানের আনন্দ অনুভবের যে জ্ঞান, তারই নাম "প্রত্যভিজ্ঞা" (recognition) ; ইহার অপরিজ্ঞানেই বন্ধন হয়। প্রত্যভিজ্ঞাই জীবকে "সোহং-ভাবে" (আমি দেহাদি ভিন্ন,

চিন্মাত্র, এইভাবে) লইয়া গেলে তাহার মুক্তি হয় ; প্রত্যভিজ্ঞাই মুক্তির সাধক। অন্যান্য বিষয়ে প্রত্যাভিজ্ঞাদর্শন অপরাপর শৈবদর্শনগুলির অনুরূপ।

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের প্রবর্ত্তক "বসুগুপ্ত," "কল্লট" প্রভৃতি আচার্য্যগণ এবং "ভট্টোৎপল", "ক্ষেমরাজ", "অভিনবগুপ্ত" প্রভৃতি আচার্য্যগণ ইহার প্রথয়িতা। এই দর্শনের বিষয়-বোধক শাস্ত্র পাঁচখানি, যথা—সূত্র, বৃত্তি, বিবৃতি, লঘুবিমর্শিণী ও বৃহৎ-বিমর্শিণী। ক্ষেমরাজ কৃত 'প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়' গ্রন্থে মাত্র কুড়িটি সূত্রে প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের বিষদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, গ্রন্থখানি অপূর্ব্ব।

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের প্রথম কারিকা বা সূত্রে উক্ত হইয়াছে—

"কথঞ্চিদাসাদ্য মহেশ্বরস্য
দাস্যং জনস্যাপ্যুপকারমিচ্ছন্ !
সমস্তসম্পৎসমবাপ্তি হেতুং
তৎ প্রত্যভিজ্ঞামুপপাদয়ামি ॥"

—কোন প্রকারে (গুরুকৃপায়) মহেশ্বরের দাস্য (স্বেচ্ছাকৃতদান) লাভ করিয়া ও জনসমাজের উপকার করিতে ইচ্ছুক হইয়া সমস্ত সম্পদ লাভের হেতুস্বরূপ মহেশ্বর প্রত্যভিজ্ঞার (নিজেকে মহেশ্বর বলিয়া চিনিবার) উপায় বিবৃত করিতেছি।

কি উপায় অবলম্বন করিয়া প্রত্যভিজ্ঞা লাভ করিতে হয় ? ক্ষেমরাজ বলিতেছেন—

প্রত্যভিজ্ঞা অর্থাৎ চিদানন্দ লাভ হয় মধ্যবিকাশ হইলে। মধ্যবিকাশ কি ? চৈতন্যের অপর নাম মধ্য, কারণ চৈতন্যই সকল বস্তুর অন্তরতম-রূপে বিদ্যমান ও স্বরূপ প্রকাশক ; চৈতন্য অর্থাৎ সংবিতের সঙ্কোচভাব

দূর হইলে তাহা বিকশিত হয় এবং আমরা আত্মদর্শনলাভ করিতে সক্ষম হই। এই বিকাশের নামই মধ্যবিকাশ। মধ্যবিকাশের উপায় কি? উপায় চারিটি, যথা—

প্রথম উপায়—বিকল্পক্ষয়। আমরা যদি সকল বাহ্য-বস্তুর চিন্তা ত্যাগ করি, কোন কিছুরই চিন্তা না করি, তাহা হইলে আমাদের মনে কোন সঙ্কল্প বা বিকল্প হয়না, সকল বিকল্প আমাদের ক্ষয় হয়—আমরা স্বরূপে অবস্থান করিতে পারি ও আমাদের সংবিতের বিকাশ হয়। শিবসূত্রে বিকল্পক্ষয় শাম্ভব-উপায় বলিয়া কথিত।

দ্বিতীয় উপায়—শক্তি সঙ্কোচ। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রা[illegible]হির্মুখী বলিয়া আমরা বাহিরের বস্তুকেই দেখি, অন্তরাত্মাকে দেখিনা। [illegible]ন্দ্রিয়-শক্তির সঙ্কোচ করিলে আত্মদর্শন করিতে পারা যায়।

তৃতীয় উপায়—শক্তির বিকাশ। আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাম [illegible] এক সময়ে এক এক বস্তু গ্রহণ করে, একই সময়ে যুগপৎ সকল ব[illegible]হণ করিতে পারেনা, কাজেই কেবল আংশিকভাবেই আমরা আ[illegible]গকে জানিতে পারি। যদি আমরা চেষ্টা ও যত্নের দ্বারা আমাদের সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া নিজেকে সর্ব্বতোভাবে জানিতে পারি, তাহা হইতে আমাদের স্বরূপের জ্ঞান হয়—আমাদের আত্মদর্শন লাভ হয়। শিবসূত্রে ইহাই শাক্ত-উপায় নামে উক্ত।

চতুর্থ উপায়—বায়ুচ্ছেদ বা প্রাণাপানের গতি-বিচ্ছেদ। যদি আমরা স্বরবর্ণ বিবর্জ্জিত 'ক' বা 'হ' উচ্চারণপূর্ব্বক প্রাণবায়ু ও আপন বায়ুর বিচ্ছেদ করি ও হৃদয়-পদ্ম মধ্যে চিত্ত স্থির করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের হৃদয়ান্ধকার ভেদ করিয়া সতই আত্মদর্শন লাভ হয়। যোগ-সূত্রে ইহাকেই সমাধি লাভের উপায় বলে।

উক্ত মুখ্য চারিটি উপায় ব্যতিরেকে 'ক্ষেমরাজ' আরও অনেকগুলি উপায় তাঁহার 'প্রত্যভিজ্ঞা-হৃদয়" গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যাহার দ্বারা চিদানন্দ লাভ করিতে পারা যায়।

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে চৈতন্যতত্ত্বও বিশেষ বিষদভাবে আলোচিত হইয়াছে। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন বলেন চৈতন্যই সকল বস্তুর নিয়ামক, ইহা হইতেই জগৎ নিষ্পন্ন হয়। যে ভাবে দর্পণের কোনও পরিবর্ত্তন সাধিত না হইয়াও তাহা হইতে নানা বস্তু প্রকাশিত হয়, চৈতন্যও তেমনই ভাবে অপরিবর্ত্তিত থাকিয়াই জগৎ প্রকাশিত করে। আবার ঠিক দর্পণেরই মত চৈতন্য বিনা উপাদানে স্বেচ্ছাক্রমে জগৎ প্রকাশিত করে। ইহ-জগৎ বৈচিত্রময়, কারণ জীব ও জীবভোগ্য পদার্থ পরস্পর-প্রভাবে নানা প্রকার। চিদাত্মাও যখন স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বশতঃ নিজেকে নানারূপে প্রকাশিত করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহার ইচ্ছাশক্তি অসঙ্কুচিত থাকিলেও সঙ্কুচিতের ন্যায় প্রকাশ পায় এবং তখনই তিনি সংসারী জীবরূপে প্রকটিত হন। এমনইভাবে, তাঁহার অব্যাহত ইচ্ছাশক্তি অনভিব্যক্ত হওয়াতে, তিনিই নিজেকে অপূর্ণ মনে করেন—তাঁহার জ্ঞানশক্তি সংকুচিতবৎ থাকায় তাঁহার দেহাত্মবোধ জন্মে, তাঁহার ক্রিয়াশক্তি পরিমিত হওয়ায় তিনি শুভাশুভ অনুষ্ঠানে রত হন, তাঁহার অপর শক্তি-সমূহও সংকোচবৎ থাকে, তিনি শক্তিদরিদ্র হইয়া সংসারী হন; কিন্তু শক্তির পুনঃ বিকাশে তিনি আবার শিব হন।

"নমঃ শিবায়।"

রসেশ্বরদর্শন

"প্রণম্য জগদুৎপত্তিস্থিতি-সংহার-কারণম্।
স্বর্গাপবর্গয়োদ্বারং ত্রৈলোক্যশরণং শিবম্॥"

শিবই রসেশ্বর। রসেশ্বর দর্শনও বলেন জীবাত্মা ও পরমাত্মায় ভেদ নাই—মহাদেবই পরমেশ্বর। তবে রসেশ্বরদর্শনের মতে একমাত্র প্রত্যভিজ্ঞাই মুক্তির সাধক নহে। রসেশ্বরদর্শন-কার বলেন মুমুক্ষু-দিগকে সর্ব্ব-প্রথমে স্বীয় দেহের 'স্থৈর্য্য' সম্পাদন করিতে হয় এ পরে যোগাভ্যাস দ্বারায় তাঁহাদের মুক্তি লাভ হয়।

রসেশ্বর তাই নির্দ্দেশ দিলেন, জীব প্রথমে পারদরসের বা রসে ারা স্বীয় দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিবে, তবেই তাহার দেহ সত্ত্বে মুক্তি লাভ ঘটিবে—সে জীবন্মুক্ত হইতে সক্ষম হইবে। রসেশ্বরের মতে দেব, দৈত্য, মুনি, ঋষি অনেকেই এই পন্থা অনুসরণ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছেন।

দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদন হেতু পারদের একান্ত আবশ্যক বলিয়া রসেশ্বর-দর্শনে পারদের অশেষ-প্রকার গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। রসেশ্বরে উক্ত হইয়াছে, যাবতীয় ধাতুর মধ্যে পারদই, অর্থাৎ রসই শ্রেষ্ঠ ধাতু। পারদ মহাদেব হইতে সম্ভূত বলিয়া কথিত, মহাদেবের যে প্রচ্যুত বীর্য্য ধরণী-তলে পতিত হয়, তাহাই পারদ রূপে পরিণত।

দেহের সার পদার্থ হইতে উৎপন্ন বলিয়া পারদ শুক্ল ও স্বচ্ছ এবং জাতি ও বর্ণ-ভেদে ইহা চতুর্ব্বিধ, যথা—শ্বেতবর্ণ পারদ, ব্রাহ্মণ জাতিয়; রক্তবর্ণ, ক্ষত্রিয় জাতিয়; পীতবর্ণ, বৈশ্য জাতিয় এবং

কৃষ্ণবর্ণ পারদ, শূদ্র জাতীয়। অপিচ, ইহাও উক্ত হইয়াছে, স্বস্থ পারদ ব্রহ্মা-স্বরূপ ; বদ্ধ পারদ, জনার্দ্দন-স্বরূপ ও রঞ্জিত ও কল্পিত পারদ মহেশ্বর-স্বরূপ।

পারদের পর্য্যায়, যথা—পারদ, রস-ধাতু, রসেন্দ্র, মহারস, চপল, শিববীর্য্য, রস, সূত ও শিবাহ্বয়। পারদকে রস কেন বলা হয়? 'ভাবমিশ্র' বলিতেছেন—

"রসায়নার্থিভিলোকৈঃ পারদো রস্যতে যতঃ।
ততো রস ইতি প্রোক্তঃ স চ ধাতুরপিস্মৃতঃ॥"

—রসায়ন হিসাবে লোকের দ্বারা পারদ রসিত বা ভক্ষিত হয় বলিয়াই ইহা 'রস' নামে অভিহিত, ইহাকে ধাতুও বলে—ইহাই রসের নিরুক্তি।

রসেশ্বরদর্শনে পারদের বিভাগ, বিশেষ বিশেষ লক্ষণ, তাহার গুণ ও পরিচয় এবং উপযোগিতা বর্ণিত হইয়াছে। পারদের কতিপয় তত্ত্ব নিম্নে যথা-সম্ভব সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল এবং পারদ বিষয়ক অন্যান্য তথ্যও সন্নিবিষ্ট হইল।

পারদ। (Mercury)

(পারদ বা রস জলীয় ধাতু বিশেষ। ইহার ইংরাজী সাঙ্কেতিক চিহ্ন—'Hg'; পরমাণবিক গুরুত্ব (atomic weight)—১৯৯·৮; আপেক্ষিক-গুরুত্ব, (Specific weight)—১৩·৯, at 0°C; বাংলায় ইহাকে 'পারা' বলে, লেটিন্ ভাষায় 'Hydrargyrum' বলে এবং ফরাসী ভাষায় 'সিমাব্'বলে।)

"ওঁ নমঃ শিবায়।"

১। যথা,—(ক) রসকর্পূর i.e., Corrosive Sublimate or Perchloride of Mercury—$HgCl_2$.

(খ) Calomel, i.e., Subchloride of Mercury or Mercurous Chloride,—$Hg_2 Cl_2$.

(গ) Grey powder, i e., Chalk-powder & Mercury & Hcl.

(ঘ) Black-wash, i.e., Lime-water & Calomel—for external application.

(ঙ) The Blue pills—pergative, ইত্যাদি।

২। যথা,—(ক) হিঙ্গুল (বর্ণ—জবাকুসুমসঙ্কাশ) i.e., Cinnabar, HgS, Sulphurate of Mercury

(খ) Red Oxide of Mercury—HgO.

(গ) চীনের সিন্দুর (Powdered Vermilion i.e , Red Sulphide of Mercury, HgS, it is artificial Cinnabar) ইত্যাদি।

৩। This particular use in still undiscovered and is a food to the students of Applied Chemistry.) যথা—কজ্জলী, i.e., Black Sulphide of Mercury—HgS.

পাণিনিদর্শন

"অ ই উ ণ্ । ১ ।

"ঋ ৯ ক্ । ২ ।

"এ ও ঙ্ । ৩ ।

"ঐ ঔ চ্ । ৪ ।

"হ য ব র ট্ । ৫ ।

"ল ণ্ । ৬ ।

"ঞ ম ঙ ণ ন ম্ । ৭ ।

"ঝ ভ ঞ্ । ৮ ।

"ঘ ঢ ধ ষ্ । ৯ ।

"জ ব গ ড দ শ্ । ১০ ।

"খ ফ ছ ঠ থ চ ট ত ব্ । ১১ ।

"ক প য্ । ১২ ।

"শ ষ স র্ । ১৩ ।

"হ ল্ "— । ১৪ ।

ইতি প্রত্যাহারঃ—"এতানি মহেশ্বর সূত্রানি অনাদি সংজ্ঞার্থানি।"

মহর্ষি পাণিনি তপস্যায় নিমগ্ন, এমন অবস্থায় তিনি উক্ত অনাদি সংজ্ঞার্থক মহেশ্বর সূত্রগুলি প্রাপ্ত হ'ন। কথিত আছে, শিক্ষা লাভার্থ গুরু-গৃহে সুদীর্ঘকাল শিষ্য-ভাবে অতিবাহিত করিয়াও আশানুরূপ বিদ্যোন্নতি না হওয়ায় পাণিনি হিমালয় প্রদেশে গমন করেন ও শব্দ-শাস্ত্রে প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হ'ন

এবং তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়া উপরি-উক্ত চতুর্দ্দশ সংখ্যক প্রত্যাহারাদি সংজ্ঞার্থক মহেশ্বর সূত্র মহাদেবের ডমরু-নিনাদ হইতে প্রাপ্ত হন।

মহাদেবের কৃপা লাভ করিয়া পাণিনি ব্যাকরণ-শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন ও তাঁহারই প্রসাদে একখানি ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন, ইহাই "অষ্টাধ্যায়ী" নামে পরিচিত—উহাই পাণিনি প্রবর্ত্তিত দর্শন-গ্রন্থ।

শব্দ-বিদ্যার অপূর্ব্ব ও অদ্বিতীয় দর্শন প্রণেতা মহর্ষি পাণিনি প্রাচীন ঋষিদিগের মধ্যে অন্যতম। তিনি উত্তর-ভারতের গান্ধার প্রদেশান্তর্গত শলাতুর গ্রামে জন্ম-গ্রহণ করেন এবং তাহার মাতার নাম ছিল দাক্ষী দেবী; পাণিনি এজন্য শলাতুরীয় ও দাক্ষেয় এই দুই নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন।

পাণিনির কাল নির্ণয়ে পাশ্চাত্ব পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে অনেক মতান্তর থাকিলেও পণ্ডিত-প্রবর ডাঃ লাইবিশ্ (Dr. Leibich) যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন তাহাই অনেকটা সমীচীন বলিয়া মনে হয়—তাঁহার মতে অনুমান খৃঃ পূঃ তিন শত অব্দে মহর্ষি পাণিনি জীবিত ছিলেন। ভারতীয় মতে পাণিনি কিন্তু আরও প্রাচীন; "বেদান্ত-সূত্র" প্রণেতা বেদব্যাস পতঞ্জলি কৃত "যোগ-সূত্রের" ভাষ্য কার, মহর্ষি পতঞ্জলি "পাণিনীর মহাভাষ্য" রচনা করেন, মহর্ষি কাত্যায়ন পতঞ্জলির পূর্ব্বাচার্য্য, তিনি পাণিনির ব্যাকরণের "বার্ত্তিক" নামে ভাষ্য রচনা করেন, সুতরাং মহর্ষি পাণিনি তাঁহারও পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন, ইহাই ভারতীয় মত।

পাণিনিই প্রথমে পদ-সাধন ও শব্দের দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রকট করিয়া ব্যাকরণ রচনা করেন। ব্যাকরণ-শাস্ত্র কিন্তু বহু পুরাতন। ব্যাকরণ-শাস্ত্র মাত্রই বেদাঙ্গ নামে অভিহিত, বেদাঙ্গ বেদের পরিশিষ্ট; "বৃহদারণ্যক" উপনিষদ বলিতেছেন, বেদাঙ্গ ছয়টি, যথা—

"শিক্ষা কল্পাব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দ সঞ্চরঃ।
জ্যোতিষাময়নঞ্চৈব বেদাঙ্গানি ষড়েব তু॥"

আবার, বেদ অন্তর্গত গোপথ-ব্রাহ্মণের ১।২৪ সূত্রেও "ওঁ" কারের ব্যাকরণ-সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বস্তুতঃ, পাণিনিরও বহু পূর্ব্বে ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দের অস্তিত্ব ছিল। মহর্ষি পাণিনির পূর্ব্বেও বহু ভাষা-রহস্যবিৎ পণ্ডিত বর্ত্তমান ছিলেন, এবং তাঁহাদিগের মধ্যে মণ্ডূক, বসিষ্ঠ, কাশ্যপ, গার্গাচার্য্য, জাবাল, যাস্ক, গালব, বৈশম্পায়ন, চরক, চাক্রবর্ম্ম, ভারদ্বাজ, শাকটয়ন, ভৃগু, সেনক, স্ফোটায়ন, জৈমিনি, ইন্দ্র, চন্দ্র, যম বর্ম্মা, প্রভৃতি ঋষিগণ অন্যতম। পাণিনির পূর্ব্বে প্রচলিত ব্যাকরণ গুলি "ঐন্দ্র" ব্যাকরণ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। পরবর্ত্তিকালে মহারাজা-শালিবাহনের সময়ে "কলাপ" ব্যাকরণ রচিত হয় ও তাহারও অনেক পরে বোপদেব কৃত "মুগ্ধবোধ" প্রণীত হয়।

"অষ্টকম্ পাণিনিয়ম্।" পাণিনি ব্যাকরণ অষ্টাধ্যায়ী, প্রতি অধ্যায়ে চারিটি করিয়া পাদ ও প্রত্যেক পাদ, অর্থাৎ পরিচ্ছদ, কয়েকটি করিয়া আহ্নিকে বিভক্ত; সমগ্র পাণিনির সূত্র সংখ্যা ৩৮৬। উক্ত আট অধ্যায়ে (১) সন্ধি, (২) সুবন্ত ও তিঙন্ত, (৩) উনাদি, (৪) অখ্যাত ও নিপাত, (৫) উপসংখ্যান, (৬) স্বরবিধি, (৭) শিক্ষা, (৮) কৃদন্ত ও তদ্ধিত প্রভৃতি বিবৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবৃতির প্রকৃতি দর্শন-মূলক, তাহা শুধুই যে ব্যাকরণ-প্রকরণ তাহা নহে এবং ইহাই মহর্ষি পাণিনির বিশেষত্ব।

পাণিনির পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ, তাঁহার প্রতিভা অসামান্য এবং তাঁহার দূরদর্শিতাও অতুলনীয় ছিল। প্রথমা হইতে সপ্তমী বিভক্তি, একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, উপসর্গ, নিপাত, ধাতু, প্রত্যয়, প্রদান, প্রযত্ন,

ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কাল এগুলি পাণিনির পূর্ব্ব-প্রচলিত ব্যাকরণ পরিভাষা। কিন্তু, অনুনাসিক, হ্রস্ব ও দীর্ঘ, গুণ ও বৃদ্ধি, পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ, উপধা, পদ, বিভক্তি, আদেশ, সংযোগ, সবর্ণ প্রভৃতি পরিভাষা পাণিনির নূতন ব্যাখ্যা। প্রধানতঃ, চারিটি বিষয়ে পাণিনিকে আবিষ্কর্ত্তা বলা যাইতে পারে, যথা—

১ম—মহেশ্বর সূত্র সমূহ ও প্রত্যাহার দ্বারা তাহাদিগের প্রয়োগ ;

২য়—তাঁহার নবোদ্ভাবিত অনুবন্ধ সমূহ ;

৩য়—কৃৎ, নদী, স্ত্রী, ঘ, ঘি, লু প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের উদ্ভাবন ;

৪র্থ—গণসমূহের প্রবর্ত্তন।[১]

পাণিনি অবলম্বন করিয়া বহু ভাষ্য-গ্রন্থ, টীকা ও ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে, এবং তন্মধ্যে মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত "পাণিনীয় মহাভাষ্যই" শ্রেষ্ঠ। ইহা ব্যতিরেকে, পাণিনি ব্যাকরণে আলোচিত বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে প্রযুক্ত শব্দসমূহের বিবৃতি ও ব্যাখ্যান সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া বিধা

১। মহর্ষি পাণিনির মতে, সংস্কৃতে ধাতু-সমূহ দশটি শ্রেণীতে বিভক্ত, এক একটি শ্রেণীর নাম গণ। বিভিন্ন গণের নাম যথা—

"ভ্বাদ্যদাদী জুহোত্যাদির্দ্দিবাদিঃ স্বাদিরেব চ।
তুদাদিশ্চ রুধাদিশ্চ তনক্র্যাদি চুরাদয়ঃ, ॥ ইতি ॥"

—ভ্বাদি, আদাদি, হ্বাদি, দিবাদি, স্বাদি, তুদাদি, রুধাদি, তনাদি, ক্র্যাদি, চুরাদি, এই দশটি গণে ধাতুবিভাগ একান্তই অভিনব। বোপদেব গোস্বামী বিরচিত 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণের পরিশিষ্টে বিবৃত 'গণার্থচন্দ্রিকার' অন্তর্গত "কবিকল্পদ্রুম" নামে ধাতুপাঠ উক্ত গণসমূহে বিভক্ত সংস্কৃত ধাতুপুঞ্জের একখানি সুলিখিত কাব্যগ্রন্থ। আট জন প্রাচীন শাব্দিক, যথা—ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশ, কৃৎস্ন, শাকটায়ন, পাণিনি, অমর ও জৈনেন্দ্র, ইহাদিগের প্রোক্ত মতানুযায়ী বোপদেব "কবিকল্পদ্রুম" রচনা করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত ভট্টোজি দীক্ষিত পাণিনীর অপর সূত্রগুলি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য ভাষায় "সিদ্ধান্ত-কৌমুদী" নামে একখানি পাণিনি-ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ (abridged edition) প্রকাশিত করেন—ইহাই এখন সর্ব্বত্র অধীত হয়।

পাতঞ্জলি-মহাভাষ্য পাণিনি ব্যাকরণের ভাষ্য-গ্রন্থ, টীকা নহে।[১] মহাভাষ্য পাঠ করিয়া তাহার ভাষার মাধুর্য্যে, যুক্তির পারিপাট্যে ও দৃষ্টান্তের সৌন্দর্য্যে আনন্দে বিভোর হইয়া যাইতে হয়। সমগ্র মহাভাষ্যে কোথায়ও 'আমি বলিতেছি' এ কথা নাই, তদ্‌পরিবর্ত্তে "উচ্যতে", "ব্রূম", এইরূপ উক্তিতে বিষয়গুলি বোঝান হইয়াছে এবং প্রতিপাদ্য বস্তু এমন সরল, সুসংযত, স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে যে সুকুমারমতি বালকেও তাহা সহজেই বুঝিতে সক্ষম হয়। ব্যাকরণের নাম শুনিয়াই যাহারা ভয় পান, তাঁহারা যদি পাতঞ্জলি মহাভাষ্য পাঠ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের সে ভয় ত তিরোহিত হইবেই, উপরন্তু ঈদৃশ সাধারণ পাঠক বিশেষ উপকৃতও হইবেন। মহাভাষ্য পাঠে, মহর্ষি পতঞ্জলি যে কালে বর্ত্তমান ছিলেন, তখনকার রীতি ও নীতি, আচার ও ব্যবহার প্রভৃতি অনেক কিছুই জানিতে পারা যায় এবং এই মহাভাষ্যেরই বিচার-পদ্ধতি অনুকরণে পরবর্ত্তীকালে নব্য-ন্যায়ের বিচার-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

পাণিনীয় ব্যাকরণের অন্যান্য ভাষ্য-গ্রন্থ ও টীকা সমূহের মধ্যে বার্ত্তায়নের "বার্ত্তিক", কৈয়টের "ভাষ্য", ভর্ত্তৃহরির "মহাভাষ্যের টীকা," "কাশিকাবৃত্তি",

---

১। ভাষ্য এবং টীকা উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। টীকাতে প্রধানতঃ শব্দার্থই ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে, কিন্তু ভাষ্য প্রধানতঃ মূল-গ্রন্থের বিষয় পরম্পরার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হয় এবং মৌলিকতত্ত্ব সন্নিবেশিত হয়, আবশ্যক স্থলে সমালোচনাও থাকে—ভাষ্যকার স্বয়ং সূত্রও রচনা করেন।

পুরুষোত্তমদেব কৃত "ভাষ্যবৃত্তি", বরদারাজ কৃত "লঘু কৌমুদী" ও "মধ্য কৌমুদী" এবং নাগেশ ভট্ট প্রণীত "শব্দেন্দুশেখর", "পরিভাষা-সংগ্রহ", "পরিভাষা-বৃত্তি" ও "পরিভাষেন্দুশেখর" প্রভৃতি গ্রন্থই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থারম্ভে পাণিনি বলিতেছেন—

"অথ শব্দানুশাসনম্।"—১।১

—শব্দের অনুশাসন, অর্থাৎ ব্যুৎপত্তি (বিশিষ্টরূপ উৎপত্তি)—শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি বিভাগ, [১] তথা স্বরের দ্বারা শব্দের অর্থ জানিতে হইবে, শিক্ষা করিতে হইবে।

স্বরের উৎপত্তি কথনে মহর্ষি পাণিনি তাঁহার ব্যাকরণের "শিক্ষা" অধ্যায়ে বলিতেছেন—"আমাদের মনস্বরূপ আত্মার নির্দ্দেশে শরীরের উত্তাপের দ্বারায় চালিত হইয়া নাভিমূল হইতে একটি বায়ু (সমান বায়ু) ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া যখন কণ্ঠে আসিয়া আঘাত লাগে[২] তখন যে অব্যক্ত শব্দ হয় তাহাকে "নাদ" বলে। বাগিন্দ্রিয় জিহ্বা এই নাদকে যে স্থানে সংলগ্ন করায় সেই স্থানের ন্যায় শব্দ উচ্চারিত হই[য়া] তখন বহির্গত হয়—ইহা বক্তার সম্পূর্ণ-ভাবে ইচ্ছাধীন।" বক্তার ইচ্ছায় এবং নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া যখন ঐ নাদ বর্ণরূপে জিহ্বামূলে সংলগ্ন হয় তখন তাহাকে 'জিহ্বামূলীয়' বর্ণ বলে, যখন গলদেশে সংলগ্ন হয় তখন তাহাকে 'তালব্য' বর্ণ ব'লে, যখন মূর্দ্ধাদেশে (মস্তকে) সংলগ্ন হয়

১। ক্রিয়াবাচক যাহা, অর্থাৎ, ধাতু এবং বস্তুবাচক বা বস্তুর বিশেষণ বাচক যাহা, অর্থাৎ, প্রাতিপদিক—এই দুইটি 'প্রকৃতি' নামে অভিহিত। ধাতু ও প্রাতিপদিকের উত্তর যাহা হয়—অর্থাৎ, মূলভাগের পর যাহা থাকে, তাহাকে 'প্রত্যয়' বলে। প্রত্যয় পাঁচটি, যথা—বিভক্তি কৃৎ, তদ্ধিৎ, স্ত্রী ও ধাত্বাবয়ব।

২। "আত্মাবুদ্ধ্যা সমর্থ্যার্থাত্মনো যুঙক্তে বিবক্ষয়া।
মনঃ কায়াগ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্॥"—"পাণিনীয়া শিক্ষা"।

তখন তাহাকে 'মূর্দ্ধণ্য' বর্ণ ব'লে—এইরূপে 'দন্ত্য', 'ওষ্ঠ্য', 'কণ্ঠ', 'অনুনাসিক', 'কণ্ঠ্যতালব্য', 'কণ্ঠৌষ্ঠ্য', 'দন্তৌষ্ঠ্য' প্রভৃতি স্থান-ভেদে বর্ণের দশটি উচ্চারণ-স্থান বর্ত্তমান। বিসর্গের (ঃ) কোন নির্দ্দিষ্ট উচ্চারণ-স্থান নাই, বিসর্গ যখন যে স্বরবর্ণকে অবলম্বন করিয়া থাকে, তখন সেই স্বরবর্ণের উচ্চারণ-স্থানই বিসর্গের উচ্চারণ-স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়, এজন্য বিসর্গকে 'আশ্রয়স্থানভাগী' বর্ণ ব'লে। পাণিনি তাই নির্দ্দেশ দিলেন, এমন ভাবে বর্ণ সকল উচ্চারণ করিতে হইবে যাহাতে তাহারা অব্যক্ত বা পীড়িত না হয়—"নাব্যক্তা ন চ পীড়িতাঃ।" অতাব সংক্ষেপে পর-পৃষ্ঠায় বিভিন্ন পর্য্যায়ভুক্ত বর্ণের উচ্চারণস্থানগুলি অবতারণিকার আকারে লিপিবদ্ধ হইল।

বর্ণ-নির্ণয়[১] সম্বন্ধেও পাণিনির দার্শনিক বিবৃতি বর্ত্তমান। পাণিনি বলিতেছেন, স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ-ভেদে বর্ণ দ্বিবিধ। যে সকল বর্ণ অন্য অন্য বর্ণের আশ্রয় ব্যতিরেকে উচ্চারিত হইতে পারে, অর্থাৎ, যাহারা অস্পৃষ্ট, কেবল স্বয়ং হইতেই উচ্চারিত হয়, সেগুলিকে স্বরবর্ণ[২] বলে; আর যে বর্ণগুলি স্বরবর্ণের আশ্রয় ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র উচ্চারিত হয় না, তাহাদিগকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে।

১। বর্ণ নির্ণয়ের পর্য্যায় ১৩৭ পৃঃ প্রদত্ত হইল।

২। অ, ই, উ, ঋ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ এই নয়টি স্বরবর্ণের উচ্চারণ-ভেদে বৈয়াকরণিকেরা 'প্লুতসংজ্ঞা' (হ্রস্ব-স্বর উচ্চারণ করিতে এক নিমেষ কাল, দীর্ঘস্বরে উহার দ্বিগুণ, এবং প্লুতস্বরে তিনগুণ সময় লাগে) নির্দ্দেশ করিয়া 'প্লুতস্বর' নামে স্বতন্ত্র স্বরবর্ণ হিসাবে গণনা করেন; তদনুসারে স্বরবর্ণের সংখ্যা বাইশটি। 'মুগ্ধবোধ' প্রণেতা বোপদেব আবার দীর্ঘ ঌ কার স্বীকার করেন, তাই সর্ব্বসমেত স্বরবর্ণের সংখ্যা তেইশটি।

বর্ণের উচ্চারণ-স্থান

(১) কবর্গ = ক. খ, গ, ঘ, ঙ।

(২) চবর্গ = চ, ছ, জ, ঝ, ঞ।

(৩) টবর্গ = ট, ঠ, ড, ঢ, ণ।

(৪) তবর্গ = ত, থ, দ, ধ, ন।

( ) পবর্গ = প, ফ, ব, ভ, ম।

৮ম, ৯ম ও ১০ম পর্য্যায়ভুক্ত উচ্চারণ-স্থানগুলিতে উচ্চারিত বর্ণ-সমুদয় উরঃ (বক্ষঃ) হইতেও উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে "উরঃ" বলে—এই হেতু মূলতঃ বর্ণের উচ্চারণ-স্থান আটটি।
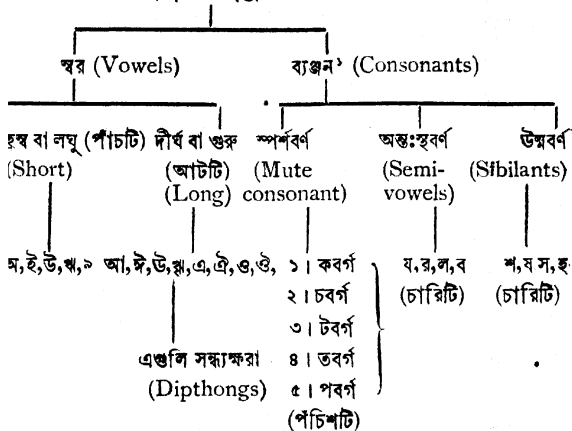
১। ক বর্গ হইতে প বর্গ পর্য্যন্ত পঁচিশটি ব্যঞ্জনবর্ণকে স্পর্শবর্ণ বলে, তাহার কারণ গুলি জিহ্বার অগ্র, উপাগ্র, মধ্য ও মূল এই চারিটি স্থান স্পর্শ করিয়া তবে উচ্চারিত য়। শ, ষ, স, হ এগুলি উষ্মবর্ণ—অর্থাৎ, এই চারিটি বায়ুপ্রধান বর্ণ, এগুলির উচ্চারণ ময়ে বায়ুর প্রাধান্য বর্ত্তমান। য, র, ল, ব এই চারিটি বর্ণ স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণ এই ভয়বিধ বর্ণের মধ্যস্থিত বলিয়া ইহাদিগকে অন্তঃস্থবর্ণ বলে। মহর্ষি পাণিনির সংজ্ঞানুযায়ী ও ঃ এই দুইটি বর্ণের উল্লেখ অর্থাৎ যোগ নাই এবং এই দুইটি বর্ণ ব্যতিরেকেও প্রয়োগ-র্ব্বাহ হয়, এই দুইটি কারণে ং ও ঃ কে অযোগবাহবর্ণ এই আখ্যা দিয়া ব্যঞ্জনবর্ণ মধ্যে রিগণিত করা হয়। বিসর্গের আরও দুইটি রূপ আছে—একের নাম 'জিহ্বামূলীয়', ন্যের নাম 'উপাধ্মানীয়', এই হেতু বিসর্গকে উক্ত দুইটি স্বতন্ত্ররূপে বৈয়াকরণেরা বিভিন্ন র্ণ বলিয়া গণনা করেন। অনেক শাব্দিকের মতে ঌকারকেও ব্যঞ্জনবর্ণ মধ্যে গণনা রা হয়—এইরূপে ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা আটত্রিশটি। উক্ত ব্যঞ্জনবর্ণগুলি ব্যতিরেকেও ম' নামে আরও চারিটি ব্যঞ্জনবর্ণ আছে (যথা—কুং, খুং, গুং, ঘুং), ইহাদের উচ্চারণ-ন নাসিকা—ইহারা অযোগবাহ বর্ণ, কিন্তু ইহাদের লৌকিক ব্যবহার নাই—সমুদয়ে তাই ঞ্জনবর্ণের সংখ্যা বিয়াল্লিশটি।

মহর্ষি পাণিনি প্রবর্ত্তিত নূতন পরিভাষার আরও কয়েকটির পরিচয় বিবৃত হইতেছে—

(ক) "লঘু ও গুরু"—হ্রস্ব স্বরবর্ণ 'লঘু' ও দীর্ঘ স্বরবর্ণ 'গুরু' নামে অভিহিত।

(খ) "গুণ ও বৃদ্ধি"—স্বরবর্ণের গুণ হইলে ই ঈ স্থানে এ, উ ঊ স্থানে ও, ঋ ৠ স্থানে অর্ ও ঌ স্থানে অল্ হয় এবং স্বরবর্ণের বৃদ্ধি হইলে অ স্থানে আ, ই ঈ স্থানে ঐ, উ ঊ স্থানে ঔ, ঋ ৠ স্থানে আর্ ও ঌ স্থানে আল্ হয়।

(গ) "বিভক্তি"—অর্থযুক্ত শব্দের বা প্রাতিপদিকের উত্তর 'সু, ঔ, জস্' প্রভৃতি একুশটি এবং ধাতুর উপর তিপ্, তস্, ঝি প্রভৃতি একশত আশীটি যে প্রত্যয়[১] হয় তাহাদিগকে বিভক্তি বলে।

(ঘ) "আদেশ"—প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের কথন কথন রূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহাকে আদেশ বলে। যথা—বৃদ্ধ শব্দ স্থানে 'জ্য,' স্থা ধাতু স্থানে 'তিষ্ঠ', যা বিভক্তি স্থানে 'ই' প্রভৃতি।

(ঙ) "সুবন্ত ও তিঙন্ত"—প্রাতিপদিকের উত্তর যে প্রথমাদি সাতটি

১। বিভক্তি ব্যতিরেকে যে আরও চারিটি প্রত্যয় (affixes & suffixes) হয় তাহার মধ্যে (১) ধাতুর উত্তর 'তব্য,' 'অনীয়,' 'যৎ,' 'শতৃ,' 'শানচ্' প্রভৃতি প্রত্যয়কে কৃৎ (Participle) প্রত্যয় বলে; যথা—ভবিতব্য, রমণীয়, গম্য, পঠৎ, বর্ত্তমান ইত্যাদি। (২) শব্দের উত্তর 'ষ্ণ,' 'ঢেয়' 'মতুপ' 'ষ্ণ' প্রভৃতি প্রত্যয়কে তদ্ধিত প্রত্যয় (Nominal affixes or Secondary suffixes) বলে, যথা—গাঙ্গেয়, মতিমান ইত্যাদি। (৩) শব্দের উত্তর 'আপ্,' 'ইক্,' 'ইৎ', প্রভৃতি প্রত্যয়কে স্ত্রীপ্রত্যয় (Feminine bases) বলে; যথা—স্থির-স্থিরা, শ্রীমৎ-শ্রীমতী ইত্যাদি। (৪) ধাতুর উত্তর 'ই,' 'স' প্রভৃতি ও প্রাতিপাদকের উত্তর 'য', 'কাম্য' প্রভৃতি প্রত্যয়কে ধাত্ববয়ব বলে।

বিভক্তি হয় তাহাদের নাম 'সুপ্'[1] ; 'সুপ্' প্রাতিপদিকের অন্তে যোগ হইলে পদ নিষ্পন্ন হয় বলিযা ঐ সকল পদকে সুবন্ত-পদ বলে। ধাতুর উত্তর যে বিভক্তি হয় তাহাদের নাম 'তিঙ্'[2] ; তিঙ্ ধাতুর অন্তে যোগ হইলে পদ নিষ্পন্ন হয় বলিয়া ঐ সকল পদকে তিঙন্ত-পদ বলে।

(চ) "পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ"—ধাতুর বিভক্তির আকার সমুদয়ে একশত আশীটি। ইহারা পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ এই দুইভাগে বিভক্ত। মহর্ষি পাণিনি প্রথমতঃ লটের পরস্মৈপদে নয়টি ও আত্মনেপদে নয়টি এই আঠারটি বিভক্তির নির্দ্দেশ করিয়া ইহাদেরই স্থানে ক্রমে ক্রমে একশত আশীটি বিভক্তির আদেশ বিধান করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন কালে ধাতুর উত্তর লটাদি দশটি বিভক্তি হয়, সুতরাং পরস্মৈপদে নব্বই ও আত্মানপদে নব্বই—এই সর্ব্বসমেত বিভক্তির আকার একশত আশীটি।

পাণিনি সূত্রস্বরূপের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য দেখাইবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি মাত্র পাণিনিয়-সূত্রের উল্লেখ করা গেল—

(ক) পাণিনি নির্দ্দেশ দিলেন—"স্থানেঽন্তরতমঃ।"

—অর্থাৎ, যাহার প্রসঙ্গে যে বর্ণের আদেশ হইবে তাহা সর্ব্বদা তাহাদের সাদৃশ হইবে। সে কেমন? পাণিনি বলিলেন, রাজসভায় যেমন প্রত্যেক

১। শব্দের উত্তর একুশটি বিভক্তির আদি-অক্ষর 'সু' ও অন্ত-অক্ষর 'সুপ্'এর 'প' এই দুইটি বর্ণ লইয়া শব্দ-বিভক্তির 'সুপ' সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

২। ধাতুর উত্তর পাণিনি প্রবর্ত্তিত লটের আঠারটি বিভক্তির আদ্য-অক্ষর 'তিপ্' ও অন্ত-অক্ষর 'মহিঙ্'এর 'ঙ্' এই দুইটি বর্ণ লইয়া ধাতু—বিভক্তির 'তিঙ্' সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ব্যক্তি যথাস্থানে বসিয়া থাকে, যাহার যাহা নির্দিষ্ট স্থান সে তাহাই অধিকার করে, কেননা মাটিতে মাটিই মিশে, জলে জলই মিশ খায়।

(খ) বর্ণের সন্ধি প্রকরণে মহর্ষি পাণিনি মহেশ্বর সূত্রগুলি অবলম্বন করিয়া অভিনব উপায়ে সূত্র-সন্নিবেশ করিয়াছেন, যথা—

"অকঃ সবর্ণে দীর্ঘ।" [১] "ইকো যণচি।" [২] "এচোঽয়বায়াব।" [৩] "স্তোঃ শ্চুনা শ্চু" [৪] ইত্যাদি, ইত্যাদি।

১। 'অক্' অর্থে (মহেশ্বর সূত্রগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়) 'অ, ই, উ, ঋ, ৯' বুঝায়। অর্থাৎ, যদি 'অকের' পর স্ববর্ণ 'অক্' থাকে তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ হয়। যথা, দৈত্য+অরি=দৈত্যারি, শ্রী+ঈশ=শ্রীশ, গিরি+ইন্দ্র=গিরীন্দ্র, ইত্যাদি।

২। 'ইক্' অর্থে 'ই, উ, ঋ, ৯ (হ্রস্ব ও দীর্ঘ) বুঝায়। 'য, ব, র, ল' এই চারিটি 'যণ্'। অচ্ অর্থে স্বরবর্ণ। অর্থাৎ, যদি 'ইকের' পর স্বরবর্ণ থাকে, তাহা হইলে 'ইকের' স্থানে যথাক্রমে 'যণ' হয়। যথা, মধু+অরি=মধ্বারি, ৯+আকৃতি=লাকৃতি ইত্যাদি।

৩। 'এচ্' অর্থে "এ, ও, ঐ, ঔ" বুঝায়। 'অয়বায়াব'=অয়্, অব্, আয়, আব। অর্থাৎ, যদি 'এচের' পর 'অচ্' (স্বরবর্ণ) থাকে তাহা হইলে 'এচের' স্থানে যথাক্রমে 'অববায়াব' হয়। যথা—বিষ্ণো+এ=বিষ্ণবে, ভৌ+উক=ভাবুক, পৌ+অক=পাবক, ইত্যাদি। কিন্তু, "বান্তো যি প্রত্যয়ে," অর্থাৎ, যদি ও বা ঔ কারের পর 'যি' (যকারাদি শব্দ, যথা—যম্ প্রভৃতি) থাকে তাহা হইলে তাহার স্থানে যথাক্রমে 'বান্ত' (ব অন্ত, যথা—অব এবং আব) আদেশ হয়। যথা—গো+যম্=গব্যম্, নৌ+যম্=নাব্যম্, ইত্যাদি।

৪। 'স্তু' অর্থে স+তু=স্+তবর্গ এবং 'শ্চু' অর্থে শ+চু=শ্+চবর্গ। অর্থাৎ, 'স্তুর' ও 'শ্চুর' যোগে 'শ্চু' হয়। যথা—সৎ+চিৎ=সচ্চিৎ, রামস্+শেতে=রামশ্শেতে, মহান্+শব্দঃ=মহাঞ্শব্দঃ, ইত্যাদি।

"কঃ বাগযোগবিদ্"—বাগ্‌যোগবিদ্ ব্যক্তি, শব্দের যথার্থ ব্যবহার-পারদর্শি ব্যক্তি কে? পাণিনি বলিলেন—

"যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে কুশলো বিশেষে
শব্দান্ যথাবদ্ ব্যবহারকালে।
সোঽনন্তমাপ্নোতি জয়ং পরত্র
বাগ্‌যোগবিদ্ দুষ্যতি চাপশব্দৈঃ ॥"

—যে "কুশল," প্রয়োগ নিপুণ ব্যক্তি, ব্যবহার কালে শব্দ সকলকে যথাযথরূপে, অর্থাৎ, যেখানে যাহা প্রয়োগ করা উচিৎ সেইরূপ বিশেষ-বিশেষ বিষয়ে, প্রয়োগ করিতে পারেন, তিনি অনন্ত জয়লাভ করেন। শব্দের যথার্থ প্রয়োগ-নিপুণ ব্যক্তি, বাগযোগবিদ্ ব্যক্তি, অপশব্দ অর্থাৎ বিকৃত-শব্দ প্রয়োগের দ্বারা কখন দূষিত হন না।

"অপিচ উতত্ব ইতি"—এবং অপর ব্যক্তি, ব্যাকরণ-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি নাই এমন যে বিদ্যা-বিহীন ব্যক্তি, তিনি কেমন? পাণিনি বলিতেছেন—

"উতত্ব পশ্যন্নদদর্শ বাচম্
উতত্ব শৃণ্বন্নশৃণোত্যেসাম্।
উতোত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে
জায়েব পত্যুঃ উশতী সুবাশা ॥"

—"উতত্ব", অন্য এক ব্যক্তি, বাক্যকে দেখিয়াও দেখেন না; অর্থাৎ, প্রত্যক্ষে শব্দের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াও অর্থজ্ঞানের অভাবে বুঝিতে পারেন না। অপর কোন ব্যক্তি শ্রবণ করিয়াও শুনিতে পান না; অর্থাৎ, শ্রুত শব্দের অর্থ-জ্ঞানের অভাবে তাহা তাহাদের বোধগম্য হয় না—এমনই কার্য্যতঃ অন্ধ ও বধির বাক্-বিদ্যা-বিহীন ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে বলা হইল। কিন্তু

"উতো"—অপর এক ব্যক্তিকে, বাগ্‌যোগবিদ্ ব্যক্তিকে, পতিলাভার্থিনী জায়া যেমন সুবস্ত্রে ভূষিত হইয়া নিজের আত্মা বরণ করে (দান করে), তদ্রূপ বাগদেবী নিজ আত্মা বরণ করেন। বাগ্‌দেবী আমাদিগকে নিজ আত্মা বরণ করুন (দান করুন), এই নিমিত্ত ব্যাকরণ অধ্যয়ন একান্ত কর্ত্তব্য।

ব্যাকরণ শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে সুবিধা কি হয়? পাণিনি বলিতেছেন—

"শক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো,
যত্রধীরা মনসা বাচমক্রত।
তত্রো সখায় সখ্যানি জানতে,
ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধিবাচি॥"

—"তিতউ", কুলা দ্বারা ছাতু যে ভাবে পরিষ্কার করা হয়, ধীর ব্যক্তিগণ সেইরূপে মনের দ্বারা বাক্যকে পবিত্র করিয়া ব্যবহার করেন; ইহাঁদিগের বাক্যে বন্ধুবান্ধব সকলেই সন্তুষ্ট হন—প্রীতিলাভ করেন, ইহাঁদিগের বাক্যে ভদ্রা অর্থাৎ মঙ্গলদায়িকা লক্ষ্মী নিহিত থাকেন এবং ইহাঁরা কখন 'কল'[১] দোষে দূষিত হ'ন না। কেন 'কল' দোষ ইহাঁদের ঘটে না?

পাণিনি তাহার কারণ দেখাইয়া বলিলেন—

"আগমাশ্চ বিকারাশ্চ
প্রত্যয়াঃ সহ ধাতুভিঃ।
উচ্চার্য্যন্তে ততস্তেষু
নেমে প্রাপ্তা কলাদয়ঃ॥"

১। বর্ণের নিজ উচ্চারণ-স্থান ভিন্ন অপর স্থান হইতে উচ্চারিত স্বরকে "কল" বলে—বর্ণের নিজ উচ্চারণ স্থানকে "কাকলী" বলে। প্রধানতঃ, "কাকলি" শিক্ষার্থ ব্যাকরণ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করা বিধেয়।

—"আগম" কোন বর্ণের উপস্থিত হওয়াকে 'আগম' বলে (যথা—অ+গচ্ছৎ=অগচ্ছৎ, এখানে 'অ' আগম) বিকার, (বিকার অর্থে বর্ণের বিকৃতি বুঝায়, যথা—অন্ত+অন্ত=অন্তোঽন্ত, এখানে 'অ' বর্ণ বিকৃত হইয়া তাহার 'ও' বর্ণরূপ বর্ণবিকার হইল) ধাতু, প্রাতিপদিক, প্রত্যয় এবং ধাতুর সহিত প্রত্যয় ইহাঁদের যথাযথ রূপে উচ্চারিত হইয়া শুদ্ধভাবে পঠিত হয়, সেই হেতু 'কল' দোষে ইহাঁরা দূষিত হ'ন না।

অশুদ্ধ পাঠে অসুবিধা কি? শাস্তি কি? পাণিনিয় শিক্ষায় বজ্র-গম্ভীর সুরে নিষেধক-সূত্র প্রচারিত হইল—

"মন্ত্রোহীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা,
মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি,
যথেন্দ্র শত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ॥"

—স্বরের এবং বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ না হওয়ায় মন্ত্র বিফল হয়, উপরন্তু অর্থ-বোধের অভাবে উচ্চারিত মন্ত্রে কোন ফলোদয় হয় না—এই বজ্ররূপ বাক্য (মন্ত্র) যে বিকৃত করিয়া অশুদ্ধ ভাবে পাঠ ক'রে ইহা তাহাকেই নাশ করে—যেমন ইন্দ্রশত্রু বৃত্র 'ইন্দ্র' এই শব্দ স্বরের সহিত যথার্থ ভাবে না পাঠ করায় অপরাধি হইয়া বিনষ্ট হইয়াছিলেন।

বৈয়াকরণেরা তাই নির্দ্দেশ দিলেন—

"নাপদং শাস্ত্রে প্রযুঞ্জীত।"

—যাহা 'পদ' নহে তাহা শাস্ত্রে, ভাষায়, প্রয়োগ করিতে নাই। ধাতু ও প্রাতিপদিক বিভক্তি-যুক্ত হইলে তবেই তাহা পদবাচ্য হয়; "সুপ্-তিঙন্তং পদং"—সুবন্ত, অর্থাৎ বিভক্তি-যুক্ত শব্দ এবং তিঙন্ত, অর্থাৎ বিভক্তিযুক্ত ধাতুই পদবাচ্য।

পাণিনি ব্যাকরণকার বলিয়াই প্রধানতঃ প্রসিদ্ধ হইলেও তিনি একজন মহাকবিও ছিলেন। তাঁহার "পাতাল-বিজয়" ও "জাম্বুবতী-বিজয়" প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ ছন্দবন্ধ ও পদলালিত্যে সংস্কৃত কাব্য-সমূহের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে।

সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল কামনায় 'স্বস্তি' উচ্চারণ করিয়া ও পাণিনির বন্দনা গাহিয়া উপস্থিত পাণিনি-প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইল—

"স্বস্তি পাণিনয়ে তস্মৈ যস্য রুদ্র প্রসাদতঃ।
আদৌ ব্যাকরণং কাব্য-মনুজাম্ববতী জয়ম্॥"

ওঁ নমঃ শ্রীমহর্ষিভ্যঃ পাণিনিকাত্যায়ন পতঞ্জলিভ্যঃ ॥ ওঁ ॥

তথাকথিত
বেদমার্গ-বিরোধী দর্শন

তথাকথিত বেদমার্গ-বিরোধী দর্শন প্রধানতঃ তিনটি ; বৃহস্পতি ও চার্ব্বাক্ প্রবর্ত্তিত লোকায়ত দর্শন, অর্হত্ বা জৈন দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শন। বেদমার্গ বিরোধী দর্শন বলিয়া খ্যাত দর্শনগুলি বস্তুতঃ বেদবহির্ভূত কি না, এ প্রশ্নের উত্তর খুবই সন্দেহজনক। তবে, ইহাদের মধ্যে কোন কোন দর্শনে বেদ-বিধির আনুষ্ঠানিক বিরুদ্ধাচরণ যে নাই বা একেবারে দৃষ্ট হয় না, তাহাও নহে। কেন এই দর্শনগুলির উদ্ভব এবং প্রচলন হইল তাহারই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বিষয়টি সুগম হইয়া উঠিবে আশা করা যায়।

প্রায়ই দেখা যায়, ব্যক্তিগত বিরাগ বা অনুরাগ যেমন পরিবর্ত্তনশীল, জাতীয় জীবনেরও আশা ও আকাঙ্ক্ষা, প্রীতি বা বিদ্বেষ তেমনই সকল সময়ে একভাবে থাকেনা ; কখনওবা এক বিষয়ে জাতীয় অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়, আবার যুগভেদে সেই জাতীয় অনুরাগ আবার অন্য কোনও পথে প্রধাবিত হইতে দেখা যায়। জাতীয় অনুরাগ মূলতঃ দুইটি প্রবৃত্তির দ্বারা প্রণোদিত বা অনুপ্রাণিত হয়, একটি ঐহিক অপরটি পারত্রিক। তাই, মানব-সমাজও কখন কখন পরজগতের চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকে, আবার কখনওবা ইহজগতের সুখ-স্বাচ্ছন্দের প্রতি, সাংসারিক খ্যাতি-প্রতিপত্তির প্রতি, তাহার (মানব সমাজের) অপার নিষ্ঠা, অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয়। আর, এই নিয়মের বশবর্ত্তী

হইয়া যখন পরজগতের দোহাই পাড়িয়া ধর্ম্মধ্বজীরা ধর্ম্মের শুষ্ক আচার-অনুষ্ঠানের কঠিন নাগপাশে বদ্ধ হইয়া (become sanctimonious) স্বাধীন চিন্তা ও স্বাতন্ত্রের কথা ভুলিয়া যান তখন এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া-সূচক সাধারণ জনসমাজ ইহজগতের প্রতি একটু বেশী পরিমাণেই আকৃষ্ট হয়। যুগ-প্রবাহের এমনই ক্ষণে, ভারতেরও এতাদৃশ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল।

বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ড সমূহের অনুষ্ঠানের প্রকৃত উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তখনকার বিবুধমণ্ডলী যখনই উহাদের বহ্যিক আড়ম্বর ও সামান্য 'খুঁটি-নাটি' লইয়াই বিশেষভাবে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং জ্ঞানান্ধ যাজকেরা কালভ্রষ্ট ধর্ম্মের দোহাই দিয়া যখনই সমাজ শাসন করিতে চাহিয়াছিলেন, তখনই তাহার বিরুদ্ধে এক প্রকার বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া ইহকাল-সর্ব্বস্ব লোকায়ত-দর্শন দম্ভভরে প্রচারিত হইয়াছিল! বস্তুতঃ, ঋষি-প্রণীত বলিয়াই গ্রন্থ-বিশেষকে যে প্রমাণিক বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে এমন কিছু কথা নাই—এমনই একটি ভাব, তখনই দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। আর, এই ভাবধারা যেন পরিস্ফুট হইয়া "বাগ্‌ভট্টের" বজ্রগম্ভীর-কণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছিল, "তস্মাদ্ গ্রাহ্যং সুভাষিতম্"—সেগুলির মধ্যে যাহা সুভাষিত, আদি ও সুকৃত, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে, সেগুলিই পাঠ করা বিধেয়।

ভারতবর্ষে সেকালে এমনইভাবে স্বাধীন চিন্তার ধারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ, সে যুগের বৌদ্ধ বা জৈন দর্শনও এক অতীব অভিনব বৈরাগ্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। বৌদ্ধ বা জৈন এই উভয়বিধ দর্শনেরই আদি এবং ভিত্তি মহর্ষি কপিল প্রবর্ত্তিত সাংখ্য দর্শন। বৈদিক আর্য্য-দিগের ধর্ম্ম প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণরূপেই গৃহস্থের ধর্ম্ম, কাজেই তাঁহাদিগের

দর্শনে বৌদ্ধ বা জৈন দর্শনের ন্যায় বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসভাব মোটেই পরিলক্ষিত হয় না—এ অবধুত ভাব-দর্শন সম্পূর্ণরূপেই অভিনব।

ভারতবর্ষের যুগ পরিবর্ত্তনকারী উক্ত ঐতিহাসিক সময়ে কালে কালে দেশময় নূতন নূতন তত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছিল ও সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার অভিনব উন্মেষে দেশ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধ ও জৈনদর্শন সে যুগেরই বিশিষ্ট ফল, "চরক" ও "সুশ্রুতের" চিকিৎসা-বিজ্ঞান, "বাৎস্যায়ণের" কামসূত্র, "নাগার্জ্জুনের" রসায়ণশাস্ত্র প্রভৃতি তেমনই এক গৌরবময় যুগেরই অভাবনীয় পরিকল্পনা—আর, "যাবদ্ জীবেৎ সুখং জীবেৎ" আদি চার্ব্বাক্-নীতিও সেইরূপ এক যুগের বিদ্রোহের বাণী।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, বেদমার্গ-বিরোধী বলিয়া কথিত দর্শন সমুদয় প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়, যথা—

১ম। লোকায়ত দর্শনগুলি, যেমন বৃহস্পতি, চার্ব্বাক্ প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত তথাকথিত নিরীশ্বর দর্শন সমূহ।

২য়। আর্হত্ বা জৈনদর্শনগুলি, যেমন জৈন যতি চতুর্বিংশ তীর্থঙ্করদিগের প্রবর্ত্তিত কঠোর বৈরাগ্য দর্শন-সমূহ।

৩য়। বৌদ্ধদর্শন বা ভগবান বুদ্ধের অহিংসা ধর্ম্মাবলম্বী মাধ্যমিক যোগাচার, সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক প্রভৃতি চারি শ্রেণীবদ্ধ ও বিভিন্ন সম্প্রদায় দ্বারা বিবৃত বৌদ্ধ দর্শনগুলি।

উক্ত দর্শনগুলির পরিচয় একে একে যথাসাধ্য সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল—যুগকর্ত্তাগণ আমাদের সহায় হউন।

"যুগকর্ত্তৃভ্যঃ নমঃ।"

লোকায়ত বা চার্ব্বাক্ দর্শন

লোকায়ত দর্শন প্রবর্ত্তকদিগকে সাধারণতঃ "লোকায়তিক" নামে অভিহিত করা হয়, কারণ অজ্ঞ লোক-সাধারণ পরলোক প্রভৃতি সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করে ইহাঁদেরও বুঝিবা ধারণা তদনুরূপ এই বিশ্বাসে। এই দর্শনে ইহলোকই সর্ব্বস্ব বলিয়া স্বীকৃত। বৃহস্পতি ও তাঁহার শিষ্য চার্ব্বাক্ প্রভৃতি তথাকথিত নিরীশ্বর-বাদী দর্শনকারেরা এই লোকায়তিক সম্প্রদায়ভুক্ত। লোকায়তিকেরা বহু সম্প্রদায়েও বিভক্ত ছিলেন। সাধারণতঃ প্রচলিত দর্শনোক্ত জ্ঞান-প্রামাণ্য তত্ত্বগুলি ইহাঁরা অগ্রাহ্য করিয়া দম্ভভরে নিজ নিজ মত স্থাপন করিয়াছিলেন, যথা—

"লোকায়তিক পক্ষে তু তত্ত্বং ভূত চতুষ্টয়ম্।
পৃথিব্যপস্তথা তেজো বায়ুরিত্যেব নাপরঃ॥
প্রত্যক্ষ্যগম্যমেবাস্তি নাস্ত্যদৃষ্টমদৃষ্টতঃ।
অদৃষ্টবাদিভিশ্চ নাদৃষ্টং দৃষ্টমুচ্যতে॥
ক্বাপি দৃষ্টমদৃষ্টং চেদ দৃষ্টং ব্রুবতে কথম্।
নিত্যাদৃষ্টং কথং সৎসাত্ শশশৃঙ্গাদিভিস্সমম্॥"

—"সর্ব্বসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ", লোকায়তিক
পক্ষ প্রকরণ, ১ম—৩য় সূত্র।

—অর্থাৎ, লোকায়তিকদিগের মতে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও বায়ু এই চতুর্ব্বিধ পদার্থ ব্যতিরেকে জগতে আর কিছুরই অস্তিত্ব বিদ্যমান নাই। তাঁহারা বলেন, প্রত্যক্ষ যাহা দৃষ্ট হয় তাহাই বিদ্যমান আছে এবং যাহা দৃষ্ট নয়,

দেখা যায় না বলিয়াই, তাহার কোন সত্ত্বা নাই ; কারণ অদৃষ্টবাদীরাও যাহা অদৃষ্ট তাহাকে দেখিয়াছেন এমন কথা বলেন না। বস্তুতঃ, যদি পরিদৃশ্যমান বস্তু সমূহকে দেখা যায় না বলিয়া গণ্য করা হয় তাহা হইলে সেগুলিকে কেমন করিয়া অদৃষ্ট বলা যাইতে পারে ?

লোকায়তিকেরা বলেন দুঃখ কিম্বা সুখ ভোগের কারণ অন্য আর কিছুই হইতে পারেনা—মানুষের স্বভাব (nature) সুখ-দুঃখ ভোগ করা, সেই জন্যই তাহারা সুখ-দুঃখ ভোগ করে। আর, এই স্বভাবের প্রভাবেই ময়ূরের অপরূপ রূপ এবং কোকিলের প্রাণ মাতান কুহুস্বর বিদ্যমান।

আত্মা সম্বন্ধে ইহাঁদের ধারণা খুবই অভিনব, ইহাঁরা বলেন—

"অহং স্থূলো কৃশোঽস্মীতি সামানাধিকরণ্যতঃ।
দেহঃ স্থৌল্যাদিযোগাচ্চ স এবাত্মা ন চাপরঃ॥"

—চার্ব্বাক্ দর্শন।

—এই স্থূল দেহই আত্মা ; দেহের এই বিশিষ্ট অবস্থার অন্য নাম আত্মা। এতদতিরিক্ত অন্য কোন আত্ম-বস্তু নাই। জড়ে চৈতন্য সঞ্চার তাঁহাদের মতে, "তাম্বুলপূগচূর্ণানাং যোগাৎ"—অর্থাৎ, তাম্বুলরাগ-রঞ্জিত রক্তাভাবের ন্যায়, তাঁহারা বলেন—

"অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্য্যনলানিলাঃ।
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে।
কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ॥"

—ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই চারি ভূতের সংযোগে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়—যেমন সুরাসমুৎপাদক দ্রব্যনিচয়ের মিলনে মাদকতা-শক্তির উদ্ভব হয়, ঠিক সেইরূপ। সুতরাং, তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করেন, মৃত্যুকালে যখন উক্ত চারিভূতের বিলোপ হইবে তখন চৈতন্যও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

চার্ব্বাক্ প্রত্যাক্ষাতিরিক্ত অন্য কোন প্রমাণ গ্রাহ্য করেন না। তাই, লোকায়তিকেরা স্বর্গ, নরক, মুক্তি প্রভৃতি কোন কিছুই বিশ্বাস করেন না; এ সকলই তাঁহারা বলেন সর্ব্বৈব মিথ্যা। তাঁহাদের মতে পরলোক বা জন্মান্তর বলিয়া কিছুই নাই; বস্তুত, তাঁহারা বলেন ইহলোক ভিন্ন অন্য কোন লোক নাই; স্বর্গ, শিবলোক প্রভৃতি সমস্তই মূঢ় ও প্রতারক ব্যক্তিদিগের কল্পনা মাত্র। তাঁহারা ইহাই প্রশ্ন করেন—

"যদি গচ্ছেৎ পরংলোকং দেহাদেষ বিনির্গতঃ।
কস্মাদ্ভূয়ো নচায়াতি বন্ধু স্নেহসমাকুলঃ॥"

—যদি দেহ হইতে বিনির্গত হইয়া কেহ পরলোকে প্রস্থান করে, তবে বন্ধুস্নেহে আকুল হইয়া আবার সে ফিরিয়া আসে না কেন?

স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধেও তাঁহাদের ধারণা অপরূপ। স্বর্গ-সুখ অর্থে তাঁহারা বোঝেন—

১ম। সুমিষ্ট পানাহার,

২য়। "দ্ব্যষ্ট বর্ষ বধূগমঃ",

৩য়। "সূক্ষ্মবস্ত্র সুগন্ধ স্রক্‌চন্দনাদিনিষেবণম্।"

আবার নরক যন্ত্রণার অর্থ তাঁহারা করেন—

১ম। শত্রুর অস্ত্রে আহত হওয়া,

২য়। ব্যাধিতে প্রপীড়িত হওয়া, ও

৩য়। অন্যান্য দুঃখ কষ্ট ভোগ করা—এবং

মোক্ষ অর্থে তাঁহারা মৃত্যুকেই বোঝেন। প্রাণবায়ু নির্গত হইলেই মোক্ষলাভ হইল, 'বেপরোয়া ভাবে' তাঁহারা ইহাই প্রচার করেন; তাই তাঁহারা বলেন—

"অতস্তদর্থং নায়াসং কর্ত্তু মর্হতি পণ্ডিতঃ।
তপোভিরুপবাসাদ্যৈর্মূঢ় এব প্রশুষ্যতি ॥"

—"সর্ব্বসিদ্ধান্ত সংগ্রহ।"

—যাঁহারা পণ্ডিত তাঁহাদের মোক্ষ-লাভের উদ্দেশ্যে কোন প্রকার কষ্ট স্বীকার করা উচিৎ নহে; তপ, জপ বা উপবাসে মূর্খ ব্যক্তিরই জীবন ক্ষয় হয়। আরও—

"মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেত্তৃপ্তি কারণম্।
গচ্ছতামিহ জন্তূনাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনম্ ॥
স্বর্গস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্র দানতঃ।
প্রাসাদস্যোপরিস্থানামত্র কস্মান্নদীয়তে ॥"

—বৃহস্পতিবচন।

—শ্রাদ্ধে উৎসর্গীকৃত ভক্ষ্য-বস্তুতে মৃত প্রাণিগণের যদি তৃপ্তি জন্মে, তবে পথিকদিগের পাথেয় বা আহারাদি সঙ্গে রাখিবার কিছুই ত প্রয়োজন নাই এবং যদি স্বর্গস্থিত লোক ভূতলস্থ ব্যক্তিদিগের অন্নব্যঞ্জনাদি দানে তৃপ্তি লাভ করে, তবে প্রাসাদের উপরে স্থিত ব্যক্তিদিগের তৃপ্তি হেতু ভূতলে অন্ন দেওয়া হয় না কেন? বস্তুতঃ, পিতৃশ্রাদ্ধাদি কেবল অলস ব্রাহ্মণদিগের উপজীবিকা মাত্র।

লোকায়তিকেরা আরও বলেন—

"ন স্বর্গো নাপবর্গোবা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ ॥
অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্ম্মিতা ॥"

—বৃহস্পতি উক্ত চার্ব্বাক্ বচন।

—স্বর্গ, অপবর্গ, পরলোকগামী আত্মা কিছুই নাই; বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তি নিচয়ের কোন ক্রিয়াই ফলদায়ী হয় না—দেবালয়, জলছত্র, পুষ্করিণী ও কূপ খনন, উদ্যান প্রভৃতির প্রতিষ্ঠান পান্থেরই প্রশংসা অর্জ্জন করে অন্য আর কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে না—স্বর্ণ ও ভূমি দান, নিমন্ত্রণ করিয়া ভূরিভোজন করান প্রভৃতি তথাকথিত পুণ্যকার্য্য নিঃস্ব এবং ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিদিগকেই পরিতৃপ্ত করিতে পারে এবং পাতিব্রত্য আদির বিধান, ধূর্ত্ত ও দুর্ব্বল লোকের দ্বারা আবিষ্কৃত। অগ্নিহোত্রদিগের ন্যায় বৈদিক ক্রিয়াকলাপ, বেদত্রয়—যাহা অপ্রামাণ্য, প্রত্যক্ষবিলোপী ও যুক্তিবিরুদ্ধ এবং সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় ত্রিদণ্ড ধারণ এবং ভস্মানুলেপন প্রভৃতি বুদ্ধি ও পৌরুষহীন অলস ব্যক্তিদিগের জন্য বিধাতৃবিহিত (ordained by nature) জীবিকা।

তথা কথিত নাস্তিক-মত-প্রবর্ত্তক লোকায়তদর্শন তাই নির্দ্দেশ দিলেন, ইহ-সংসারে কর্ত্তা কেহ নাই—স্বভাবানুসারে সমস্তই ঘটিতেছে এবং প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিরই ইহ-জগতে সুখ লাভ হেতু—"দৃষ্টৈরেব কৃষিগোরক্ষবাণিজ্য-দণ্ডনীতি আদি", ক্রিয়াসিদ্ধ (practical) যাহা কিছু, যেমন—

১। কৃষি — agriculture,

২। গোরক্ষা—tending of cattle,

৩। বাণিজ্য—trade & commerce,

৪। দণ্ডনীতি, অর্থাৎ—

(ক) অর্থনীতি—politics,

(খ) পৌরনীতি—civics,

(গ) রাজনীতি—adminstration and government.

ইত্যাদি কার্য্যেরই অনুষ্ঠান এবং অনুশীলন কারা বিধেয়।

এই যে স্বাধীন, স্বরাট, 'বেপরোয়া' জীবন—জাতীয়বাদ (nationalism) প্রতিষ্ঠানকল্পে তাহার উদ্বোধন করিয়া অতীব প্রাচীনকাল হইতে এই মতবাদ ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল। চার্ব্বাক্ তাই বজ্রগম্ভীর স্বরে, দম্ভ-ভরে, প্রচার করিলেন—

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ
ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য
পুনরাগমনং কুতঃ॥"

—ইহার অবশ্য ভাষ্য নিষ্প্রয়োজন। ইহাই ভারতের জড়বাদ (material culture), ইহাই লোকায়তদর্শন। বৃহস্পতিবাক্য সকলেরই সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোবিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

—একমাত্র শাস্ত্র অবলম্বন করিয়াই যথাকর্ত্তব্য নিরূপণ করা উচিৎ নহে, যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানি ঘটে।

"ব্রহ্মণে নমঃ।"

১ম। দ্রব্যানুযোগ—দ্রব্যানুযোগ, অর্থাৎ দ্রব্যের ব্যাখ্যা, দ্রব্যের ছয় ভেদ বর্ত্তমান, যথা—জীবাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায় ও কাল।

২য়। গণিতানুযোগ—গণিতানুযোগ, গণিতের ব্যাখ্যা। ইহলোকে অসংখ্য দ্বীপ ও সমুদ্রগুলির রীতি, গতি ও প্রমাণ প্রভৃতি বিস্তৃত-বিবরণ ইহাতে জানিতে পারা যায়।

৩য়। চরণকরণানুযোগ—ইহাতে চরিত্র (আচরণ) ধর্ম্মের অতীব সূক্ষ্ম ও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

৪র্থ। ধর্ম্মকথানুযোগ—ইহাতে ভূতপূর্ব্ব ও ভবিষ্যৎ মহাপুরুষদিগের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। সেগুলি পাঠ করিলে যে শিক্ষা লাভ হয় তাহাতে জীব অচিরেই উচ্চ-স্তরে উঠিতে পারে।

উক্ত অনুযোগগুলির বিস্তৃত-বিবরণ নিম্নলিখিত জৈন ধর্ম্মশাস্ত্র ও জৈন দর্শনগ্রন্থ সমূহে লিখিত আছে, যথা—"সম্মতিতর্ক", "রত্নাকরাবতারিকা", "তত্ত্বাধিগম-সূত্র", "প্রমাণ-মীমাংসা", "অনেকান্তজয়পতাকা", "সময়সার" "গোমট্সার" "বগৈরহগ্রন্থ," "আচারাঙ্গ," "সূত্রকৃতাঙ্গ", "সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তি", "চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি", "লোক-প্রকাশ," "অর্থ-প্রকাশ", "চেত্র-সমাস", "ত্রৈলোক্য-সারদীপিকা", "জ্ঞাতাধর্ম্ম কথা", "ত্রিষষ্টি শলাকা", "পুরুষ-চরিত্র", "দ্রব্য-সংগ্রহ", "পরীক্ষামুখম্" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

জৈন দার্শনিকেরা উক্ত অনুযোগগুলিতে সিদ্ধিলাভ উদ্দেশ্যে দুইটি পদার্থের অবতারণা করিয়াছেন—একটি 'প্রমাণ', আর একটি 'নয়'; কারণ এ দুইটি ব্যতিরেকে প্রমেয় বস্তুর বোধ হয়না—তাই তাঁহারা বলিতেছেন—

"প্রমাণ নয়ৈরধিগমঃ।"

—প্রমাণ সর্ব্বাংশের ও নয় একাংশের গ্রাহক ও প্রকাশক। নয় কি ? জৈন দর্শনকারেরা বলিতেছেন—

"নীয়তে যেন শ্রুতাখ্যপ্রমাণ বিষয়ী কৃতস্যর্থস্যাংশঃ
তদিতরাংশৌদাসীন্যতঃ স প্রতিপত্তুরভিপ্রায় বিশেষো নয়ঃ।"

—বক্তা যখন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা নির্ণীত অর্থের এক অংশ বা বহু অংশ গ্রহণ করিয়া বাকি অংশে উদাসীন থাকেন বা ঐ অর্থের ইতর ও বিশেষ উপেক্ষা করেন তখন তাঁহার মনের এই যে বিশেষরূপ অভিপ্রায় তাহাকে "নয়" বলে। অর্থের উক্তরূপ ইতর-বিশেষে বক্তা যখন উপেক্ষা না করেন, তখন তাহাকে 'নয়াভাস' বলে। 'নয়ের' সাতটি প্রকার-ভেদ আছে, যথা—

ইহাদের অর্থ যথাক্রমে বিবৃত হইল—

(১) দ্রব্য ও পদার্থ (বস্তু) এই উভয়ের সামান্য ও বিশেষ যোগ।

(২) বস্তুর সামান্যাত্মক যোগ।

(৩) বস্তুর বিশেষাত্মক যোগ।

(৪) অতীত ও অনাগত বস্তুকে উপেক্ষা করিয়া কার্য্যকর্ত্তা যখন বর্ত্তমান মানিয়া চলেন।

(৫) বহু পর্য্যায়ে (শব্দান্তরে) একটি মাত্র অর্থের গ্রাহক।

(৬) বস্তুর পর্য্যায়ভেদে অর্থের বিভেদ কারক।

(৭) স্বকীয় কার্য্য নিষ্পন্নকারক—"বস্তুই প্রকৃত বস্তুবাচক", এই মতের গ্রাহক।

পূর্ব্বোক্ত সাতটি নয় আবার 'দ্রব্যার্থিক' ও 'পর্য্যায়ার্থিক' এই উভয়-বিধ অর্থ-সমন্বয়ে সাধিত হয় এবং উহারা পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন হইলেও মিলিত হয় ও জৈনদর্শনের জটিলতম তত্ত্বের বিশ্লেষণে প্রভূত সাহায্য করে। 'নয়চক্রসার', 'স্যাদ্বাদ্রত্নাকর' প্রভৃতি গ্রন্থে নয়ের বিশেষ বর্ণন আছে।

প্রমাণ কি ? জৈনদার্শনিকগণ দর্শনতত্ত্বগুলির বিচার করিয়া চারিটি বিষয়ের দিক দিয়া অতীব সূক্ষ্মভাবে এই প্রমাণের পরীক্ষা করিয়াছেন— ১ম। প্রমাণের লক্ষণ, ২য়। প্রমাণের সংখ্যা, ৩য়। প্রমাণের বিষয়, ৪র্থ। প্রমাণের ফল। ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে বিবৃত হইল—

১ম। প্রমাণের লক্ষণ—জৈনমতে,

"স্বাপূর্ব্বার্থব্যবসায়াত্মকং জ্ঞানং প্রমাণম্।"

—"পরীক্ষামুখম্।"

—স্ব অর্থে আত্মা ও অপূর্ব্বার্থ অর্থে যিনি জানিতে চান তিনি যাহা অবগত নন—এই দুইটি বিষয়ের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই প্রমাণ পদবাচ্য। জৈন দার্শনিকেরা প্রমাণ-লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া তাই বলিয়াছেন, প্রমাণ— (ক) জ্ঞান-স্বরূপ (খ) নিশ্চয়াত্মক ও (গ) আত্মা ও আত্মার অতিরিক্ত বাহ্য-পদার্থসমূহের প্রকাশক। (ক) প্রমাণ জ্ঞান স্বরূপ কিসে ?

"হিতাহিত প্রাপ্তিপরিহার সমর্থং হি প্রমাণম্
ততো জ্ঞানমেবতৎ।"

—"পরীক্ষামুখম্।"

—ইষ্টলাভ করাইতে ও অনিষ্ট নিবারিত করিতে সমর্থ বলিয়া প্রমাণ জ্ঞান-স্বরূপ। জ্ঞানের দ্বারায়ই ইষ্ট লাভ হয় ও অহিত বা অনিষ্ট নিবারণ

করিতে পারা যায়। (খ) প্রমাণ নিশ্চয়াত্মক কেন? জৈন দার্শনিকেরা বলেন, প্রমাণ জ্ঞান-স্বরূপ হইলেও সকল জ্ঞানই প্রমাণ নহে।

"তন্নিশ্চয়াত্মকং স্মারোপবিরুদ্ধত্বাদনুমানবৎ"—"পরীক্ষামুখম্"।

প্রমাণ নিশ্চয়াত্মক-জ্ঞান, কারণ, অনুমানের ন্যায় ইহা সমারোপ বিরোধী। সমারোপ অর্থে মিথ্যাজ্ঞান বুঝায়। জ্ঞানের বিষয় অযথার্থরূপে জানার নাম সমারোপ। সমারোপ তিনটি—বিপর্য্যয়, সংশয় ও অনধ্যবসায়। বস্তুর একদেশ (aspect) বিচারের নাম বিপর্য্যয়; বস্তুর নানা প্রকার অংশ বা ভাব অনুসারে সাদৃশ হেতু যে সন্দেহ জন্মে তাহাই সংশয় এবং এক বস্তু-বিষয়ে আসক্তচিত্ত থাকার দরুণ অন্য বস্তু-বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞানের অভাবের নাম অনধ্যবসায়। জৈন মতে উক্ত প্রকৃত জ্ঞান, যাহা উল্লিখিত তিন প্রকার মিথ্যাজ্ঞানাত্মক সমারোপের বিরোধী তাহাই নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান, তাহাই প্রমাণ। (গ) প্রমাণই অর্থবোধক। প্রমাণের দ্বারাই অর্থবোধ ঘটে। আত্মার স্বরূপ এবং অনাত্মা, অর্থাৎ, আত্মা ও জ্ঞাতা হইতে পৃথক, "পর"—অর্থাৎ, জড় ও চেতন সমুদয় পদার্থ নিচয়ের প্রকৃত তত্ত্ব, প্রমাণের দ্বারায়ই জানিতে পারা যায়। তাই বলা হইয়াছে, আত্মা ও অনাত্মার অতিরিক্ত পদার্থ নিচয়ের প্রকাশকই প্রমাণ।

২য়। প্রমাণের সংখ্যা—জৈন দার্শনিকের মতে প্রমাণের সংখ্যা দুইটি, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, যথা—

"তদদ্বিভেদং প্রত্যক্ষং চ পরোক্ষং চ।"

—'প্রমাণনয়তত্ত্বালোকালঙ্কার', ২।১ সূত্র।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ-জ্ঞানের আবার প্রকার ভেদ বর্ত্তমান, যথা—প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা পদার্থের বৈশিষ্ট্য সকল সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়—ইহাও আবার সাংব্যবহারিক ও পারমার্থিক ভেদে দ্বিবিধ। সাংব্যব-

হারিক জ্ঞান দুই প্রকার—একটি ইন্দ্রিয় নিমিত্তক— অর্থাৎ, ইন্দ্রিয় ও মনের সাহচর্য্যে জাত এবং স্পর্শ, রসন, ঘ্রাণ, চক্ষু ও শ্রোত্র এই পঞ্চেন্দ্রিয়-ভেদে পাঁচটি; অপরটি মনোনিমিত্তক বা অনিন্দ্রিয় (মন) অর্থাৎ মন হইতে উৎপন্ন সুখ এবং দুঃখাদির জ্ঞান। পারমার্থিক জ্ঞান, বিকল ও সকল ভেদে দ্বিবিধ—বিকল জ্ঞান একদেশ প্রত্যক্ষ ও অসম্পূর্ণ পদার্থের পরিচ্ছেদক এবং অবধি ও মনঃপর্য্যয় ভেদে দুই প্রকার, অবধি[1] স্থূল

১। অবধি—অর্থাৎ, অবধ-জ্ঞানও আবার দেশাবধি, পরমাবধি ও সর্ব্বাবধি ভেদে ত্রিবিধ; দেশাবধিরও ছয়টি প্রকার-ভেদ বর্ত্তমান এবং প্রত্যেক প্রকার-ভেদেরও কতিপয় বিভাগ আছে—বাহুল্য ভয়ে সে সমুদয় অতীব সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইল, যথা—
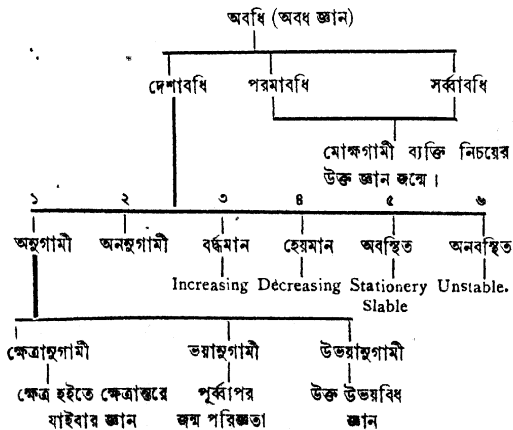
ইন্দ্রিয়ের অনধিগম্য পদার্থ-তত্ত্ব হইতে প্রত্যক্ষ হয়—যেমন, পৃথিবী, জল, অগ্নি, পবন, অন্ধকার, ছায়া প্রভৃতি এবং মনঃপর্য্যায় পরচিত্তের ব্যাপার হইতে উপলব্ধি করিতে পারা যায়—ইহাও আবার ঋজুমতি (not lasting) ও বিপুলমতি (lasting) ভেদে দ্বিবিধ ; সকল-জ্ঞান, অর্থাৎ কেবল-জ্ঞান বা সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বদেশ প্রত্যক্ষ এবং ইহার দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকলই প্রত্যক্ষ হয়।

পরোক্ষ-জ্ঞান, প্রত্যক্ষ-জ্ঞান অপেক্ষা অস্পষ্ট এবং স্মরণ, প্রত্যভিজ্ঞান, তর্ক বা উহ্, অনুমান ও আগম ভেদে পাঁচ প্রকার। ইহার মধ্যে প্রত্যভিজ্ঞান অনুভব ও স্মৃতির সাহায্যে উৎপন্ন এবং সংকলমাত্মক-জ্ঞান, অর্থাৎ জাতি ও সামান্যের জ্ঞান তির্য্যক্-সামান্য ও উর্দ্ধতা-সামান্য ভেদে দ্বিবিধ ; আগম-জ্ঞান অর্থে শব্দ ও আপ্তবাক্য বা অর্হত্ বাক্যময় জৈনবেদ বুঝায়—ইহাকে মৎসুৎ-জ্ঞান[১] বা শাস্ত্রজ্ঞানও বলে।

৩। প্রমাণের বিষয়—জৈন দর্শন মতে বস্তু সকল সামান্য ও বিশেষ এই উভয় ভাবাত্মক, যথা—"তস্য বিষয়ঃ সামান্যবিশেষাদ্যনেকান্তত্মকং বস্তু।"—সামান্য ও বিশেষাদি অনেকান্ত বস্তুই প্রমাণের বিষয়। বস্তুর ভাবকে 'অন্ত' বলে—বস্তু সকল অনেক ভাবের আশ্রয়, এজন্য বস্তু অনেকান্ত ; সামান্য বিশেষাদি অনেকান্ত বস্তুবাদকে 'অনেকান্তবাদ' বলে। জৈন দার্শনিকেরা বলেন, বস্তুর সামান্য ও বিশেষ ভাব উভয়ই সত্য—ইহাই প্রমাণের বিষয়।

৪। প্রমাণের ফল—প্রমাণের দ্বারা যাহা কিছু সংসিদ্ধ হয় তাহাই প্রমাণ-ফল—"যৎ প্রমাণেন প্রসাধ্যতে তদস্য ফলম্।"

প্রমাণ ফলের দুই রূপ, একটি ইহার 'অনন্তর-ফল', আর একটি ইহার

---

(১) মৎসুৎ-জ্ঞান বা শাস্ত্র-জ্ঞান ইন্দ্রিয় ও মন হইতে উৎপন্ন।

'পরম্পরা-ফল' ; অজ্ঞান-নিবৃত্তি সকল প্রকার প্রমাণেরই অনন্তর-ফল, এবং মহান পুরুষের পরম-পদ প্রাপ্তি-হেতু সকল বিষয়ে ঔদাসীন্য কেবল-জ্ঞানের পরম্পরা-ফল। স্পৃহনীয় পদার্থ লাভ ও অপ্রিয় পদার্থ পরিহার করিবার ইচ্ছা, অন্যান্য বিষয়ে উপেক্ষা-বুদ্ধি অপরাপর প্রমাণ-জ্ঞানের পরম্পরা-ফল।

জৈন বা অর্হত্ দর্শনের আর কয়েকটি মাত্র মূল-তত্ত্বের বিবৃতির অবতারণা করিয়া জৈন দর্শনের বক্ষ্যমাণ সারসঙ্কলন সংক্ষেপে সমাপ্ত হইল।

অর্হত্‌গণ পরমাণুবাদ স্বীকার করেন, তাঁহারা বলেন—পরম-অণু অবিভাগপরিচ্ছেদ। তাহার দুইটি রূপ, চৈতন্য ও জড় ; চৈতন্যের পরমাণু আত্মা ও জড়ের পরমাণু পুদ্গল, যথা—

"পরমাণুভিরাবদ্ধাঃ সর্ব্বদেহা সহেন্দ্রিয়ৈঃ।"

—'সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ।'

—সকল দেহ (ইন্দ্রিয়যুক্ত) পরমাণু দ্বারা গঠিত। এই পরম-অণুকে তাঁহারা "পুদ্গল" ও "আত্মা" এই উভয়বিধ সংজ্ঞা দিয়াছেন এবং তাঁহারা বলেন ইহার পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে ধর্ম্মাধর্ম্মের উপর।

দেহ ও তাহার আবরণ সম্বন্ধে অর্হত্-গণ বলেন—আত্মার সহিত পুদ্গলেরও পরমাণুর যে যোগ তাহাই কর্ম্ম। কর্ম্মই আত্মার আবরণ এবং কর্ম্মের আবরণ দেহ ; কাজেই, দেহই যখন কর্ম্মের আবরণ, আর কিছুই—কোন প্রকার বস্ত্রাদি আবার সেই দেহের আবরণ হইতে পারে না। অপিচ, যদি বস্ত্রাদি দেহের আবরণ হিসাবে ধরা যায়, তাহা হইলে বস্ত্রাদিরও আবার অন্য আবরণ আছে ধরিয়া লইতে হইবে—আর এবম্প্রকারে অবশেষে আবরণের শেষ কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এই অবস্থাই ন্যায়দর্শনের "হেত্বাভাস" (fallacy)—পাশ্চাত্ত্য দর্শনে

ইহাকে বলে, "the logical fallacy of a regressus in infinitum." জৈনেরা তাই বলেন, সর্ব্বদা উলঙ্গ থাক, আত্মার তত্ত্ব লইতে ব্যস্ত থাক—দেহের জন্য বা দেহ লইয়া অহেতুক সময়ক্ষেপ করিও না; দেহের জন্য স্বেচ্ছায় গাত্র-মার্জ্জন, প্রসাধন, স্নান প্রভৃতি কোন উপকরণই করিবে না।

অর্হত্গণ আত্মার মুক্তি অর্থে পূর্ণ-জ্ঞান এবং বন্ধন অর্থে কর্ম্মজদেহের নিখিল-বস্তু-বিষয়ে প্রকৃষ্ট-জ্ঞানের অভাবকেই বোঝেন। তাই 'সর্ব্ব-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ' গ্রন্থে আমরা পাই, অর্হত্গণের মতে আদর্শ জগৎগুরু তিনিই, যিনি—

"প্রাণিজাতমহিংসন্তো মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ।
দিগম্বরাশ্চরন্ত্যেব যোগিনো ব্রহ্মচারিণঃ॥
মুনয়ো নির্ম্মলাশুদ্ধা প্রণতাঘৌধভেদিনঃ[1]।
তদীয় মন্ত্রফলদো মোক্ষমার্গ ব্যবস্থিতঃ।
সর্ব্বৈবিশ্বাসনীয়ঃ স্যাম্ স সর্ব্বজ্ঞো জগদ্গুরু॥"

"অর্হতাম্ নমঃ।"

১। প্রণতাঘৌধভেদিনঃ, প্রণত ব্যক্তিদিগের পাপ ধৌত করেন যাঁহারা—Those who bow unto them, these omniscient spiritual teachers, destroy their sins.

বৌদ্ধ দর্শন

বৌদ্ধদর্শনের প্রবর্ত্তক ভগবান্‌ বুদ্ধ স্বয়ং, তাই তাঁহার দর্শন আদর্শ-স্থানীয়। "অতীব শান্তিময় পরমেষ্টীদেব বুদ্ধ-বিগ্রহ পরিগ্রহ করিলে চরাচর অখিল জগৎ মোহিত হয়।" ভগবান বুদ্ধ বিষ্ণুর নবম অবতার। "কারুণ্য মাতম্বতে"—জীবের দুঃখে বিগলিত হইয়া, তাহা নিরাকরণ উদ্দেশ্যে—

"কেশব ধৃত-বুদ্ধ-শরীর।"

—শ্রীভগবান বুদ্ধ-শরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধদর্শন নাস্তিক দর্শন, বৌদ্ধদর্শন বেদ-নিন্দায় পূর্ণ, বৌদ্ধদর্শন শূণ্য-বাদী, বৌদ্ধদর্শনে ভক্তি বা ভক্তিপাত্রের একান্ত অভাব প্রভৃতি অনেক অভিযোগই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিশেষ ধীর-ভাবে গৌতম বুদ্ধের প্রকৃত ধর্ম্ম ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত দর্শন-শাস্ত্র আলোচনা করিলে বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, এতগুলি যে অভিযোগ তাহার মূলে সত্যের লেশমাত্র নাই। বৌদ্ধদর্শনের বিকৃত বা একদেশ দর্শনই উক্তরূপ অভিযোগকারী পণ্ডিত-মণ্ডলীর ভ্রম-প্রমাদ, তথা, বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রধানতম কারণ। বস্তুতঃ, বৌদ্ধদর্শন অতীব উচ্চ-স্তরের আর্য্যদর্শন সমূহের মধ্যে অন্ততম। 'বিনয় পিটক' পাঠে যে বৌদ্ধাচার বা বিনয়ের বিষয় অবগত হইতে পারা যায় তাহা বেদপন্থী দিগের ধর্ম্মাচার ভিন্ন নূতন কিছুই নয়—সকল গুলিই দেখিতে পাওয়া যায় আর্য্য-আচার অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে—বুদ্ধদেব প্রোক্ত যাবতীয় ভিক্ষুধর্ম্মের নিয়মাদি, যাহা 'প্রাতিমোক্ষ' নামক গ্রন্থে বিবৃত ও সংগৃহীত, তৎসমুদয় মুখ্যতঃ বৈদিক আশ্রম-ধর্ম্মের অনুকরণেই বিহিত এবং উপদিষ্ট।

—সকল বিরোধের মধ্যে ঐক্য ও সমস্ত পার্থক্যের মধ্যে মিলন ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ-ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শির নত করিয়া তাই সতঃই বলিতে ইচ্ছা করে—

"তোমার অমিত আভা রেখেছ উজ্জল করি
স্বর্ণপ্রসূ এ ভারতভূমি।
ধন্য শাক্য অবতার!
প্রণমি তোমার পদে—
পূর্ণ ব্রহ্ম তুমি ॥"

বৌদ্ধদর্শন বলেন—জগৎ ক্ষণভঙ্গুর. দেবতা সুগত। প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দ্বিবিধ প্রমাণ। দুঃখ, আয়তন, সমুদায় ও মার্গ এই চতুর্ব্বিধ তত্ত্ব। মার্গ-তত্ত্বই মোক্ষ এবং বাহ্য-বস্তু মাত্রই অলীক—মিথ্যা; শুধু বিজ্ঞানরূপ আত্মাই সত্য।

জগতের সকল বস্তুই ক্ষণিক—অর্থাৎ, প্রথম ক্ষণে তাহাদের উৎপত্তি হয় ও পরক্ষণে সে সকলই বিনষ্ট হয় এবং এ পর্য্যায়ে আত্মাও ক্ষণিক জ্ঞানরূপ। আত্মার প্রকৃতরূপ কিন্তু বিজ্ঞানময়; ইহা নিত্য, অবিনাশী ও সত্যস্বরূপ। বৌদ্ধ দর্শন আরও বলেন, যতি ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, তাহার অঙ্গ সাতটি, যথা—চর্ম্মাসন, কমণ্ডলু, মণ্ডন, চীরধারণ, পূর্ব্বাহ্ণ ভোজন, সমূহাবস্থান ও রক্তবস্ত্র পরিধান।

বৌদ্ধদর্শনের মূল কথা হইতেছে—

"দুক্খং দুকখম্ সমুপ্পাদং
দুক্খমন্ চ অতিক্কমং,
আরিয়ঞ্চট্ঠাঠাঙ্গিকমাগ্‌গং
দুক্খুপসমগামিনং।"

—ভগবান বুদ্ধ বলিলেন, (১) দুঃখ আছে, (২) দুঃখের কারণ আছে, (৩) দুঃখের ধ্বংস আছে এবং (৪) দুঃখ ধ্বংসের উপায়ও আছে—দুঃখ, দুঃখ সকল, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায় স্বরূপ—আর্য্য অষ্টাঙ্গিক-মার্গ The Noble Eight-foeld path—অর্থাৎ, এই চতুরার্য্যসত্যের সম্যক-জ্ঞানই বুদ্ধ-প্রোক্ত দর্শন-সিদ্ধান্ত। এক কথায়, দুঃখ-নিরোধের উপায়ই আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ ; দুঃখকে যেমন করিয়া হউক নির্ম্মূল করিতে হইবে, ইহাই বৌদ্ধদর্শনের গোড়ার কথা। কেমন করিয়া দুঃখ বিনষ্ট হইবে? বুদ্ধদেব বলিলেন—

"যথাহি মূলে অনুপদ্দবে দল্হে
ছিন্নোপি রুক্খো পুনদেব রুহতি,
এবম্পিতহ্নানুসয়ে অনূহতে
নিব্বত্ততি দুক্খমিদং পুনপ্‌ পুনন্তি॥"

—মূল উৎপাটন না করিলে ছিন্নরুহ যেমন পুনঃ বর্দ্ধিত হয় তৃষ্ণানুসয় বিনষ্ট না হইলে দুঃখও তেমনই পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়। দুঃখকে বিনষ্ট করিতে হইলে তৃষ্ণানুসয় বিনষ্ট করিতে হইবে। তৃষ্ণানুসয় কেমন করিয়া বিনষ্ট হয়? ভগবান বুদ্ধ অনুশাসন দিলেন—

১। "সর্ব্বপপসস্‌ অকরণম্‌"—সর্ব্বপাপের অকরণ, অর্থাৎ—"শীল",
২। "কুসলসস্‌ উপসম্পদা"—কুশল সম্পাদন, অর্থাৎ—"সমাধি",
৩। "সচিত্ত পরিযোদপনং"—নিজ চিত্ত পরিশুদ্ধ-করণ, অর্থাৎ —"প্রজ্ঞা"

—"এতং বুদ্ধানুসাসন"—ইহাই বুদ্ধের অনুশাসন।

প্রথমে চিত্ত পরিশুদ্ধ করিতে হইবে। মন শুদ্ধ না হইলে সকলই 'ভস্মে ঘি ঢালার' মত হইবে। তাই বুদ্ধদেব বলিতেছেন—

"মনোপূব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া।
মনসা চ পদুট্‌ঠেন ভাসতি বা করোতি বা।
ততো নং দুক্‌খমন্বেতি চক্কং ব বহতো পদং॥১॥"—"ধর্ম্মপদ।"

—মনই ধর্ম্মসমূহের পূর্ব্বগামী, মনই ধর্ম্মসমূহের শ্রেষ্ঠ এবং ধর্ম্ম মন হইতেই উৎপন্ন। যদি কেহ দুষিতান্তঃকরণে কথা কহে বা কার্য্য করে, তবে চক্র যেমন ভারবাহী বলীবর্দ্দের পদচিহ্ন অনুসরণ করে, দুঃখও তাহাকে সেইরূপ অনুসরণ করে। চিত্ত, মন ও বিজ্ঞান, এ তিনটি একার্থ-বোধক—ইহাই বুদ্ধদেবের উপদেশ।

আর্য্য অষ্টাঙ্গিকমার্গ তিনটি স্কন্ধে বিভক্ত, যথা—

প্রথম স্কন্ধ—প্রজ্ঞা, ইহাই অবিদ্যা বিনাশকারী; 'অভিধর্ম্মে' ইহা সাত খণ্ডে সংগৃহীত।

দ্বিতীয় স্কন্ধ—শীল, ইহাই স্বভাব, সংযম ও বিধিনিষেধ; 'বিনয়ে'[1] ইহা তিন খণ্ডে সংগৃহীত।

তৃতীয় স্কন্ধ—সমাধি অর্থাৎ ধ্যান, সমাধি, ধারণাদি দ্বারা চিত্তকে সংস্কৃত করিতে হইবে কিরূপে তদ্বিষয়ক; 'সূত্রে' ইহা পাঁচ খণ্ডে সংগৃহীত।

(ক) প্রজ্ঞার অন্তর্গত দুইটি—সম্যক-দৃষ্টি ও সম্যক-সঙ্কল্প। চারিটি আর্য্য-সত্যের জ্ঞানই সম্যক দৃষ্টি, ইহা অস্তি-নাস্তির অতীত—ইহাই মাধ্যমিক দর্শন। নৈষ্ক্রাম্য, অহিংসা ও অব্যাপাদ ভেদে সম্যক সঙ্কল্প ত্রিবিধ।

১। বি=বিবিধ ও বিশেষ এবং নয়=নীতি, ইতি 'বিনয়' (discipline)।

(খ) শীলের অন্তর্গত তিনটি—সম্যক-বাক্য, সম্যক-কর্ম্মান্ত ও সম্যক-জীবিকা। সম্যক বাক্য অর্থে সত্য-বাক্য বুঝায়, মিথ্যাবাক্য[১] ইহারই বিপরীত অর্থ-জ্ঞাপক। সম্যক-কর্ম্মান্ত মিথ্যা-কর্ম্মের[২] বিপরীতার্থক। সম্যক-জীবিকা বা বাণিজ্য মিথ্যা-জীবিকার[৩] বিপরীতার্থজ্ঞাপক। জীবিকা বিশুদ্ধির নাম সম্যক-অজীব।

(গ) সমাধির অন্তর্গত তিনটি—সম্যক-ব্যায়াম[৪], অর্থাৎ দৃঢ় উৎসাহ; সম্যক-স্মৃতি[৫], ইহা যোগাভ্যাসের অঙ্গ নাম এবং সম্যক-সমাধি অর্থাৎ

১। মিথ্যা-বাক্য চতুর্ব্বিধ, যথা—১ম। মিথ্যা-বাক্য অর্থাৎ সত্য গোপ[illegible] মিথ্যা রচনা; ২য়। পিশুনবাক্য অর্থাৎ মিথ্যা 'লাগান'; ৩য়। পৌরুষ-বাক্য অ[illegible] কর্কশ কথা; ৪র্থ। বৃথা গল্প অর্থাৎ সম্প্রলাপ, 'আবাঢ়ে গল্প' ইত্যাদি।

২। মিথ্যাকর্ম্ম ত্রিবিধ, যথা—১ম। প্রাণীহত্যা; ২য়। পরস্বাপহরণ; ৩য়। মি[illegible]র্থাৎ কামাচরণ। এগুলির বিপরীত কার্য্যই সম্যক-কর্ম্ম, যথা—দয়া, ভিক্ষা ও ব্রহ্মচর্য

৩। মিথ্যা-জীবিকা দশবিধ, যথা—মৎস্য, মাংস, প্রাণি, অস্ত্র ও বিষ এই পাঁচ প্রকার ব্যবসায়; চিকিৎসা-বিদ্যা, বাস্তু-বিদ্যা অর্থাৎ পৌরহিত্য, মূষিক-বিদ্যা অর্থাৎ নষ্টকারী বিদ্যা ও জ্যোতিষবিদ্যা এই চারি প্রকার বিদ্যা সম্বন্ধীয় ব্যবসায় এবং উৎকোচ ইত্যাদি গ্রহণ।

৪। সম্যক-ব্যায়াম চারি প্রকার, যথা—১ম। উৎপন্ন পাপের বিনাশ; ২য়। অনুৎপন্ন-পাপের অনুৎপাদন বা উৎপত্তি নিবারণ; ৩য়। উৎপন্ন-পুণ্যের (কুশল) সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধন; ৪র্থ। অনুৎপন্ন-পুণ্যের উৎপাদনের জন্য অধ্যবসায়ী হওয়া।

৫। সম্যক-স্মৃতি চারিটি ভাগে বিভক্ত, যথা—১ম। কায়-দর্শন, অর্থাৎ আসন ইত্যাদি। ২য়। বেদনাদর্শন, অর্থাৎ দুঃখ ইত্যাদি। ৩য়। চিত্তদর্শন, অর্থাৎ আশক্তি ইত্যাদি। ৪র্থ। ধর্ম্মদর্শন। ধর্ম্মদর্শন জ্ঞানাত্মক—কামেচ্ছা, দ্বেষ, আলস্য, জড়তা, ঔদ্ধত্য, কুকৃত্য (কুকাজ করিবার ইচ্ছা) এবং সংশয় এই সপ্ত-বিধ অভিধর্ম্ম-বিরুদ্ধ চিত্ত-মল বর্ত্তমান আছে কিনা, উৎপন্ন হইল, কি উৎপন্ন না হইল, এই সকলের জ্ঞান।

ধ্যান, ইহার অঙ্গ পাঁচটি, যথা—বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ ও একাগ্রতা।

গৌতম বুদ্ধ নিজে কোন গ্রন্থই রচনা করেন নাই। বেদ যেমন ঋষিদিগের বাক্যে পরিস্ফুট, অর্থাৎ শ্রুতির ন্যায়, বুদ্ধদেবের বাক্যও মুখে মুখে রক্ষিত হইয়াছিল। যথা "ধর্ম্মপদের সুখবগ্‌গে" আমরা পাই বুদ্ধ ভগবানের মুখ-নিঃসৃত বাণী—

"আরোগ্য পরমা লাভা সন্তুট্‌ঠি পরমং ধনং।
বিস্‌সাস পরমা ঞাতী নিব্বাণং পরমং সুখং॥"
—ধর্ম্মপদ, সুখবগ্‌গো, ৮ম সূত্র।

—রোগশূন্যতা বা স্বাস্থ্যই পরম লাভ,
সন্তুষ্টি বা সন্তোষই পরম ধন,
বিশ্বাসই পরম জ্ঞাতি (উত্তম আত্মীয়),
নির্ব্বাণই পরম সুখ—ইত্যাদি—

আবার উক্ত কারণেই যুগভেদে ও দেশভেদে বৌদ্ধ দর্শনের ব্যাখ্যা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ন্যায় নানাজাতিয় লোকের মধ্যে বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ লাভের পর নানাপ্রকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। এই সকল বিভিন্ন দেশবাসী বৌদ্ধমতাবলম্বী শ্রমণদিগের মধ্যে কাহার যে প্রকৃত 'বুদ্ধমত'—যে মত স্বয়ংই বুদ্ধদেব প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা নিরুপণ করা অতীব কঠিন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে গৌতম বুদ্ধর কোন গ্রন্থই রচনা করেন নাই, এবং এমনও কিছু আজ পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত হয় নাই যে কোন একটি গ্রন্থ বিশেষই বুদ্ধদর্শনের আদি গ্রন্থ—তবে যতটা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে

বৌদ্ধশাস্ত্র নিচয়ের মধ্যে "পালিপিটকই"[১] সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। পালি-পিটক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা সুত্ত (সূত্র বা সূত্রান্ত), বিনয় ও অভিধর্ম্ম (অভিধর্ম্ম দার্শনিক চিন্তার অনুকূল ধর্ম্মবিষয়ক তত্ত্ব); ইহা সাধারণ ভাবে ত্রিপিঠক নামেও পরিচিত। অত্থকথা (অর্থকথা), বুদ্ধঘোষ প্রণীত জ্ঞানোদয়, অর্থকথার অনুবাদ প্রভৃতি উক্ত ত্রিপিটকের কয়েকটি ব্যাখ্যা পুস্তকও পাওয়া যায়। পালিপিটকে যে সকল উক্তি আছে তাহাই ভগবান গৌতম বুদ্ধের নিজের উক্তি, বৌদ্ধদার্শনিকগণ ইহাই মনে করেন। এই প্রাচীন ও মৌলিক গ্রন্থে উল্লেখ আছে বুদ্ধ বোধিবৃক্ষতলে বসিয়া সম্বুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে দুঃখ, দুঃখ সকল, ও দুঃখ নিরোধ বা নিরাকরণের উপায়গুলিও অনুভব করিয়াছিলেন এবং এ সম্বন্ধে, তাহার উক্তি জগতে প্রচার করিয়া মানবকল্যাণ-কামনায় তাহার প্রবর্ত্তিত 'মধ্যপথ'[২] প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধদেব এইরূপে নিজ উক্তিতে সংসার উৎপত্তির হেতু, জগতের সমুদায় কার্য্যকারণভাব বিষদ-ভাবে বর্ণন করিয়াছেন, যথা—

১। পালি ভাষায় লিখিত পিটক, অর্থাৎ পেটি বা ঝাঁপি, আধার ও আধেয়ের অভেদে ব্যবহৃত।

২। 'মধ্যপথ' বা মাধ্যমিক দর্শনই সর্ব্বপ্রথমে উদ্ভাবিত। কালে বৌদ্ধধর্ম্ম আরও তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিল, যথা—যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। মাধ্যমিক দর্শন মতে জগৎ শূন্যতার বিবর্ত্ত-বিশেষ এবং তাহার শেষ পরিণাম শূন্যতা বা মহাশূন্য। এই অবাঙ্-মানস-গোচর মহাশূন্যের ধ্যান করিতে করিতেই নির্ব্বাণ লাভ ঘটে; কেন না, উক্তরূপ চিন্তার ফলেই জীবাত্মা মহান-দুঃখ-স্কন্ধ—শোক, তাপ, জরা, মরণ ইত্যাদি হইতে পরিত্রাণ লাভ করে ও মহাশূন্যরূপ আদি কারণে নিমগ্ন হইয়া যায়।

ভগবান বুদ্ধদেব অনুভূত দুঃখের হেতুবাদ

(The Chain of Causation.)

পূর্ব্বজন্ম

১ম—অবিদ্যা (অর্থাৎ, অজ্ঞান — Predisposition, Ignorance)

উৎপত্তি | নিরোধ চ | নির্বাণ

বর্ত্তমান জীবন

২য়—সংস্কার সকল (কর্ম্ম)

৩য়—বিজ্ঞান (আত্মবোধ)

৪র্থ—নামরূপ (অর্থাৎ, মন ও শরীর)

৫ম—ষড়ায়তন (পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের আয়তন, অর্থাৎ, কার্য্যক্ষেত্র)
= জড়জগৎ এবং মনের আয়তন
= ভাবজগৎ

৬ষ্ঠ — স্পর্শ

৭ম— বেদনা (অর্থাৎ, বাহ্য পদার্থের উপলব্ধি)

৮ম — তৃষ্ণা (কাম, ভব ও বিভব ভেদে ত্রিবিধ)

৯ম—উপাদান (অর্থাৎ, আসক্তি)

১০ম — ভব (অর্থাৎ, হওয়া)

১১শ— জাতি (জন্ম)

পরজন্ম

১২শ— জরা মরণ শোক পরিদেব দুঃখ বিষাদ নৈরাশ্য

(এগুলিই মহান-দুঃখস্কন্ধ বা দুঃখ-সকল)

(এগুলি পরস্পর কার্য্য-কারণ সূত্রবদ্ধ, একটী হইতে পরবর্তীর উৎপত্তি ও একের নিরোধে পরবর্তীর নিরোধ হয়)

উক্ত দ্বাদশটি তথ্যের নাম 'প্রতীত্য সমুৎপাদ'[১] বা মহানিদান এবং "পালিপিটক" গ্রন্থে ইহার যে ব্যাখ্যা আছে তাহাই প্রাচীনতম। উক্ত মহান-দুঃখস্কন্ধের বা দুঃখ-সকলের নিরোধেই নির্ব্বাণ প্রাপ্তি ঘটে। নিরোধ কি? বুদ্ধদেব বলিতেছেন—

"যং কিঞ্চি সমুদয় ধম্মং সব্বন্তং নিরোধ ধম্মং।"

—যাহা কিছু উৎপন্ন ধর্ম্ম, সে সকল ধর্ম্মের ধ্বংসও আছে—দুঃখ উৎপন্ন ধর্ম্ম, সুতরাং তাহার ধ্বংসও আছে—ধ্বংসকে নিরোধ বলে।

নির্ব্বাণ কি? দুঃখের একান্ত অভাবই নির্ব্বাণ। ভগবান বুদ্ধ বলিতেছেন—কামাদিতৃষ্ণার[২], দ্বেষের ও মোহের উচ্ছেদই নির্ব্বাণ—i. e. The Non-existence of Individuality—It is not the extinction of the Self but of the clinging to existence- It may be attained during life. মহাস্থবির নাগসেন বলিতেছেন—নির্ব্বাণই একান্ত সুখ, ইহা দুঃখহীন ক্লেশহীন,—যাহা কিছু দুঃখ, যাহা কিছু ক্লেশ, তাহা সাধনার পথে, অনুশীলনের পথে।

পরমার্থতঃ নির্ব্বাণকেই দুঃখ নিরোধ আর্য্য-সত্য বলে, কারণ নির্ব্বাণে পৌঁছিলে তৃষ্ণার একান্ত নিরোধ হয় দুঃখ আর কিছুই থাকে না। নির্ব্বাণ লাভ করিলে বৌদ্ধ ভিক্ষুকের কি অবস্থা হয়? 'রতন সুত্তে' আছে—

"খীণং পুরাণং নবং নত্থি সম্ভবং,
বিরত্তাচিত্তা আয়তিকে ভবস্মিং।

১। প্রতীত্য অর্থে প্রাপ্তি ও সমুৎপাদ অর্থে উৎপত্তি—কারণাধীনে ভাবনিচয়ের উৎপত্তি—Dependent originality.

২। রূপাদি পঞ্চ কাম্য বস্তুর জন্য কামতৃষ্ণা, শাশ্বত দৃষ্টি জনিত ভব-তৃষ্ণা ও প্রভেদ জনিত বিভব-তৃষ্ণা।

তে খীনবীজা, অবিরূলিহি চ্ছন্দা
নিব্বন্তি ধীরা যথা'য়ং পদীপো ॥"

—১৪শ 'রতন সুত্ত।'

—তাঁহাদের প্রাচীন সংস্কার সমূহ বিনষ্ট হয়, নূতন সংস্কারের আর উৎপত্তি হয় না ; পুনর্জন্মে তাঁহাদের রতি থাকেনা, তাঁহারা ক্ষীণবীজ ও বিহত-ছন্দ হন—প্রদীপ যেমন নিভিয়া যায়, সেইরূপ তাঁহারা দেহত্যাগ করিয়া অনুবাদিশেষ নির্ব্বাণ-ধাতুতে বিলীন হয়।

তাই ভগবান বুদ্ধ বলিতেছেন—

"সিঞ্চ ভিক্‌খু ইমং নাবং
সিত্তা তে লহু মেস্‌সতি,
ছেত্বা রাগঞ্চ দোষঞ্চ
ততো নিব্বাণমেহিসি ॥"

—'ভিক্‌খুবগ্‌গ' ১০ম সূত্র।

—"হে ভিক্ষু ! এ দেহতরী করহ সেচন
পাপবারি ভারাক্রান্ত যাহা অনুক্ষণ
সেচন করিলে সেই সলিলের রাশি
লঘু হ'য়ে দেহতরী উঠিবেক ভাসি,
রাগদ্বেষাদির শেষে করিয়া ছেদন
চরমে লভিবে তুমি নির্ব্বাণ পরম।"

"নমো তস্‌স্ ভগবতো অর্হতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স।"

মানবত দর্শন

বা

ভারতীয় ভাব-দর্শন

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য 'আত্মদর্শন' লাভ করিয়া তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া স্তোত্র রচনা করিলেন—

"ন সাংখ্যং ন শৈবং ন তৎ পঞ্চরাত্রম্,
ন জৈনং মীমাংসকাদের্ম্মতং বা।
বিশিষ্টানুভূত্যা বিশুদ্ধাত্মকত্বাৎ,
তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্ ॥"

—আমাকে (পরম-আত্মাকে) সাংখ্য, শৈব, পঞ্চারাত্রাদিযোগ[১] কিম্বা জৈন, মীমাংসা প্রভৃতি কোনই দার্শনিক মতবাদ-মাত্র আশ্রয় করিয়া নিরূপন করা যায় না—কেবলমাত্র বিশেষরূপ অনুভব দ্বারাই আমার বিশুদ্ধাত্মকত্ব (মানব মনে) প্রতীয়মান হয় এবং মহা-প্রলয়েরও পরে একা আমিই অবশিষ্ট থাকি—এই নিত্য ও শাশ্বত সর্ব্ব-কল্যাণময় পরমাত্মাই আমি।

—ঋষিকুলতিলক ব্রহ্মবিদ্ শ্বেতাশ্বতর তাঁহার প্রবর্ত্তিত উপনিষদে উক্ত পরমাত্ম-তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়া সূত্র রচনা করিলেন—

১। বৈষ্ণব আগমোক্ত পঞ্চরাত্রতত্ত্ব বা জ্ঞানযোগ, যথা—গুরুতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব ও ধ্যানতত্ত্ব।

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
ত্বমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"
—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ, ৩য় অঃ ৮ম সূত্র।

—অবিদ্যা বা অজ্ঞান তিমিরের পরপারে ব্রহ্মধামে অবস্থিত, এই জ্যোতির্ময় পরম-পুরুষকে (পরম-আত্মাকে) আমি জানি। ইহাঁর স্বরূপ অবগত হইয়া জীব মৃত্যু-কবল হইতে মুক্তি পায়—জরা-মরণের অতীত হয়; ইহাকে জানা ভিন্ন (পরম-পদ প্রাপ্তির) অন্য দ্বিতীয় উপায় নাই।

মুনিশ্রেষ্ঠ যোগী যাজ্ঞবল্ক মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায় ব্যক্ত করিয়া নির্দ্দেশ দিলেন—

"অয়ন্তু পরমোধর্ম্মো যদ্ যোগেনাত্মদর্শনম্।"

—মুমুক্ষু ব্যক্তির স্বকীয় আত্মার প্রকৃত স্বরূপ সাক্ষাৎকার-রূপ যে আত্মদর্শন, তাহাই মুক্তির সাক্ষাৎ উপায়—তাহাই সনাতন ধর্ম্মের সারভূত চরম ও পরম ধর্ম্ম।

এমন যে পরমাত্মতত্ত্ব, অনুভব দ্বারাই মানুষ তাহা উপলব্ধি করিতে পারে। কেবলমাত্র নানাবিধ দার্শনিক মতবাদ আশ্রয় করিলে বা তৎসমুদায় আয়ত্ত্ব করিতে পারিলেই যে সে অনুভূতি আসে—সে প্রকৃত আত্মতত্ত্ব লাভ হয় তাহা নহে, প্রকৃত দর্শন আবশ্যক। 'দর্শনং দর্শনং প্রোক্তম্'—ইহাই না দর্শনের প্রকৃষ্ট সংজ্ঞা! দর্শনশাস্ত্র পাঠে পদার্থতত্ত্বের স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় খুবই সত্য কথা—কিন্তু শুধুই কি দার্শনিক মতবাদ সমূহ বুঝিতে পারিলে বা সে সকল বিষয়ে পণ্ডিত

হইলেই দর্শনে জ্ঞান লাভ হয়—না নিগুঢ় দর্শন তত্ত্বরাজির অবতারণা করিয়া বাগ্ বিতণ্ডার আশ্রয় লইয়া তর্ক ও যুক্তির সাহায্যে প্রতিপক্ষকে বিচারে একান্ত ভাবে পরাস্ত করিয়া স্বীয় দার্শনিক সিদ্ধান্তের বিশেষত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠাপিত করিতে পারিলেই প্রকৃত দর্শনজ্ঞান লাভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে? এত সহজে 'দর্শন' হয় না—'সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু-শিষ্যে দেখা নাই!' চাই অনুভব করিবার শক্তি এবং এ অনুভূতি সম্পূর্ণরূপেই ব্যক্তিগত—প্রকৃত অনুভূতি তত্ত্বজ্ঞান হইতে জন্মে এবং অনুভূতির উন্মেষেই 'দর্শন' লাভ ঘটে। তত্ত্বজ্ঞান কিসে জন্মে? 'জ্ঞানাৎ পরতরং নহি'—ইহা শাস্ত্রবাক্য; গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

—গীতা, ৪র্থ অঃ ৩৪ম শ্লোক।

—"তত্ত্বদর্শিগণে তুমি প্রণিপাত করি
সেবা কর তাঁহাদের আজ্ঞা শিরে ধরি;
জিজ্ঞাস সন্দেহ যত অন্তরে উদয়
তত্ত্ব (জ্ঞান) উপদেশ তাঁরা দিবেন নিশ্চয়।"

—"সুধাকর" গীতা।

তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে কি হয়? শ্রীভগবান বলিলেন—

"যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বকর্ম্মানি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥
নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহবিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধিঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥"

—গীতা, ৪র্থ অঃ ৩৭-৩৯শ শ্লোক।

—"জ্বলন্ত অনল যথা কাষ্ঠ করে ক্ষয়,
জ্ঞানানলে সর্ব্ব কর্ম্ম ভস্মীভূত হয়।
পবিত্র কিছুই নাই জ্ঞানের সমান,
কর্ম্ম-যোগী যথা কালে পান আত্মজ্ঞান।
শ্রদ্ধাবান্ জিতেন্দ্রিয় একনিষ্ঠ জন,
জ্ঞান লভি অচিরাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন।"

—"সুধাকর" গীতা।

জ্ঞানলাভ করিয়া কেমন করিয়াই বা মানুষ মোক্ষ পায় বা মোক্ষের অধিকারী হয়? শ্রীভগবান নির্দ্দেশ দিলেন—

"শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফল-ত্যাগঃ ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥"

—গীতা, ১২শ অঃ ১২শ শ্লোক।

—"বাহ্য অভ্যাসের[১] শ্রেষ্ঠ যুক্তিযুক্ত-জ্ঞান[২],
সেই জ্ঞান হ'তে শ্রেষ্ঠ মনঃস্থির ধ্যান[৩];

১। বাহ্য-অভ্যাস অর্থে আহ্নিক-পূজাদি বুঝায়।

২। যুক্তি-যুক্ত জ্ঞানেই ভগবানের প্রিয়-কার্য্য সাধন হয়। পরব্রহ্মের ব্যক্ত অংশ জানার নামই জ্ঞান। শ্রুতি বলিতেছেন—'তস্মিন্ প্রীতি স্তৎপ্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব' —তাঁহার প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই তাঁহার উপাসনা।

৩। ধ্যান-সমাধি-যোগে বিজ্ঞান লাভ করা যায়। বিজ্ঞান পরব্রহ্মের অব্যক্ত অংশ জানার অপর নাম।

ধ্যান হ'তে 'কর্ম্ম-ফল-ত্যাগ'[১] শ্রেষ্ঠ হয়,
সর্ব্ব-কর্ম্ম ফলার্পণ করিলে আমায়।
এইরূপ 'ত্যাগে' হয় আসক্তি বিলয়,
আসক্তি-বিলয়ে মুক্তি চির শান্তিময়।" —"সুধাকর" গীতা।

তত্ত্বজ্ঞান লাভই ব্যক্তিগত জীবনে অনন্য অনুভূতি স্ফুরণে একান্ত সহায়ক। বস্তুতঃ, তত্ত্বজ্ঞানেই অনুভূতির বিকাশ ও দর্শনেই জ্ঞানের পরিসমাপ্তি—দর্শন হইলেই আত্মার স্বরূপ সাক্ষাৎকার লাভ হয় এবং আত্মদর্শনই মুক্তির বা নিত্যানন্দ লাভের সাক্ষাৎ উপায়—সবার মূলে কিন্তু অনুভূতি।

এখন কথা হইতেছে এমন যে অমৃতের খনি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর, তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের রত্নাগার, ভক্তির উৎস, গীতা ও উপনিষদ্ এবং দর্শন শাস্ত্র-রাজি, সে সমুদয় পাঠ করিয়াও ত মানুষ তত্ত্বজ্ঞান ও অনুভূতি বা আত্মবোধ ও ব্রহ্মনির্ব্বাণ এবং চিদানন্দ লাভ করিতে পারিতেছে না। ইহার কারণ কি? ইহার প্রধানতম কারণ, তত্ত্বজ্ঞান লাভ-হেতু মানুষের মধ্যে প্রকৃত অনুভূতির—তত্ত্বানুভূতির, একান্তই অভাব। কবিবর Pope বলিয়াছেন—

"My words fly off, my thoughts remain below,
Words without thought, never to heaven go."

—কায়, মন ও বাক্য, এ ত্রয়ীর যুগপথ সমাবেশেই বিষয়-বোধ ঘটে ও তত্ত্ববিচার সফল হয় এবং কালে তত্ত্বানুভূতি আসে। কিন্তু, শুধুই কথার

১। কর্ম্মফল ত্যাগ হয়, আসক্তির লয় হয়—নির্ব্বাণ লাভ হয় বিজ্ঞান জন্মিলে।

পর কথা গাঁথিলে কিম্বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ-হেতু সশ্রদ্ধ একাগ্রতা ও একান্ত আগ্রহ না থাকিলে, কোন ফলোদয়ই হয় না, প্রকৃত দর্শন লাভ ঘটে না— 'ভস্মে ঘী ঢালার' মত সর্ব্বস্বই পণ্ড হইয়া যায়। প্রাণের ক্ষোভে তাই বাংলার 'সুধাকর' গাহিয়াছেন—

"ঘরে ঘরে গীতা পাঠ—
ফল কেন ফলচে না ?
দেশলাইয়ের কাঠির দোষে
একটি কাঠি জ্বলচে না,
গীতার শ্লোক ইক্ষুদণ্ড
গিলিলে আস্বাদ নাই ;
গুরুপাশে বসে বসে
সরসে চিবান চাই।"

'ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদর' ছোট শিশুটির মত মানুষ যাহা কিছু পায় তাহাই সে একেবারে গলাধঃকরণ করিয়া উদরস্থ করিতে প্রয়াসী হয়—কোন কিছুরই রসাস্বাদনে কেমন যেন তার চেষ্টা বা যত্ন থাকে না। 'বোধ' তাহার আসে না—বদহজমই হয় এবং ইহাই জনসমাজকে ব্যস্ত ও বিব্রত করিয়া রাখে প্রতিনিয়ত।

সর্ব্ব-উপনিষদ-সার গীতা পড়িয়াও আমাদের—ভারতবাসীর যে অবস্থা, সর্ব্ব-দর্শন-সিদ্ধান্ত আয়ত্ব করিয়াও ঠিক তদনুরূপই অবস্থা। সাংখ্যের তথাকথিত নিষ্ক্রীয়বাদ (?) ন্যায়ের কচ্ কচি (!) বা বেদান্তের দ্বৈতাদ্বৈতবাদের লৌকিক বাগ্ বিতণ্ডা লইয়াই আমরা সকলে মাথা ঘামাই,

প্রকৃত দর্শন লাভ হয় কিসে সে বিষয়ে ধ্যান রাখি না বা তেমন দর্শন-তত্ত্ব অনুভব করিতে শিক্ষা করি না।

প্রকৃতপক্ষে, দর্শন আলোচনা করি আমরা এমন প্রকার ও প্রণালীর মধ্য দিয়া যাহাতে আমাদের বুদ্ধিও 'খোলে' না বোধিরও স্ফুরণ হয় না—আধারকে বাদ দিয়াই অনেক সময়ে আধেয় সম্বন্ধে আমাদের জল্পনা-কল্পনার অন্ত থাকে না। মানুষকেই না ছোট করিয়া দেখি প্রতি দৃষ্টান্তেই, আর তাহারই না পাপের বোঝা পাহাড় প্রমাণ করিয়া আমরা নিজেদের দৃষ্টি-পথ রোধ করি! সৃষ্টিকে বাদ দিয়া স্রষ্টার মূর্ত্তি ধ্যানে মূর্ত্ত করিয়া তাহাতে বিভোর হইব, ইহাই না আমাদের বড় অভিমান! কখনও বা ইহারই ঠিক বিপরীত পন্থার অনুবর্ত্তন করিয়া, স্রষ্টাকে একেবারে 'ছাটিয়া' ফেলিয়া দিয়া, আমরা সৃষ্টির প্রাধান্য স্থাপন করিয়া, পাশ্চাত্য জড়বাদের জৌলুসে মুগ্ধ ও মোহিত হইয়া, সভ্য (civilized) সাজিয়া নিজেদের ধন্য ও কৃতকৃতার্থ মনে করি; আবার, কখনও বা উক্ত উভয়বিধ কৃষ্টির (culture) দোটানায় পড়িয়া 'শ্যাম রাখি কি কুল রাখি' এমনই একটা উদ্ভট পরিস্থিতির সূচনা করিয়া তাহাতেই 'হাবুডুবু' খাইয়া 'অবতার' সাজিয়া কতই না কীর্ত্তি রটাই! প্রকৃত দর্শন তত্ত্ব নিরূপণে বা বেদান্তের 'তত্ত্বমসি' বা 'সোহং' ভাবের যথার্থ তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনায় বা রাগাত্মিকা ভক্তিরসের গূঢ় প্রেমাস্বাদনের কোন প্রচেষ্টাই আমরা করি না—কোন কিছুই তলাইয়া ভাবিতে চাহি না।

ফলে—আমাদের পুঁথির পর পুঁথিই বাড়িয়া যায়, যুক্তির পর যুক্তির জাল বুনিয়া, সিদ্ধান্তের পর কুট সিদ্ধান্তের অবতারণা করাই শেষ পর্য্যন্ত মুখ্য হইয়া দাঁড়ায় ও উক্ত উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধ করিতে জটিলতম তর্কবাদ এবং প্রমাণ-প্রয়োগের আশ্রয় লইতে পাঁজি-পুঁথির ভিতরে 'নথির' পর 'নথি' খুঁজিয়া

বাহির করিয়া দম্ভই প্রকাশ করি। মানব-তত্ত্ব, আত্ম-তত্ত্ব, ব্রহ্ম-তত্ত্ব সব কিছুই তলাইয়া যায়—কোন তত্ত্বেরই কূল-কিনারা আমরা পাই না এবং এইরূপ অসহায় অবস্থায় আমাদের দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি হওয়া ত দূরের কথা, ক্রমান্বয়ে তাহা শত-সহস্র গুণ বাড়িয়াই চলে; আমাদের জীবন-সমস্যা উত্তরোত্তর জটিল হইতে জটিলতর হইয়াই দাঁড়ায়।

বাংলার কবি দেশপ্রকৃতির পূজার উদ্বোধন করিতে গিয়া আমাদের এই সাধন-বিলাস পরিলক্ষ্য করিয়া, আমাদের এই 'সসেমিরা' অবস্থায় মর্ম্মাহত হইয়া, মনের আক্ষেপে গাহিয়াছেন—

"ক্ষান্ত হও! মিছে আর কেন বৃথা খুঁজে মর
পেয়েছ কি একটু সন্ধান?
গ্রন্থ-পাঠে তর্কবাদে দেখি কি করেছ জড়?—
কিছু নয়—বৃথা অভিমান!
অন্ধ করি রুদ্ধ করি দিব্য প্রবেশের পথ, ভ্রান্তি নিয়ে তবু বার বার
বিজ্ঞানের যুক্তি নিয়ে দার্শনিক-মত দিয়ে পেতে চাও কোথা সীমা তার।
অনন্তে অখিলে এনে, অসীমে সীমায় টেনে—ওরে ভ্রান্ত কোথা যা'বি বল্
ফিরে আয় ওরে অন্ধ, দেখ দিব্য-দৃষ্টি মেলি কোথা রবি করে ঝলমল্
কোথা পথ সহজ সরল!
প্রাণহীন স্পন্দহীন অক্ষরের রেখা-মাঝে পেতে চাস্ প্রাণের সন্ধান,
হায় হায়!—মিছে অভিমান।"

—"আকিঞ্চন দাস।"

—কবি আরও বলিতেছেন, মিছে খোঁজা খুঁজি ছাড়্, অভিমান রাখ্, মন হ'তে সঙ্কোচের পাশ খুলে ফেল্। 'তুই যে রে অমৃত সন্তান'!

যাঁর ইচ্ছায় এই বিশ্বচরাচর প্রতিদিন নিয়ন্ত্রিত হ'চ্চে, যাঁর করুণা কটাক্ষে রবি-শশী-গ্রহ-তারা পরিচালিত হ'য়ে নিয়তই তাঁর মহিমা প্রকাশ কচ্চে, সেই জ্যোতির্ম্ময় সর্ব্বশক্তিমান ঐশীশক্তির তুই যে রে একটী অংশ! সেই মহাশক্তি আশ্রয় ক'রে জাগ্ দেখি—'দেখতে পা'বি অনন্ত-কালের সে 'শাশ্বত আত্ম-জাগরণ-গাথা' তোরই মাঝে সুপ্ত র'য়েছে, তোরই জীবনের পাতায় পাতায় মাখা আছে সে অতীত যুগের কত-শত মুনি-ঋষির জীবন-ব্রত ও সাধনা। আত্মশক্তি বোধ নিয়ে 'সে মহা গ্রন্থের খোল্ দেখি ফিরে আজ এক পাতা'—'পাবি মূল আদি ও অন্তের।' সত্যদ্রষ্টা কবি তাই সত্যের সন্ধান দিলেন—

"খুলে তবে দেখ্ দেখি কি রয়েছে গ্রন্থে লেখা ?
—দেবতার এ চির-বন্দন।
দেখ্ বুঝে মিলে কি না নিখিলের প্রাণ-সনে
চেতনের প্রাণের স্পন্দন!
দেখ্ দেখি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ওঠে কিনা প্রকৃতির সুমহান্ প্রাণের নিঃশ্বাস
আসা আর চলে যাওয়া সত্য হোক্ মিথ্যা হোক্—আছে কিনা অখণ্ড-বিশ্বাস ?
মানবের এ হৃদয় শুভ্র-দেবতা-মন্দির ; ভক্ত চায় দেবতার পানে
পরিপূর্ণ উপচারে প্রেমে স্নেহে জ্ঞান-গর্ব্বে—ধন্য হতে ধারণায় ধ্যানে
—আপনার নিবেদিত জ্ঞানে।
এই জন্ম এ হৃদয় সত্য হোক্ শান্ত হোক্—হোক্ শুভ্র উজ্জ্বল অতুল
মানবত' নিবেদিত ফুল।"
—"আকিঞ্চন দাস।"

ভক্ত ও ভগবানের এই যে মিতালি—জীবে ও শিবে এই যে অখণ্ড-সত্ত্বা, স্রষ্টা ও সৃষ্টি বিষয়ে মানবের এই যে ভাবদর্শন—'সবার উপরে

মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই,' এমন যে অভিনব সত্যানুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টি—ভক্তের প্রাণের বিনিময়, ভগবানের প্রেমের খেলা—ইহার রহস্যই বা কি? ইহার পরিচয়—প্রকৃত পরিচয়, কেমন করিয়া পাওয়া যায়? কবে, কেমন করিয়া এ অভিনব ভাবদর্শনের ভাব-তরঙ্গ ভবানীপতি ভোলানাথের ডম্বরু নিনাদের তরঙ্গ-ভঙ্গে স্পন্দিত হইয়া মানব মনে স্ফুরিত হইয়াছিল—কোন সে দেশ, যথায় ইহার প্রসার হইয়াছিল সর্ব্বপ্রথমে এবং কিরূপেই বা দেশ দেশ নন্দিত করিয়া ভক্তজন-মন উদ্বুদ্ধ করিয়া সহজ ও সরল গতিভঙ্গিমায় 'নিখিলের প্রাণসনে চেতনের প্রাণের স্পন্দনের' যোগসূত্র বাঁধিয়া দিয়াছিল এই মানবত-দর্শন? ভারতের শত শত প্রাচীনতম ধর্ম্মমত ও তৎসম্পর্কীয় আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াই না এই অভিনব ভাব-দর্শন স্ফুরিত হইয়াছিল কালে কালে এবং প্রত্যেকটিকে মূল হিসাবে অবলম্বিত হইয়াই না প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এক একটি গূঢ় অনুভূতি।

এই ভাব-দর্শনরাজি, জৈন-দর্শন ও বৌদ্ধ-দর্শন ব্যতিরেকে অপরাপর যে সকল আজীবক ধর্ম্মমত বা তাহার আচার-অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করিয়া পরিলক্ষিত, পরিবর্দ্ধিত ও প্রসারিত হইয়াছিল, সেই সকল ধর্ম্মমত বা তৎ তৎ বিষয়ক আনুষ্ঠানিক বিধিগুলি যে সকল দর্শন-তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠিত ছিল, তেমন দর্শন-গ্রন্থ এতাবৎকাল অতি অল্পই আবিষ্কৃত হইয়াছে—অবিদিতই রহিয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে অনেকানেক অমূল্য দর্শন-সিদ্ধান্ত—গুরু-পরম্পরায় বা বংশ-পর্য্যায়ের অনন্য অনুভূতিতে এবং ভক্ত মহাত্মাদিগের সাধন-লব্ধ ধন—তাঁহাদিগের প্রাণবিগলিত গাথায় ও গানে, চর্য্যাপদে ও পদাবলীতেই এক্ষণে আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে এই সকল গুহ্য ভাব-তত্ত্ব ও গূঢ় দর্শন-সিদ্ধান্তরাজি।

আমাদের এই ভারতবর্ষে সকল অভাব হইতে বড় অভাব ছিল এই যে আমাদের দেশের আধুনিক ধরণের ধারাবাহিক ইতিহাস (chronological history) পাওয়া যায় না এবং পুরাকালে যেগুলি মহামূল্য পুরাণ গ্রন্থরাজি রচিত হইয়াছিল তাহার মূল যোগসূত্রের কোন 'হদিস্‌ই' আমরা ইতিপূর্ব্বে পাই নাই। এক্ষণে আমাদের বড়ই সৌভাগ্য এবং মহা সুবিধা এই যে উক্ত জাতিগত ও প্রদেশগত দৈন্য অপসারণ করিতে আমাদের স্বদেশীয় ও বিদেশস্থ বহু মণীষাসম্পন্ন কৃতবিদ্য পণ্ডিতমণ্ডলী নানাবিধ প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধানে ও ব্যাপক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগেরই কৃপায় আমাদের এ প্রাচীনতম দেশের প্রাচীনতর বহু বিক্ষিপ্ত ধর্ম্মমত ও তাহার আচার অনুষ্ঠানের বিবরণ এখন আমরা উল্লিখিত ভাব-দর্শন, তথা মানবত-দর্শনের যোগসূত্র হিসাবে ধরিয়া লইতে পারিতেছি। উক্ত বিবরণী যদি আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় আমাদের এই বাংলা দেশের ও তৎনিকটবর্ত্তি জনপদগুলির জাতীয় ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির উপরই সুপ্রসিদ্ধ জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মমত ও প্রায় সমুদয় আজীবক ও তৈর্থিক ধর্ম্মমতগুলি প্রতিষ্ঠিত এবং উক্ত ধর্ম্মমতগুলিই ভারতের যাবতীয় ভাব-দর্শনের আকর স্বরূপ।

এই ভাব-দর্শনরাজি আশ্রয় করিয়া যে সকল দর্শন-সিদ্ধান্ত রহিয়াছে তাহা শুধুই যে আর্য্যজাতীয় ধর্ম্মতত্ত্ব বা বৈদিক-দর্শন হইতেই সমুদ্ভূত তাহা বলা চলে না, কেন না বৈদিক ধর্ম্ম সাধারণতঃ গৃহস্থেরই ধর্ম্ম, বৈদিক যাগ-যজ্ঞ, ক্রিয়া-কলাপ সকলগুলিই একপ্রকার গৃহস্থালি ব্যাপার। বস্তুতঃ, কঠোর ত্যাগধর্ম্ম ভারতের এক অভিনব ধর্ম্মপন্থ; ইহা সংসার আশ্রমের বিপরীত ভাবাত্মক, সকলগুলিই বৈরাগ্যের ধর্ম্ম; ইহারই আশ্রয়ে নূতনতর

ভাব-দর্শনগুলি প্রবর্ত্তিত ও প্রত্যেকটিরই মূল সাংখ্যদর্শনের মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলা যাইতে পারে এবং প্রায় সকলগুলিই পূর্ব্বভারতে, অর্থাৎ যে সকল দেশের সহিত পূর্ব্বে আর্য্যজাতির তেমন কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যোগসূত্র ছিল না, সেই সকল স্থান হইতে সমুৎপন্ন এবং একটু প্রণিধান করিয়া বিচার করিলে ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে উল্লিখিত প্রায় সকল ত্যাগ-ধর্ম্মই এক বাক্যে প্রচার করিতেছে—

(ক) গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ কর।

(খ) গৃহস্থ আশ্রমে সুখ নাই।

(গ) দুঃখের দাবানলে প্রতিনিয়ত গৃহস্থ জর্জ্জরিত।

(ঘ) শান্তি লাভ করিতে হইলে গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাহাতে জন্ম, জরা ও মরণ, এই তিনটি অতিক্রম করিতে পারা যায়—এই ত্রিতাপ হইতে মানুষ রক্ষা পায়, তাহার জন্য প্রচেষ্টা করাই বিধেয়। দুঃখের একান্ত পরিসমাপ্তিই সকলগুলির একমাত্র লক্ষ্যস্থল।

(ঙ) উক্ত ত্রিতাপ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইলে প্রধানতঃ—'আমি কে?' 'আমি কোথা হইতে আসিলাম?' 'আমি কেন আসিলাম?'—এই সকল তত্ত্বেরই চিন্তা করা আবশ্যক।

(চ) উক্তরূপ চিন্তার ফলে মানুষ প্রকৃত অনুভূতি লাভ করে এবং মানব-আত্মা কেবল হইয়া যায় বা তাহার নির্ব্বাণ লাভ হয় বা মানব আত্ম-নিবেদন করিতে শিক্ষা করিয়া পরমাত্ম-তত্ত্ব অবগত হইয়া জীবনে কৃতকৃতার্থ হয়। মানুষ এহেন অবস্থায় পৌছিলে সে জরা-মরণের অতীত হয়, অহঙ্কার আর তার থাকে না ও তাহার আত্মা সর্ব্বব্যাপী হয়। উক্ত সাধনে উন্নত হইলে ইহ-সংসারের সহিত মানুষের আর কোন সংস্রব

থাকে না—মানবাত্মা মহাকরুণার আধার হইয়া যায়—নিত্যানন্দ লাভ-হেতু তাহার পরম-পদ প্রাপ্তি ঘটে।

এই আত্ম-দর্শন, এহেন ভাব-দর্শনের পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে নূতন এবং ইহার আশ্রয়ে আরও যে সকল বহুবিধ ভাব-সিদ্ধান্তরাজী গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা আরও অভিনব। ভারতের, বিশেষতঃ পূর্ব্বভারতের, চাই কি সচ্ছন্দে বলা চলে আমাদের এই বাংলা দেশেরই ইহা এক অভূতপূর্ব্ব দান-সম্ভার।

ভাব-দর্শনগুলির মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের বহুবিধ তত্ত্বই আমরা পাইয়াছি উক্ত ধর্ম্ম-বিষয়ক অনেকানেক ধর্ম্ম ও দর্শন-সিদ্ধান্ত পরিপুষ্ট শাস্ত্র-গ্রন্থে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে তৎবিষয়ক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিও প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু, উল্লিখিত দুইটি মাত্র ভাব-দর্শন ব্যতিরেকে অপরগুলির দর্শন-সিদ্ধান্ত যে সকল আজীবক ধর্ম্মমতগুলি আশ্রয়ে প্রবর্ত্তিত সেই ধর্ম্মমত-গুলির প্রথমে যথা-সম্ভব সরল ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করিয়া তাহার মধ্যে যে অভিনব ভাব-দর্শনের সিদ্ধান্ত-নিচয় অন্তর্নিহিত রহিয়াছে তাহারই কতকগুলির পরিচয় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল। সাধারণ ভাবে প্রধানতঃ ছয় ভাগে উক্ত বিবিধ ভাবাত্মীকা ধর্ম্মমতগুলিকে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—

প্রথম — মৎসেন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত নাথপন্থ।

দ্বিতীয়— লুইপাদ, শান্তিদেব প্রভৃতি সিদ্ধাচার্য্যগণ ও তাঁহাদিগের বিরচিত চর্য্যাপদলহরী।

তৃতীয়— সহজিয়া পন্থ ও সহজিয়া সাধকবৃন্দের দোঁহা ও পদসমূহ।

চতুর্থ — জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস প্রভৃতি রচিত রাগাত্মিকা মধুর পদাবলী এবং অসংখ্য দোঁহা, দোঁহাকোষ, গান ও ভাবাত্মিকা গ্রাম্য-গীতিকাবলী।

পঞ্চম — তান্ত্রিক সাধকবৃন্দ ও তাঁহাদের সাধনলব্ধ বহুবিধ শ্যামা-সঙ্গীত।

ষষ্ঠ — শ্রীমৎ চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব-দর্শন-সিদ্ধান্ত বিষয়ক অগণিত কীর্ত্তন পদলহরী।

১। নাথপন্থ।

প্রেমিক সাধু মৎসেন্দ্রনাথ বা মীননাথ নাথপন্থের প্রবর্ত্তক। নাথেরা একটি প্রবল ধর্ম্মমত প্রচার করেন। যোধপুরের মহামন্দির নাথপন্থীদিগের একটি প্রধান তীর্থক্ষেত্র। এক সময় নাথপন্থ এতই প্রবল ছিল যে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ই নাথদের পূজা করিতেন; এখনও নেপালী বৌদ্ধ-দিগের মৎসেন্দ্রনাথই প্রধান দেবতা, নেপালে তাঁহার রথযাত্রার সময় পুরীর জগন্নাথদেবের রথযাত্রার মতই মহা ধুমধাম হয়। মৎসেন্দ্রনাথের শিষ্য গোরক্ষনাথকে এখনও তিব্বতীয় বৌদ্ধেরা পূজা করেন। আমাদের বাংলাদেশে 'যোগীরা' সকলেই 'নাথ' উপাধিধারী; তাঁহারা বলেন, 'আমরাই এ দেশের রাজাদের গুরু ছিলাম, ব্রাহ্মণেরা আমাদের গুরুগিরি কাড়িয়া লইয়াছে।' নাথেরা যে এদেশের রাজাদের গুরু ছিলেন এককালে, তাহার কোনই ভুল নাই; বাংলাদেশের 'ময়নামতীর গানের' নায়ক 'হাড়িপা,' বা 'হাড়িসিদ্ধা,' বা 'জলন্দরি' এমনই একজন নাথপন্থী যোগী—তিনি গোরক্ষনাথের শিষ্য, ময়নামতীর গুরুভাই। তিনি ছিলেন কেমন? ময়নামতী স্বীয় পুত্র রাজা গোপীচন্দ্রের বা গোবীচন্দ্রের বা গোবিন্দচন্দ্রের নিকট তাঁহার গুরুভাই হাড়িসিদ্ধার পরিচয় দিয়া বলিতেছেন—

"এ দেশীআ হাড়ি[1] নএ বঙ্গদেশে ঘর।
চান্দ সুরুজ রাখছে দুই কাণের কুণ্ডল॥
চান্দের পৃষ্ঠে রান্ধে হাড়ি কূর্ম্মের পৃষ্ঠে খাএ।
সোনার খড়ম পাএ দিআ দৌড়িয়া বেড়াএ।
দৌড়িআ বেড়াতে যদি যমের লাগ্ গ পাএ।
চিলাচান্দি দিআ যমক তিন পহর কিলাএ॥"

—"ময়নামতীর গান

—ইহার অবশ্য অর্থ নিষ্প্রয়োজন। তবে এমনই মহাতেজা ... 'সিদ্ধাই' ছিলেন এই হাড়িপা যোগী।

শিবই নাথদিগের দেবতা; তাঁহাদের ধর্ম্মমতও হর-পার্ব্বতী-সংবাদ আকারে তন্ত্র-পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ এবং সাংখ্যমতই তাঁহাদিগের আদি ধর্ম্মমত।

নাথেরা হটযোগ প্রচার করেন—নানা প্রকার আসন করিয়া প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা করিয়া যোগভ্যাস করাই তাঁহাদিগের ধর্ম্ম। স্বর্গ বা অপবর্গের ধার তাঁহারা ধারিতেন না; গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া যোগী হইয়া সিদ্ধিলাভ করাই তাঁহাদের একান্ত কাম্য বস্তু। গৃহস্থাশ্রম ছাড়িতেন বলিয়া কিন্তু বিবাহে তাঁহাদের আপত্য ছিল না এবং মাংসাহারে বা মদ্যপানেও তাঁহাদের বিরতি ছিল না।

"কৌলজ্ঞান-বিনিশ্চয়" মৎসেন্দ্রনাথের বা মচ্ছন্দপাদের অবতারিত একখানি উৎকৃষ্ট তন্ত্র-গ্রন্থ। মৎসেন্দ্রনাথের একটি তন্ত্র উদ্ধৃত হইল—

১। হাড়ি—জাতিবিশেষ, মৎসব্যবসায়ী।

"কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট[১] । কর্ম্ম কুরঙ্গ সমধিক পাঠ ॥
কমল বিকসিল কহিহ ন জমরা । কমল মধু পিবিবি ধোকে ন ডমরা[২] ॥"

—অর্থাৎ, গুরুর কি অপার করুণা, তিনি শিষ্যকে আধ্যাত্মতত্ত্ব উপদেশ দিয়া তাহাকে পারমার্থিক উন্নতির পন্থা বলিয়া দিতেছেন। গুরুকৃপায় সাধকের হৃদয়-শতদল ফুটিয়া উঠিতেছে, নিত্যই সে যে সেই কমলের মধু পান করিবে তাহাতে তাহার—'ডমের' আর কোনই ধোঁকা বা সন্দেহ নাই।

"হটযোগ-প্রদীপিকা" গোরক্ষনাথ বিরচিত একখানি উৎকৃষ্ট যোগ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। গোরক্ষনাথ রচিত আরও গ্রন্থ আছে, যথা—"গোরক্ষ-সংহিতা," "গোরক্ষ-বিজয়," "গোরক্ষ-শতক," "গোরক্ষ-কল্প" ইত্যাদি। একটি গোরক্ষনাথের হটযোগ-প্রদীপিকায় অবতারিত বাক্যও কথিত হইল, যথা—

"মন্ থীরিতে[৩] পবন্ থীর, পবন্থীরিতে বিন্দু থীর।
বিন্দুথীরিতে কন্দ থীর, বলে গোরক্ষদেব সকল থীর ॥"

"ষটচক্রভেদ" যোগীদিগের অন্যতম প্রধান সাধন, "হংসজপও" তেমনই তাঁহাদের আর একটি মুখ্য সাধনা—হংস মন্ত্র কি? "গোরক্ষ-সংহিতা" বলিতেছেন—

"হংকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ।
হংসহংসেত্যমুং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা ॥

১। বাট—পন্থা।

২। 'ডমরা' বা ডমের, অর্থাৎ ডোম্বির বা বাঙ্গালীর, অর্থাৎ পূর্ণ অদ্বৈতবাদীর।

৩। থীরিতে—স্থির হইলে।

ষট্‌শতানি দিবারাত্রৌ সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ।
এতৎ সংখ্যান্বিতং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা॥
অজপানাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী।
তস্যা স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"

কথিত আছে[১], মৎস্যেন্দ্রনাথ যখন এক সময়ে বিষয়াসক্ত হইয়া ঘোর সংসারী হইয়া পড়িয়াছিলেন তখন তাঁহার শিষ্য গোরক্ষনাথই জিজ্ঞাসার ছলে জ্ঞান শিক্ষা দিয়া তাঁহার পুনরায় চৈতন্য উৎপাদন করিয়া ও ধূলিকণার মত মণিমাণিক্যাদি বহুমূল্য রত্নরাজি সমস্তই যে অকিঞ্চিৎকর তাহার বোধ ফিরাইয়া আনিয়া ও অন্যান্য বহু তত্ত্বজ্ঞান পনরুপদেশ করিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়াছিলেন। "চেৎ মৎছন্দর্‌ গোর্‌ক্ষা আয়া," "চেৎ মৎছন্দর্‌ গোর্‌ক্ষা আয়া"—গোরক্ষনাথের সে সময়কার সে আহ্বান এখনও অনেক ঘোর বিষয়ী সংসারীকে পরমার্থ-পথের ইঙ্গিত দেয়।

২। সিদ্ধাচার্য্যগণ ও তাঁহাদের চর্য্যাপদ।

সিদ্ধাচার্য্যদিগের মধ্যে 'লুইপাদ' একজন আদি সিদ্ধাচার্য্য, তিনি বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহার আর এক নাম ছিল 'মৎস্যান্ত্রাদ্‌'—তিনি মহা যোগীশ্বর ও একজন অসাধারণ সাধক ছিলেন। রাঢ়ে ও ময়ূরভঞ্জে এখনও তাঁহার পূজা হয় এবং বৌদ্ধ তিব্বতীরাও তাঁহার পূজা করেন।

লুইপাদ একটি সম্প্রদায়ও সৃষ্টি করেন। তাঁহার রচিত বহু গান আছে, সেগুলিকে চর্য্যাপদ বলে—অনেক সংস্কৃত গ্রন্থেরও তিনি টীকা লিখিয়াছিলেন। অন্যান্য সিদ্ধাচার্য্যের, যথা—"কুক্কুরী," "ভুসুকু," "শান্তি,"

১। "ভক্তমালগ্রন্থ," ১৪শ মালা।

"সবর" প্রভৃতির বহু চর্য্যাপদ পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি সবই কীর্ত্তনপদ। এমন অনেক চর্য্যাপদ, দোঁহাকোষ ও দোঁহা-গীতিকা পাওয়া গিয়াছে যাহার মূল বাংলা পদ নাই, কিন্তু ভুটিয়া ভাষায় তাহাদের তর্জ্জমা আছে ; ভুটিয়া ভাষায় আরও অনেক গ্রন্থ আছে যাহাতে শুধু বাংলার ধর্ম্মমত বা দর্শনতত্ত্ব নয় বাংলা সাহিত্যেরও ইতিহাস পাওয়া যায়—"তেঙ্গুর" গ্রন্থ তেমনই একখানি গ্রন্থ।

কয়েকটি চর্য্যাপদের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল। চঞ্চল চীয়ে পইঠো কাল ॥
দিট করিঅ মহাসুহ পরিমাণ। লুই ভণই গুরু পুছিঅ জাণ ॥"

—মানবদেহ তরুবর সদৃশ, তাহার পাঁচটি ডাল আছে। চিত্ত চঞ্চল দেখিয়া কাল তাহাতে প্রবেশ করিল ; লুইপাদ বলিতেছেন, মহাসুখের পরিমাণ দেখিয়া উহা কি, গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া লও। এ তত্ত্ব জানিতে পারিলে চিত্ত আর চঞ্চল হইবে না, দেহে কালও প্রবেশলাভ করিতে পারিবে না—মরণজয়ী হইবে। মহাসুখ-পরিমাণ একা গুরুই বলিয়া দিতে পারেন। শিখ সম্প্রদায়ের পঞ্চম গুরু, 'গুরু অর্জ্জুনদাস' তাঁহার "সুখমনী" গ্রন্থে মহাসুখ-পরিমাণের বেশ সুন্দর 'হদিস্' দিয়াছেন, তিনি গাহিয়াছেন—

"সিমরউ, সিমর সিমর সুখ পাবউ।"

—অর্থাৎ, জগৎ চিন্তামণীকে স্মরণ কর, স্মরণ কর—স্মরণ করিতে করিতে সুখ পাইবে।

সিদ্ধাচার্য্যগণের সাধন-পন্থা কি ? লুই বলিতেছেন—

"সঅল সমাহিঅ কাহি করিআই।
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরি আই ॥

এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুসুপাখ ভিতি লাহুরে পাস॥
ভনই লুই আমহে সানে দিঠা।
ধরণ চমণ বেণি পণ্ডি বইণ।"

—যত প্রকার সমাধি আছে, তাহার দ্বারা কি ইষ্ট লাভ হইবে! সে সকল সমাধি করিলে সুখ ও দুঃখ দুইই নিশ্চয় বিনষ্ট হইবে। ছন্দের বন্ধন ও করণের পরিপাটীর আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া নিজেকে শূন্য পক্ষ-রূপ ভিত্তিতে লইয়া আইস। লুই বলিতেছেন—আমি পণ্ডিতের বাণী অনুসারে দেখিয়াছি—দর্শন করিয়াছি—ধরণ ও চমণ, অর্থাৎ, অলি ও কলি এই উভয় আসন করিয়া আমার দেবতা বসিয়া আছেন।

পূর্ব্ব উল্লিখিত "তেঙ্গুর" গ্রন্থে অপর একজন বাঙ্গালী সিদ্ধাচার্য্যের নাম পাওয়া যায়, তিনি শান্তিদেব বা 'ভুসুকু' বা রাউতু[১]। তাঁহার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, তিনি—

ভু | ক্লানোপি প্রভাস্বরঃ,
সু | প্তোপি প্রভাস্বরঃ,
কু | টিং গতোপি প্রভাস্বরঃ।

—ভোজন, শয়ন এবং উপবেশন, সকল সময়েই তাঁহার মুখ প্রসন্ন থাকিত, তাই তিনি 'ভুসুকু' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই 'ভুসুকু' বা শান্তিদেব বিরচিত "সূত্র-সমুচ্চয়", "শিক্ষা-সমুচ্চয়", "বোধিচর্য্যাবতার", "চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়" প্রভৃতি কতিপয় বৌদ্ধগ্রন্থও বিদ্যমান। 'ভুসুকুর' একটি চর্য্যাপদ উদ্ধৃত হইল—

১। রাউতু বা রাউত, অর্থাৎ সেনাপতি—শান্তিদেব 'অচল সেন' নামে সেনাপতি ছিলেন।

"বাজ ণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বহিউ। অদঅ বাঙ্গালে ক্লেশ লড়িউ ॥
আজি ভুসু বাঙ্গালী[১] ভইলী। নিঅ ঘরণী চণ্ডালী লেলী ॥
ডহি জো পঞ্চবাট লই দিবি সংজ্ঞা ণঠা। না জানমি চিঅ মোর কঁহি গই পইঠা ॥
সোন তরুঅ মোর কিম্পি না থাকিউ। নিঅ পরিবারে মহাসুহে থাকিউ ॥
চউকোড়ী ভাণ্ডার মোর লইঅ সেস। জীবন্তে মইলেঁ নহি বিশেষ ॥"

—"চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়।"

—বজ্রনৌকা পাড়ি দিয়া পদ্মখালে রহিলাম, আর অদ্বয় যে বাংলা দেশ, সেখানে আসিয়া ক্লেশ লুটাইয়া দিলাম—রে ভুসু! (ভুসুকু) সত্য সত্যই তুমি আজ বাঙ্গালী হইলে—যে হেতু তোমার নিজ ঘরিণী, যে পূর্ব্বে অবধূতি ছিল, যাহাকে চণ্ডালী করিয়াছিলে, এইবার তুমি বাঙ্গালী হইলে, অর্থাৎ পূর্ণ অদ্বৈতবাদী হইলে। 'ভুসুকু' বলিতেছেন, মহাসুখরূপ অনলের দ্বারা আমার পঞ্চ (দুঃখ)-স্কন্দাশ্রিত সমস্তই দগ্ধ হইল; বলিতে পারা যায় না যে এখন আমার চিত্ত কোথায় গিয়া পৌঁছিল। আমার শূন্য তরুর আর যে কিছুই রহিল না—সে এখন আপন পরিবারে মহাসুখে থাকিল; আমার চার কোটি ভাণ্ডার সবই গেল, এখন আমার জীবনে ও মরণে কিছুই আর বিশেষ রহিল না।

ইহাই, এই 'মহাসুহ'ই সিদ্ধাচার্য্যদিগের পরম-কাম্য-সাধন সিদ্ধ অবস্থা; ইহার মহাশূন্য-রূপ শেষ পরিমাণ একমাত্র গুরুদেবই, আচার্য্যদেবই বলিয়া দিতে পারেন—দেবভাবে তাঁহার সেবা করিলে ভক্তির স্ফূর্ত্তি হয় এবং ভক্তিই মুক্তি দান করে।

১। সিদ্ধাইদিগের সাধনার তিনটি পথ আছে—'অবধূতি', 'চণ্ডালী' আর 'ডম্ বা ডোম্বি বা বাঙ্গালী।' অবধূতিতে দ্বৈতজ্ঞান থাকে; চণ্ডালীতে দ্বৈতজ্ঞান আছে বলিলেও হয় বা নাই বলিলেও হয়; আর ডোম্বিতে কেবল অদ্বৈত, দ্বৈতের ভাঁজও নাই। বাঙ্গালী বলিতে অদ্বৈত মতের আধার বুঝাইত।

৩। সহজিয়া-পন্থ।

সহজিয়া-পন্থ ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন ধর্ম্মমত। সহজিয়া-পন্থী সাধক সাধারণতঃ সহজিয়া বা বাউল নামে পরিচিত। সহজিয়া সাধকবৃন্দের অনেক সহজিয়া-পদও আছে। সহজিয়া-পন্থ কি? সহজিয়া সাধক "চণ্ডিদাস" সে পথের ইঙ্গিৎ দিলেন—

"সহজ সহজ সবাই কহয়ে,
সহজ জেনিবে কে।
তিমির অন্ধকার যে হইয়াছে পার,
সহজ জেনেছে সে।"

—যাঁহার মনের ময়লা দূর হইয়াছে, রাগতন্ত্রের যিনি ভজনা করেন, তিনিই সহজ-সাধক, অর্থাৎ প্রেম সাধনার অধিকারী। সহজ-সাধনা সহজ নহে।

'সরোরুহবজ্র' বা 'সরোরুহপাদ' এমনই এক জন সহজিয়া সাধক ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেকগুলি দোঁহা ও গান আছে। তাঁহার "দোঁহাকোষে" ষড়দর্শনের তৎকালীন প্রচলিত মতের খণ্ডন দৃষ্ট হয়। তিনি জাতিভেদের উপরও কটাক্ষ্য করিতে ছাড়েন নাই। তিনি বলেন, সহজ মতে না আসিলে মুক্তি হয় না; সহজ-ধর্ম্মে বাচ্য নাই, বাচক নাই এবং ইহাদের সম্বন্ধও নাই—মানুষ আপনার স্বভাবটাই বোঝে না—ভাব নাই অভাবও নাই, সকলই শূন্যরূপ অর্থাৎ ভব ও নির্ব্বাণে কোনই প্রভেদ নাই—দুইই এক—তাই সহজিয়া অদ্বয়বাদী।

শ্রীরামচন্দ্রের পরম-ভক্ত, সাধক 'দাদু দয়াল' সহজিয়া-পন্থের ভাবদর্শন ব্যক্ত করিয়া দোঁহা গাহিলেন—

"নহি সে সব্ হুয়া, ফিন্ নহি হো যায়।
নহি হোয়ে রহ দাদু, সাহেব সে লওলায়॥"

—শূন্য হইতেই সমস্ত উৎপন্ন এবং শূন্যেই তাহা আবার বিলীন হয়—দাদু সাহেব স্বীয় মনকে শিক্ষা দিতেছেন—মন! তুমি তোমার স্বাভাবিক অবস্থাতেই থাক—জগতের সকলই যে অস্থায়ী, ভাব যাহা অভাবও যে তাহাই—সকলই শূন্যময়।

মানুষের স্বভাবই যদি এই হইল, তখন তাহাকে বদ্ধ করিতে পারে কে? তাহার নির্ম্মল পরম-পদ্ম-রূপ চিত্ত ত "স্বভাবশুদ্ধ"—সরোরুহপাদ দোঁহা রচনা করিলেন—

"অদ্বয় চিত্ত তরুঅর হরউ তিহুঅনে বিস্থা।
করুণা ফুল্লিস্থ ফল ধরই, নামে পর উআর॥"

—অদ্বয়চিত্ত-তরুর অবস্থা ত্রিভুবন হরণ করে, তখন করুণার ফুল ফোটে এবং ফল ধরে, সে ফলের নাম পর-উপকার।

সরোরুহপাদের আরও একটি গান উদ্ধৃত হইল—'সরোরুহ' শব্দ বাংলায় 'সরহ' হইয়াছে, সরহ গাহিলেন—

"অপণে রচি রচি ভব নির্ব্বাণা, মিছেঁ লোঅ বান্ধাবএ আপনা॥ ধ্রু॥
অম্হে না জাঁণহু অচিন্ত জোই, জাম মরণ ভব কইসণ হোই॥
জইসো জাম মরণ বি তইসো, জীবন্তে মঅনেঁ নাহি বিশেষো॥
জাএথু জাম মরণ বিসঙ্কা, সো করউ রস রসাণেরে কথা॥
জে সচরাচর তিঅস ভমন্তি, তে অজরামর কম্‌পি ন হোন্তি॥
জামে কাম কি কামে জাম, সরহ ভণতি অচিন্ত সো ধাম॥"

—লোকে মিথ্যাই আপনার মনে মনে ভব ও নির্ব্বাণ রচনা করিয়া করিয়া আপনাকে বদ্ধ করিতেছে। যাঁহারা অচিন্ত্য-যোগী তাঁহারা জানিতে চাহেন না জন্ম, মরণ বা ভব কিরূপ; তাঁহাদের পক্ষে জন্মও যেমন মরণও তেমনি—জীবন্তে ও মরণে তাঁহাদের কাছে কিছুমাত্র বিশেষ

(প্রভেদ) নাই। যাহার এই ভবে জন্ম ও মরণের শঙ্কা আছে সেই রস ও রসায়নের চেষ্টা করুক। যে সকল যোগী সমস্ত চরাচরে ও স্বর্গে ভ্রমণ করে, তাহারা অজর এবং অমর কিছুই হইতে পারে না—সরহ বলেন, জন্ম হইতে কর্ম্ম হয়, কি কর্ম্ম হইতে জন্ম হয়, সে ধর্ম্ম স্থির করা সহজিয়া যোগীদিগের পক্ষে অচিন্ত্যনীয়।

পরকীয়া-বাদ সহজিয়া-ধর্ম্মের একটি সাধন-অঙ্গ, যথা—

"পরকীয়া ধন সকল প্রধান
ধতন করিয়া লই।
নৈষ্ঠিক হইয়া ভজন করিলে
পদ্ধতি সাধক হই॥"—ইত্যাদি।
—চণ্ডিদাস।

কালে কিন্তু সহজিয়াদিগের মধ্যে পরকীয়া-বাদ বিকৃত হইয়া যায়, তাই সহজিয়া 'গৌরদাস' পরকীয়া স্ত্রীসাধন বর্ণন করিয়া তাঁহার রচিত 'নিগূঢ়া প্রকাশাবলীতে' পদ রচনা করিলেন—

"মানুষের দেহ হয় নিত্য-বৃন্দাবন।
পুরুষ প্রকৃতি ইথে জানিহ কারণ॥"

—মধ্যযুগের বৌদ্ধধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত সংমিশ্রণের ফলেই এইরূপে সহজিয়া-পন্থ কলুষিত হয় ও সহজিয়া বৈরাগী সাজিয়া, প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া, পরকীয়া স্ত্রীসাধনে প্রবৃত্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সহজিয়া-ধর্ম্মের উক্তরূপে বিকৃত পরকীয়াবাদই সুসংস্কৃত করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মে গ্রহণ করেন।

সহজিয়া মত-সম্বলিত বহু গ্রন্থ প্রচলিত আছে ; 'জ্ঞানাদিসাধনা' তাহার মধ্যে একখানি সুপ্রাচীন গ্রন্থ। জ্ঞানাদিসাধনায় জীবের জন্ম

সম্বন্ধে বিবরণী আছে ও শ্রীগুরু শিষ্যকে "দেহের পৃথিবী আদি পঞ্চভূতের সহিত আত্মাচৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখায়া তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইয়া পরে নিত্য-শ্রীবৃন্দাবন এবং শ্রীবৃন্দাবন-সাধক-শিক্ষকরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণাদিকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ-দর্শন" সম্বন্ধে দুর্বোধ্য ভাষায় তত্ত্ব-কথা আছে। 'জ্ঞানাদি সাধন' ব্যতিরেকে, নরেশ্বর দাসের 'চম্পক-কলিকা', আকিঞ্চন দাসের 'বিবর্ত্ত-বিলাস', রাধাবল্লভ দাসের 'সহজতত্ত্ব', চৈতন্য দাসের 'রস-ভক্তি-চন্দ্রিকা', যুগলকিশোর দাসের 'প্রেম-বিলাস' ও 'রাধা-রস-কারিকা' প্রভৃতি গ্রন্থরাজিতে সহজিয়া পদের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি রচিত বহু পদাবলী এবং দাদুদয়াল রচিত 'বিশ্বাস কি অঙ্গ' এবং দোঁহাবলী প্রভৃতি অনেক সহজিয়া-পদ বিদ্যমান। কতিপয় মাত্র পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

সহজিয়া পন্থোক্ত পরকিয়াবাদের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া সাধক চণ্ডিদাস গাহিলেন—

'স্বরূপ'[১] বিহনে, রূপের জনম,
কখন নাহিক হয়।
অনুগত বিহনে, কার্য্য সিদ্ধি,
কেমনে সাধকে কয়॥
কেবা অনুগত, কাহার সহিত,
জানিব কেমনে শুনে।
মনে অনুগত, মঞ্জরী[২] সহিত
ভাবিয়া দেখহ মনে॥

১। জগৎস্বরূপ=প্রকৃতিপুরুষ, অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ। ২। শ্রীরাধার অষ্টসখী।

দুই চারি করি, আটটা আঁখর[১]—

তিনের[২] তিনের জনম তায়।

এগার আঁখরে,[৩] মূল বস্তু[৪] জানিলে,

একটি আঁখর[৫] হয়॥

চণ্ডিদাস কহে শুনহ মানুষ ভাই—

সবার উপরে, মানুষ সত্য,

তাহার উপরে নাই॥"

সহজ পীরিতি কেমন? সাধক চণ্ডিদাস গাহিলেন—

"নিজ দেহ দিয়া ভজিতে পারে। সহজ পীরিতি বলিব তারে॥

সহজে রসিক করয়ে প্রীত। রাগের ভজন এমন রীত॥

....

মরম না জানে ধরম বাখানে[৬]

এমনে আছয়ে যারা।

কায নাই সখি তাদের কথায়

বাহিরে রহুন তারা॥

(আমার) বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে

ভিতর দুয়ার খোলা।

(তোরা) নিসাড়[৭] হইয়া আয় না সজনি

আঁধার পেরিলে আলা॥

আলোর ভিতরে কালোটি[৮] আছে

চৌঙকি[৯] রয়েছে সেথা।

ও দেশের কথা এ দেশে কহিলে

লাগিবে মরমে ব্যথা॥

১। অষ্টসখী, যথা—ললিতা, বিশাখা, চম্পকলতা, চিত্রা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী, এই আট জন। ২। তিনটি অক্ষর, পী-রি-তি, প্রেম। ৩। দশ ইন্দ্রিয় ও মন, এই এগারটি। ৪। সেবা। ৫। 'ক', কৃষ্ণ। ৬। ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম জানে না, অথচ তাহার ব্যাখ্যা করিতে যায়। ৭। নীরব। ৮। কৃষ্ণ। ৯। পাহারা।

(তোরা) পরপতি[১০] সনে শয়নে স্বপনে
সদাই করিবি লেহা।[১১]
(তোরা) সিনান[১২] করিবি নীর না ছুঁইবি
ভাবিনী ভাবের দেহা ॥[১৩]
কহে চণ্ডিদাস এমতি হইলে
তবেত পীরিতি সাজে।
(তোরা) না হইবি সতী না হবি অসতী[১৪]
থাকিবি রমণী মাঝে ॥"

মানুষ কে? কোথায় তার বসতি? আর একটি সহজিয়া সাধক গাহিলেন—

"মানুষ মানুষ, সবাই বলএ,
মানুষ নিগূঢ় কথা।
কেমন মানুষ, কিবা প্রেমরস,
মানুষ বসতি কোথা ॥
পীরিতি সায়রে তাহার মাঝারে,
তাহার নিকটে সেই।
বসতি জানিয়া, মানুষ বসতি,
তবে সে পাইবে সেই ॥
বেদবিধি পার, বেভার আচার,
বেদ বিষ্ণু নাই জানে।
সকল জগত করে আনন্দিত
কবি বিদ্যাপতি[১৫] ভণে ॥"

১০। শ্রেষ্ঠপতি, ভগবান। ১১। প্রেম। ১২। স্নান। ১৩। চিন্ময় দেহ। ১৪। সতীত্বের দর্প ও অসতীর কলঙ্ক উভয়ই পরিহার করিবি। ১৫। ইনি সুবিখ্যাত মৈথিল্ কবি বিদ্যাপতি নহেন, ঐ নামধেয় জনৈক সাধক।

সহজিয়া পন্থের সহজ সাধন-রহস্যই বা কি? সহজিয়া সাধক মহাত্মা দাদুদয়ালজী ব্রহ্মানন্দে দোঁহা গান রচনা করিলেন—

"ভাই রে! এসা পংথ্[১] হমারা।
দ্বৈ পথরহিত[২] পংথ্ গহ পূরা, অবরন এক অধারা।
বাদ্ বিবাদ্ কাহুসেঁ[৩] নাহীঁ, মাঁহি,[৪] জগতেঁ ন্যারা[৫]॥
সম্‌দৃষ্টি সুভাই[৬] সহজমেঁ, আপহি আপ্ বিচারা।
মৈঁ, তৈঁ, মেরী যহ মতি নাহীঁ, নিরবৈরী নিরকারা॥
কাম কল্পনা কদে ন কীজে,[৭] পূরন্ ব্রহ্ম পিয়ারা।
এহি পংথ্ পহুঁচি পারগহি দাদু, সো তত্ সহজ সঁভারা[৮]॥"

৪। রাগাত্মিকা পদাবলী, ভাবাত্মিকা সঙ্গীত, দোঁহা, গান ও গীতিকা।

ভারতীয় ভাবদর্শনের প্রধান উপাদান ও উপকরণ হিসাবে আমরা পাই সংখ্যাতীত রাগাত্মিকা পদাবলী, অসংখ্য দোঁহা ও দোঁহা-কোষ, বহুবিধ কীর্ত্তন ও বাউল গান এবং বহু কবি, কবিওয়ালা, কথক ও সাধক মহাত্মা বিরচিত প্রাণ-মাতান দেহতত্ত্ব, মনঃশিক্ষা ও ভাবাত্মিকা সুমধুরসঙ্গীত, গাথা ও গীতিকা।

ভারতবর্ষে অনেকগুলি আজীবক ধর্ম্মমতও সুপ্রচলিত। [illegible] রামানুজ, রামাৎ, নিমাৎ, মধ্বাচারী, বল্লভাচারী ও গৌড়ীয় [illegible] বৈষ্ণব মত; নানক-পন্থ, কবীর-পন্থ, দাদু-পন্থ, [illegible]-পন্থ, [illegible]-পন্থ,

১। পন্থা। ২। অদ্বৈত। ৩। কাহারও সহিত। ৪। আমি। ৫। উদাসীন। ৬। শুভ। ৭। কখনও করিও না। ৮। বুঝিল। ৯। "ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়" দ্রষ্টব্য।

যামল ও ডামর-পন্থ প্রভৃতি। ইহা ব্যতিরেকে, অনেক প্রকার পূজা-পদ্ধতি ও পূজাগীতিকারও এদেশে প্রচলন ছিল, যথা—ত্রিনাথ (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের) পূজা ; ধর্ম্ম (ঠাকুরের) পূজা ও গীতি ; শিব, বার ও অষ্টক গীতিকা ; বিষহরির এবং চণ্ডীর গীতমুক্তাবলী ইত্যাদি।

উক্ত পূজা পদ্ধতি ও ধর্ম্মমত আশ্রয় করিয়া বহুবিধ দোঁহা, গীতিকা ও ভাবাত্মিকা গান পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল এবং এখনও তাহার কতকগুলি এদেশে বিদ্যমান রহিয়াছে। অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া উক্ত ধর্ম্মমত-গুলির বা পূজাবিধির বিবরণীর উল্লেখ না করিয়া, সেইগুলি আশ্রয় করিয়া সে সকল দোঁহা, গান বা গীতি বিরচিত হইয়াছিল—তাহাতে প্রকটিত ভাবদর্শনের আভাস দিবার উদ্দেশে, তাহার মধ্যে কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত হইল। বিশেষতঃ বাংলা দেশের নিরক্ষর গ্রাম্য-কবির খোলা-প্রাণের সরল আপন-ভোলা ভাবময়ী গীত-মাধুরীর ও সুললিত কীর্ত্তনের তুলনা বুঝি বা আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—বাংলা দেশের সারী-গান এবং বিশেষতঃ বাংলার কৃষক-সমাজে বিশেষভাবে আদৃত গুরুসত্য-গান বাংলা দেশের এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। গানগুলির সার্ব্বজনীন উন্নত-ভাব ও প্রাণ-মাতোয়ারা সুমিষ্ট সুর প্রকৃতই জগ-জন-মন হরণ করে। গানগুলি যেমন সরল, তেমনই নিষ্কাম ধরণের—কত শত নিরক্ষর অমার্জ্জিত-বুদ্ধি দেশবাসীর আধ্যাত্মিক উন্নতি যে উক্ত গানগুলিতে সংসাধিত হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না।

ভারতীয় রাগাত্মিকা পদাবলী ও ভাবাত্মিকা গীতাবলী যেমন প্রেম ও রসমাধুর্য্যে ভরপুর, তেমনই আধ্যাত্মিক তত্ত্বে ও দর্শন-সিদ্ধান্ত-পরিচয়ে ওতঃপ্রোতঃ—এমন সহজ, সরল, সুন্দর অনুভূতি বিশ্বসাহিত্যে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সত্যই মনে হয়, সকলগুলিরই প্রকৃত

আস্বাদ যেন না লইতে পারিলে ভারতীয় ভাবদর্শনের, তথা, মানবত দর্শনের, সম্যক পরিচয় লাভ করা একান্তই কঠিন।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীজয়দেব কবির 'গীতগোবিন্দের' মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলী এবং কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির বা রসশেখর চণ্ডিদাস ঠাকুরের রাগাত্মিকা মধুর হইতে সুমধুর পদ-কল্প-লহরী সাধারণ ও সুধীসমাজে সুপরিচিত বলিয়া একান্ত বাঞ্ছা থাকা সত্ত্বেও, বাহুল্য ভয়ে, সেগুলির উল্লেখ না করিয়া উল্লিখিত গীতি-পরিচয়ের সহায়ক স্বরূপে অন্যান্য পদকর্ত্তাদিগের ও গীত-রচয়িতাদিগের কয়েকটি মাত্র গীত উদ্ধৃত হইল। গানগুলি পাঠ করিলেই সেগুলির প্রকৃতি, পদবিন্যাস ও প্রাণস্পর্শী রসমাধুর্য্য এবং তাহাতে অভিব্যক্ত ভাবদর্শন-সিদ্ধান্তের কথঞ্চিত পরিচয় যে সহজেই পাওয়া যাইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

বাংলার 'ডাক' ডাক দিয়া তাঁহার অমর বচন রচনা করিলেন—

"ধর্ম্ম করিতে যবে[১] জানি। পোখরি[২] দিআ[৩] রাখিব পানি॥
গাছ রুইলে বড় কর্ম্ম। মণ্ডপ দেলে[৪] অশেষ ধর্ম্ম॥
অন্ন বিন্ন[৫] নাহি দান। ইহার পর ধর্ম্ম নাহি আন॥"

ধর্ম্ম-পূজার প্রবর্ত্তক 'রামাই পণ্ডিত' গান গাহিলেন—

"সবিনয় স্তুতি, সবিনয় স্তুতি,
করিয়ে প্রণতি অবনী লুটায় তন[৬]।
এ তিন ভুবনে কে চায় তোমার পানে,
তুমি দীননাথ ঘন॥[৭]

১। যে জন। ২। পুকুর। ৩। দিয়া, প্রতিষ্ঠা করিয়া। ৪। দিলে। ৫। ভিন্ন, বিনা। ৬। তনু। ৭। বুদ্ধ।

আদি অন্ত নাই, ভ্রমিয়ে গোঁসাঞ,
কর পদ নাস্তি কায়া।
নাহিক আকার, রূপ গুণ আর
কে জানে তোমারি মায়া॥
জন্ম জরা মৃত্যু, কেহ নহি সত্য,
যোগিগণ পরমাধ্যান।
শূন্য মূর্ত্তি দেবশূন্য (অমুক[১]) ধর্ম্মায় নমঃ॥"

সাধু 'তুলসীদাস' দোঁহা রচনা করিলেন—

"বাঁচিহো নেহি বেদ পুরাণ প্যঢ়ে। বাঁচিহো নেহি উচ্ উঠায়ে আটা॥
বাঁচিহো নেহি জঙ্গল্ বাস কিয়ে। বাঁচিহো নেহি শিষ্ পর্ রাখয়ে জটা॥
তুলসী দো দিন্ ঝল্‌মল্‌কে। নর্ নাহক্‌কে তুনে ঠাট্ ঠাঠা॥
ভাল্ চাহোত ভগবন্ত ভ্যজো। নেহি শিষ্ পর্ নাচৎ কাল ঘটা॥"

অর্থাৎ—

বেদ পুরাণ পড়েই শুধু
যায় না বাঁচা এ সংসারে।
যায় না বাঁচা শুধুই পাকা
ঘর কোঠা ও দালান ক'রে॥
যায় না বাঁচা কেবল শুধু
গহন বনেতে বাস ক'রে।
শিরে জটা রাখ্‌লে পরেই
যায় না বাঁচা এ সংসারে॥

তুলসী ভণে দু'দিন মানুষ—
জাঁক জমকে কাটায় রে।
রাখতে বাজায় ঠাট্ বাটই
মানুষ শুধু পাগল রে॥
নিজের শুভ ক'রতে সাধন
হরি-পদ মন ভজ রে।
রেখরে মনে সদাই সমন
ক'রচে যে শিরে নৃত্য রে॥

১। অমুক, অর্থাৎ—যে স্থানে যে ধর্ম্মরাজ বিরাজ করিতেছেন তাঁহার নাম।

প্রেমিকা 'মীরাবাঈ' গিরিধর গোপালজীউর শ্রীচরণ-সরোজে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়া ভজন গাহিলেন—

"মেরে তো গিরিধর্ গোপাল দুস্‌রা[১] ন কোই।
অংশুবন্ জলসিঞ্চি সিঞ্চি প্রেম বীজ বোই॥
যাকে[২] শির-ময়ূর-মুকুট মেরে পতি সোই॥
আই হৌ ভক্তি জানি, জগতে দেখ্ রোই।
তাত্ মাত ভাই বন্ধু আপনা ন কোই॥
সন্তন্ ঢিগ্[৩] বৈঠি বৈঠি লোক-লাজ খোই।
অব্‌তো[৪] বাত্ ফৈলি গই[৫] জানে সব কোই॥
ছোড়ি দই লোক-লাজ কহা করৈ গো কোই।
মীরা প্রভূ লগন লাগী হোনি হো সো হোই[৬]॥"

শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণাশ্রিত 'দাদূ দয়াল' দোঁহায় প্রাণের-নিশ্চয় ব্যক্ত করিলেন—

"বিপতি ভলা হরিনামসোঁ কায়া কসৌটী দুখ্।
রাম বিনা কিস্ কাম্‌কা দাদূ সংপতি সুখ্॥"

—হরিনাম গ্রহণে যদি বিপদ আসে তাহাও ভাল—দুঃখ আসিলেই দেহের পরীক্ষা হয়, দাদূ বলিতেছেন, আর রাম-নাম ব্যতীত যে সুখ-সম্পত্তি তাহাই বা কোন কাজের?

শ্রীরামচন্দ্রের একনিষ্ঠ ভক্ত 'কবীরজী' দুনিয়াদারির তামাসা দেখিয়া অতি বড় দুঃখে দোঁহা গাহিলেন—

ক। "বাম্‌হন্ টামন্ মূরখ্ ভ্যয়ে,[৭] শূদ্র পড়ে গীতা।
ঠগ্‌ঠগরবন্দ[৮] আচ্ছা খাওয়ে, দুখ্ পাওয়ে পণ্ডিতা॥

১। অন্য। ২। যাঁহার। ৩। সাধুদিগের নিকট। ৪। এখন ত। ৫। কথা প্রচার হইয়া গিয়াছে। ৬। হোনি…হোই—যাহা হইবার তাহা হইবে। ৭। হয়। ৮। জুয়াচোর।

সাঁচাকে[১] মারে লাঠা,[২] ঝুঠা জগৎ পিতায়[৩]।
গোরস্ গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠ্ বিকায়॥
সতীকো না মিলে ধোতি, গস্তান্ পহরে খাসা[৪]।
কহে কবীরা দেখ্ ভাই দুনিয়াকা তামাসা॥"

খ। "গাইয়া দোহকে কুত্তা পালে, উস্‌কা বাছরু ভুখা।
সালেকো উত্তম্ খিলায়, বাপ্ না পাওয়ে রুখা[৫]॥
ঘরকা বহুরী পিরীত না পাওয়ে, চিতচোরা সে দাসী।
ধন্ কলিযুগ তেরি তামাসা, দুখ্ লাগে আওর হাসি॥"

শ্রীরামনামের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া প্রেমিক ভক্ত কবীরজী গুহ্য সাধন-রহস্যও ব্যক্ত করিয়া মনের আনন্দে দোঁহা রচনা করিলেন—

ক। "নিগুর্ণ হ্যায়্ সো পিতা হামারা,
সগুণ হ্যায়্ সো মাতারি।
কাহে[৬] নিন্দো কাঁহে বন্দো,
দোনো পাল্লা ভারী॥"

খ। "বাগো[৭] না যারে না যা,
তেরা[৮] কায়ামে[৯] গুল্‌জার্[১০]।
সহস্র কমলপর্ বৈঠ্ কর্[১১]।
তুঁহু[১২] দেখ্ রূপ অপার্॥"

বাংলার কবি 'দীন ভূষণ' দেহতত্ত্বের গান ধরিলেন—

(আমার) সাধের জমী আবাদ হ'লো না—
আমার চাষা আমার হয়ে, ফসল বহাল কল্লে না।
(ওই) আশীলক্ষ বার ঘুরেছি,
(তবে) ভবের হাটে চোদ্দপোয়া জমী পেয়েছি—
(আমার) এ জমীর ভর্সা, হলো ফর্সা, আশা কেবল যন্ত্রণা॥

১। সৎলোককে, সাধুকে। ২। লাঠি। ৩। অসত্যেরই জয়-জয়কার। ৪। উপপত্নীরই পরণে সুন্দর সুন্দর পরিচ্ছদ। ৫। শুষ্ক রুটিও মিলে না। ৬। কাহাকেই বা। ৭। বাগানে, বাহিরের উদ্যানে। ৮। তোমার। ৯। দেহের ভিতরই। ১০। আলো করিয়া আছেন তোমার ইষ্টদেবতা। ১১। হৃদয়ের সহস্রদল পদ্মে বসিয়া। ১২। তুমি।

(এই) ফসল আসল নেবো ক'রে,
(তাই) মোক্ষ-ফলের বীজ নেছিলুম গুরুর পায় ধরে,
(আমার) সে ফল এখন বিফল হলো, সফল কর্ত্তেও পাল্লেম না।
ও দীন ভূষণে বলে, গুরু করুণা'নয়নে, দীনে চাও নিজ গুণে—
তোমার নামের জোরে, যাব তরে, ঘুচবে জীবের ভাবনা ॥"

আর একজন সাধক গ্রাম্য-কবির হৃদয়ে পরলোকের আহ্বান জাগিয়া উঠায় তিনি তান ধরিলেন—

"লা তো ডুইবল্ রে, কেত কাল রইথ্ ব্যান্ গুরু এ বারতে (ভারতে)।
(ওরে) কাউয়া কাণ্ডারী আইল রে, শগুণ আইল রে বাণ্ডারী,
(ওরে) বনের শিয়াল বলে রে—এই নায়ের অদিহারী।
থাকীর বানাইছে রে নৌহা, থাকীর দিছে রে ছাউনী ;
(ওরে) মোন পবনে চলেরে নৌহা, বাইচ দিতে মানা ॥"

—কবি বুঝিতে পারিয়াছেন, লা (জীবনতরী) তাঁর ডুবুডুবু—সংসার ছাড়িয়া যাইতে হইবে, কত কালই বা এ সোনার ভারতে গুরু কৃপায় থাকিতে পাইবে—যাইতে ত হইবেই, দেহতরী ডুবিবেই এবং এই অন্তিম দশার কথা মনে পড়ায়, কবি বলিতেছেন—তথত সে দেহতরীর কাক আসিবে কাণ্ডারী হইয়া, শকুনী হইবে ভাণ্ডারী, আর শৃগাল নাকি বলিবে, সেই সে দেহের অধিকারী—কি ভীষণ পরিণাম! এ দেহতরী মাটির তৈয়ারী, তার ছাউনীও মাটির দেওয়া, মন-পবনেই সে তরী চলে—জোর করিয়া তাহাকে চালান নিষেধ, জোরে চালাইলে বিপদের সম্ভাবনা—মাটির তৈয়ারী যে সে তরী। জীবনতরীর পালে মন-পবনের হাওয়া লাগিলেই তাহা উজান চলিবে, নহিলে সে তরী ডুবিবে, তাহা আর রক্ষা করা যাইবে না।

প্রাণের আবেগে ও প্রেমানুরাগে 'ঈশান ফকির' গুরু-সত্য গান গাহিলেন—

"আকুল দরিয়ায় পড়ে দয়াল আমি না জানি সাঁতার।
না জানি সাঁতার আমি না বুঝি ব্যাপার॥
কত ঢেউ কত তুফান উঠে দিবারাতি।
(আমি) একচক্ষে দেখে তাই করি যে বসতি॥
(দয়াল করি যে বসতি)
তোমারে দেখিব বলে পড়েছি পাথার।
(এবার) পড়েছি পাথার॥"—ইত্যাদি।

—এমন একাগ্রতা, এত তন্ময়তা, এ প্রকার সরল নির্ভরতা, সচরাচর কোথাও, কোন গানে কি দৃষ্ট হয়? এক চক্ষের দৃষ্টি যে আমাদের, তাই না এত ক্লেশ—তাই না আমাদের সংসারের এ হেন দারুণ মৃগ-তৃষ্ণিকা!

ঈশান ফকিরের আরও একটী গুরু-সত্য গান উদ্ধৃত হইল। ভগবানের অযাচিত অপার করুণা, গানের ভিতর দিয়া এমন সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়া মন-প্রাণ যে এত আকুল, উদ্বেলিত করিয়া দিতে পারে, তাহা যেন কল্পনারও অতীত, গানটি এই—

"আকাশের গায়ে আলো ফুটেছে এবার দয়াল
ফুটেছে আঁখির।
(আমি) প্রভাতে জাগিয়া দেখি দয়াল (আমার) সম্মুখে জাহির,
(রে) সম্মুখে জাহির॥
ফুল ঝরে পাখী উড়ে, পাতার শিশির
গর্জেরে রোদের তাপে আলোক নিশির,
(দয়াল) আলোক শশীর।
তাই ভেবে কান্দে ঈশান যাতনা গভীর,
(বড়) যাতনা গভীর॥"

বাউল 'কানাই গোঁসাই' মনের-মানুষ অন্বেষণে তাঁহার একতারায় তান ধরিলেন—

"আপন মনের মানুষ মনে রেখ যতনে।
দিয়ে দর্পণে পারা, ঠিক রেখ নয়নী তারা।
প্রেমরসে অঞ্জন করা, আপনি লাগিবে নয়নে॥
মনের মানুষ মন ছাড়া আর ক'রো না,
কলে বলে ষোল আনা হিসাবের ঘরেতে উশুল তোল না।
বোম্বেটে ব'সে আছে ছয় জনা—
প্রাপ্তধন গেলে হেরে, ভাসবি আকুল পাথারে,
সাথি সব যাবে দুরে, কাঁদতে হ'বে নির্জ্জনে॥
খুটো ধরে বসে আছে যে জনা, তাঁর ঘা লাগে না গায়—
কত তুফান বয়ে যায়, তেমনি ধারা হ'লে হয় তা'র সাধনা।
অনুভবে বুঝলাম তার উপমা—
যেমন চুনে হলুদ্ দিলে পরে, দুই রং যায় আপনি সরে,
শেষ কালে লাল রং ধরে, ঠাউরে দেখ যতনে॥
মানুষেরি সঙ্গ নেরে, আমার মন,
যে ধন চাবি সেই ধন পাবি, কতক দিন তুই বসে খাবি।
ফুরাবার ধন নয় রে অমূল্যধন—
গোঁসাই কানাইলাল কয়, গেল বেলা, ভাঙ্গল রে আসকের খেলা,
ভব সাগরে দিইগে ভেলা, কাজকি থেকে এখানে॥"

একজন নিরক্ষর গ্রাম্য কবি মানুষের বড়াই-করা বিদ্যা-বুদ্ধির উপর কটাক্ষ করিয়া, মানব-জীবন ও বিশ্বসৃষ্টির বৈচিত্র্যময় ঘটনাবলী বিষয়ক একটি শাশ্বত প্রশ্ন তুলিলেন এবং তাহারই উত্তর হিসাবে গাহিলেন—

"আগমের ভেদ তোমরা জান পণ্ডিত।
মরণের ভেদ তোমরা জান পণ্ডিত॥

বারুই[১] গিয়ে গাছ কোঁদাতে বারুইরে কোঁদায় গাছে।
দাঁয়বা[২] ছিড়ি দড়ি ধাইল, জাল্যারে [৩] দৌড়ায় মাছে॥
জেম[৪] পহর [৫]ধান হয়াত[৬] দিল।
পাতিলাত্[৭] দিল বাড়া[৮] মাদার গাছে [৯]॥
ধরিয়াছে আঠ্যা কলার [১০] ছড়া আঁআঁসত্[১১]।
পাঁআস [১২]নিল পাঁআস রৈল ডালে॥
তিন গরু দি[১৩]নয় হাল চয়[১৪]।
ছিবায়[১৫] মানুষ গিলে॥"

বাংলার বিখ্যাত সারি-গান রচনা করিয়া কবি গীত গাহিলেন—

"আগম নিগম হদিশ কোরাণ পয়দা যার হাতে।
জনম ফৌত আস্‌মান পানি যে দেহ দুনিয়াতে॥
ইমাম্ হোসেন হজরতের পোতা[১৬] সহিদ্ কারবালাতে
রামের সীতা চুরি গেল অশোকের বনেতে॥
হায় রে হায় এসব খেলা যে খেলেরে ভাই।
লোকে তারে বলে আল্লা হরি কৃষ্ণ সাঁই॥"

কোন প্রেমিক গোঁসাই আর একটি সারি-গান গাহিলেন—

"তুই যাইস্ না রে মনপাহী তুই ফিরা্যা আয়।
(ওরে) হামহক[১৭] নামে পাহী আমার আয় রে ইদির পিঞ্জিরায়[১৮]॥
আমার হিদ্‌পিঞ্জিরায় বৈস্যা পাহী কিষ্ট নাম হুনাইয়া[১৯] কর সুখী
প্রেমে অঙ্গ জরজর, হীতল[২০] কর মহুরায়[২১]॥

১। ছুতার মিস্ত্রী। ২। গরু বাঁধিবার খোঁটা। ৩। জেলেকে। ৪। চাষী কমিয়ারা জাতি। ৫। পাহাড়। ৬। শুকাইত। ৭। হাঁড়ি। ৮। ধানভাঙ্গা ৯। কোন কাজের গাছ নয়। ১০। বীচে কলার। ১১। আকাশেতে। ১২। পাঁস, ছাই। ১৩। দিয়া। ১৪। চষে। ১৫। ছিপে। ১৬। পুত্র। ১৭। শ্যাম-শুক ১৮। [illegible]

গোঁসাই কইছেন দররে[১] জালে পালা পাহী উইর‍্যা গেল।
বনের পাহী বনে গেলে আরনি তারে দরা[২] যায়॥"

সমছদ্দি ছিদ্দিকী একজন মুসলমান সাধক, তাঁহার রচিত "ভাব-লাভ" একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। সাধক ছিদ্দিকী সাহেবের রচিত অনেক মনঃশিক্ষা ভজন-গানও বিদ্যমান; তিনি 'ভাব-পদার্থ' যে কি, তাহাই বর্ণন করিতেছেন—

"ভব-নদি পার হতে ভাবের ভাবি নৈলে নারে।
তরিতে তরাইতে তারক বিনা কেবা পারে।
ভাবের ভাবি তারে বলি—ফুটলে পরে কমল কলি—
প্রেম মধুর হএ অলি—জে জন বসে গ্রহণ করে॥
কমল কলি কোথায় আছে—দেখনারে মন আপনার কাছে—
কায়ার ভিতর হৃদয় আছে—প্রেমের কমল বলি তারে।
সমছদ্দি ছিদ্দিকী ভনে—গুরুর চরণ ধরণ বিনে—
একথাকে বুজিতে জানে—হেন শক্তি কাহার॥"

ভাবের আবেগে শ্রীকৃষ্ণনামামৃতে 'মগন' হইয়া শ্রীগোবিন্দের রাতুল চরণযুগলে শরণ লইয়া, ভক্ত কবি সুরদাস নন্দদুলালের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গাহিলেন—

"হে গোবিন্দ রাখু শরণ অবধ জীবন হারে॥ ধ্রু॥
নীর পিবন[৩] হেতু গেয় সিন্ধুকো কিনারে
সিন্ধু বীচ[৪] বসত গ্রাহ[৫] চরণ ধরি পছারে॥
চার পহর যুধ[৬] ভয়ো লে গেয় মাঝধারে
নাক কাণ ডুবন্ লাগে কৃষ্ণকে ফুকারে[৭]॥

১। ধররে। ২। ধরা। ৩। জল খাইতে গজরাজ গিয়াছিল (দ্বাপর যুগের কথা) ৪। মধ্যে ৫। একটি কুমীর বাস করিত। ৬। যুদ্ধ। ৭। ডাকিল।

দ্বারকাসে চলে গোপাল গরুড়কে অভিসারে
গ্রাহক অরি মাধব গজরাজকে উধারে[১] ॥
সুরদাস মগনভয় নন্দকে দুলারে
তেরো মেরো না ডর্ যমরাজকে দুয়ারে ॥"

কানু ফকির একজন বাঙ্গালী মুসলমান সাধক, তাঁহার অপর নাম অলিরাজা। "জ্ঞানসাগর", তাঁহার রচিত একখানি যোগ-শাস্ত্রীয় গ্রন্থ; এই ভাবাত্মিকা জ্ঞানসাগরের অমিয়-লহর তুল্য মধুর আগম-কথা পড়িলে অনেক দার্শনিকের যে তত্ত্ব-মীমাংসা সংসাধিত হইবে তাহাতে কোনই ভুল নাই। অলিরাজা বা কানু ফকির আবার 'মুরলীধারীর' সম্বন্ধে গান ধরিলেন—

"বনমালী শ্যাম তোমার মুরলী জগ-প্রাণ ॥ ধ্রু ॥
শুনি মুরলীর ধ্বনি ভ্রম যায় দেব মুনি
ত্রিভুবন হএ[২] জরজর।
কুলবতী যত নারী গৃহ-বাস দিল ছাড়ি
শুনিয়া দারুণ বংশীস্বর ॥
জাতি ধর্ম্ম কুল নীতি তেজি বন্ধু-সব পতি
নিত্য শুনে মুরলীর গীত।
বংশী হেন শক্তি ধরে তনু রাখি প্রাণী হরে
বংশী-মূলে জগতের চিত ॥
যে শুনে তোমার বংশী সে বড় দেবের অংশী
প্রচারি করিতে বসি ভয়।
গৃহ-বাস কিবা সাধ বংশী মোর প্রাণ-নাথ
গুরু-পদে অলিরাজা কয় ॥"

বাঙ্গালী সাধক জগৎ-স্বামী সৎ-চিৎ-আনন্দময় করুণাশেখর পুরুষোত্তম দেবকে অর্চ্চনা করিয়া স্তব গাহিলেন—

"ওঁ হরি ওঁ, ওঁ তৎ সৎ ॥

তুমি হে দেবেশ পরম পুরুষ, ত্রিগুণেতে ব্যাপ্ত আছ ত্রিজগৎ।

ওঁ হরি ওঁ, ওঁ তৎ সৎ ॥

সন্ধ্যা পূজা বন্দনা, সকলই তোমার উপাসনা।

এ মহান বিশ্ব সুন্দর দৃশ্য, তুমিই ত করেছ রচনা ॥

গঙ্গা ভাগীরথী সপ্ত সমুদ্র, ব্রহ্ম পুরন্দর তুমি হে রুদ্র।

তোমাতে সঙ্কল্প তুমি আদি কল্প, তোমাতেই হয় সব অচ্ছেদ্যবৎ ॥

(আছ) তন্ত্রে মন্ত্রে গীতা ভাগবতে, বায়ুরূপে আছ তুমি জীবন দেহেতে।

উর্দ্ধে গগনে তারকা তপনে, চন্দ্র কিরণে তুমি আছ জ্যোতিবৎ ॥

বিন্ধ্য নীলগিরি সুমেরু ধবল, মন্দার গিরিরাজ তুমি হিমাচল।

তুমি বিশ্বব্যাপী তুমি বহুরূপী, তোমাকেই করি প্রভু দণ্ডবৎ ॥

ওঁ হরি ওঁ, ওঁ তৎ সৎ ॥"

৫। তান্ত্রিক সাধকবৃন্দ ও শ্যামা মায়ের গান।

তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে সাধারণতঃ আমরা একটা বিকৃত ধারণাই পোষণ করিয়া থাকি। সেগুলি যেন সভ্যসমাজের পাঠোপযোগী নহে; সেগুলিতে বর্ণিত সাধনতত্ত্ব কেমন যেন অসভ্যধরণের; সেগুলির গুহ্য উপাসনা প্রণালী তেমন বুঝি সুবিধাজনক নহে—এমনই যত সব আজগুবি ধারণা। অবশ্য কতকগুলি তন্ত্র-গ্রন্থে নানাবিধ বীভৎস প্রক্রিয়ার উল্লেখ যে নাই এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কিন্তু তেমন তন্ত্র-গ্রন্থের প্রায় সকলগুলিই সংগ্রহ পুস্তক; মূল তন্ত্র-গ্রন্থে আদৌ সে সব প্রক্রিয়ার উল্লেখ নাই—আর মূল তন্ত্র-গ্রন্থ তেমন পাওয়া যায় না বলিলেও হয়। তন্ত্র বলিতে অনেক কিছুই বুঝায়; বৌদ্ধদিগের মহাযান, সহজযান, কালচক্রযান ও বজ্রযান

প্রভৃতি বিবিধ সাধন-পন্থার বা 'যানের' বইগুলিকে তন্ত্র বলে ; নাথ-পন্থের সকল পুস্তকই তন্ত্র ; শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের পুস্তকগুলি সবই তন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ—এমন কি বৈষ্ণবদিগেরও কতিপয় তন্ত্র আছে। বস্তুতঃ, ধর্ম্ম বিষয়ক সাধন-পন্থা ও জ্ঞান-বচন বা দর্শন-সিদ্ধান্ত যাহাতে বর্ণিত আছে তাহাই সাধারণ ভাবে তন্ত্র-গ্রন্থ বলিয়া প্রচলিত। বিশিষ্ট সাধন-প্রক্রিয়া বা কোন গুহ্য উপাসনা-পদ্ধতিই যে তন্ত্র, এরূপ ভ্রান্ত ধারণা লইয়া ভয় পাইবার কোনই কারণ নাই।

তন্ত্রোক্তি সমূহ, হয় বুদ্ধ ভগবানের শ্রীমুখ-বিনিস্থত, না হয় হর-পার্ব্বতী সংবাদ হিসাবে কৈলাস হইতে অবতারিত, এইরূপ বর্ণনাই পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন তন্ত্রে (অবশ্য সংগ্রহ-তন্ত্রে) ইহাও আবার উক্ত হইয়াছে, বেদ পাঠে কিছুই ফলোদয় হয় না বলিয়াই সে সকল তন্ত্রের উৎপত্তি ; কোনও তন্ত্রে আবার উক্ত হইয়াছে, অথর্ব্ববেদই সেগুলির মূল। যেরূপ ভাবেই উৎপন্ন, ব্যক্ত বা অবতারিত হউক না কেন, বেশীর ভাগ তন্ত্রোক্ত-তত্ত্বই সাধারণ ভাবে বেদবিধি হইতে সম্পূর্ণই বিভিন্ন ধরণের ; বৈদিক আচার ও বৈদিক দর্শনের সঙ্গে তাহার যেন তেমন কোন প্রত্যক্ষ যোগসূত্র পাওয়া যায় না। সকল তান্ত্রিক-সাধকেরই কিন্তু উপাস্য পরা-প্রকৃতি দেবী ভগবতী বিশ্বপ্রসূতি মহামায়া আদ্যাশক্তি। তিনি কেমন? সেই মহাশক্তি সৃষ্টি-প্রসবিণীর স্বরূপ কি? দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষি 'মেধস' কহিলেন—

"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।"

—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১ম মহাত্ম্য, ৪৭শ শ্লোক।

—সে জগন্মূর্ত্তি নিত্য, সমস্ত চরাচর বিশ্ব তাঁহাতেই ব্যাপ্ত রহিয়াছে। উক্ত কারণেই মার্কণ্ডেয় পুরাণে ধৃত সপ্তশতী চণ্ডীর একাদশ মাহাত্ম্যে প্রকটিত হইল—অসুরেন্দ্র শুম্ভ নিহত হইলে পর, ইষ্ট লাভে হর্ষান্বিত হইয়া

দেবতাগণ আত্মাশক্তি কাত্যায়নীকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া তাঁহার স্তুতি গাহিলেন—

"বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ—
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ ॥"

—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১শ মাহাত্ম্য, ৫ম শ্লোক।

—হে দেবি! সমস্ত বিদ্যা তোমারই বিভিন্ন রূপ, জগতের স্ত্রীজাতি তোমারই অংশ, তুমি একাই জগৎব্যাপ্ত, তোমা ভিন্ন আর অন্য কিছুই ত নাই—তোমার স্তব সবই অত্যুক্তি মাত্র।

—এ চরাচর বিশ্বের তুমি ঈশ্বরী, তুমিই জগতাধার—মহীরূপে ও জলরূপে অবস্থিত হইয়া, তুমিই এ বিশ্ব-সংসার তোমার অলঙ্ঘ্য-বীর্য্যে আপ্যায়িত করিতেছ—তাই সমবেত দেবকণ্ঠে গীত ধ্বনিত হইল—

"বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপে
ষ্বাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।
মমত্ব গর্ত্তেঽতিমোহান্ধকারে
বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্ ॥"

—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১শ মঃ ৩০শ শ্লোক।

—"শাস্ত্রে ও বিদ্যায় আত্মজ্ঞান দীপে,
বাক্যেতেও অন্য আছে কেবা আর?
মমতা গুহায়, মোহ অন্ধকারে,
ঘুরাইছ অতি এ বিশ্ব সংসার।"

—"মার্কণ্ডেয় চণ্ডী", নবীনচন্দ্র সেন।

—হে বিশ্বের পরমাশক্তি! বিশ্ব-ঈশ্বরের বন্দনীয়া, সর্ব্বার্থসাধিকে শিবে! হে সর্ব্বমঙ্গলাধার নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার—

"ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্নাঃ ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥"

—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১শ মঃ, ৪র্থ শ্লোক।

—"তুমি হে বৈষ্ণবী শক্তি অনন্ত বীর্য্যশালিনী,
মায়া বিশ্ববীজ সনাতন,
সকলি মোহিত দেবি! তোমা হতে তব কৃপা!
জগতের মুক্তির কারণ।

—"মার্কণ্ডেয় চণ্ডী", নবীনচন্দ্র সেন।

অতি উচ্চাঙ্গের এ হেন দর্শন-সিদ্ধান্ত-মূলক তন্ত্রগুলি আবার যখন কালবশে বিকৃত হইল তখন এই বাংলাদেশের বহু সমাজনীতিকুশল তন্ত্র-সংগ্রাহক পণ্ডিত ও সাধক সেগুলিকে বিশেষ ভাবে আবার মার্জ্জিত করিয়া তৎকালীন সমাজের উপযোগী করিয়া বহু ব্যক্তিকে ও বিশেষ করিয়া আফগান্ মুসলমানদিগের ভীষণ অত্যাচারের ফলে বিধ্বস্ত বাংলাদেশের হতাবশিষ্ট বহু বৌদ্ধদিগকে তান্ত্রিক উপাসনায় দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

উক্ত তন্ত্র সংগ্রাহক ও দূরদর্শি তান্ত্রিকগণের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন গৌড়ীয় শঙ্করাচার্য্য। তাঁহার রচিত বহু বিশুদ্ধ সংস্কৃতে লেখা স্তব-কবচ অদ্বৈতবাদী শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের রচিত বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। গৌড়ীয় শঙ্করাচার্য্যের ন্যায়, ত্রিপুরানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও তাঁহার শিষ্য পূর্ণানন্দ, আগমবাগীশ প্রভৃতি বহু বাঙ্গালী তান্ত্রিক-সাধক সে সময়ে দেশের প্রভূত কল্যাণ সংসাধিত করিয়াছিলেন।

তান্ত্রিক সাধকবৃন্দের অপূর্ব্ব অবদান, তাঁহাদের বিরচিত শ্যামাবিষয়ক গানগুলিও বাংলাদেশের এক বিশিষ্ট সম্পদ—রামপ্রসাদ, দেওয়ান রামদুলাল, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকবৃন্দের ভাবাত্মিকা শ্যামামায়ের গান কাহার না হৃদয়তন্ত্রী স্পর্শ করে? শাক্ত ও বৈষ্ণব নির্ব্বিশেষে সকল বাঙ্গালীকেই উক্ত সাধন-সঙ্গীতগুলিতে পরিস্ফুট ভাবদর্শনে তন্ময় করিয়া দেয়—মাতাইয়া তুলে।

উদাহরণ স্বরূপে কয়েকটিমাত্র শ্যামা-সঙ্গীত উদ্ধৃত হইল। সাধক রামপ্রসাদ সেন গাহিলেন।

"এবার আমি ভাল ভেবেছি। এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি॥
যে দেশে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমার কিবা দিবা, কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি॥
ঘুম ছুটেছে, আর কি ঘুমোই, যুগে যুগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোনাকে রং ধরায়েছি।
মণি মন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি॥
প্রসাদ বলে ভুক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি॥
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব ছেড়েছি॥"

'কালীর-বেটা' সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য মনের আনন্দে তান ধরিলেন—

" কালী সব ঘুচালি লেঠা।
শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন, রাখবি কিনা রাখবি সেটা॥
তোমার যারে কৃপা হয়, তার সৃষ্টি-ছাড়া রূপের ছটা।
তার কটিতে কপ্নী যোড়ে না, গায়ে ছাই আর মাথায় জটা॥
শ্মশান পেলে সুখে ভাসে, তুচ্ছ-বাসে মণিকোটা।
আপনি যেমন ঠাকুর তেমন, ঘুচল না তার সিদ্ধি ঘোঁটা॥
দুখে রাখ আর সুখে রাখ, করিব কি আর দিয়া খোঁটা।
আমি দাগ দিয়ে পেয়েছি আর কি পুঁছতে পারি সাধের কোঁটা॥

জগত যুড়ে নাম দিয়েছ, কমলা কালীর বেটা।
এখন মায়ে পোয়ে যেমন ব্যবহার, ইহার মর্ম্ম বুঝবে কেটা॥"

জনৈক সাধক মা তারিণী ব্রহ্মময়ীর শ্রীচরণ-কারাগারে স্বীয় বিদ্রোহী মনকে বন্দী রাখিয়া গাহিলেন—

"মন, সাধু জেইনে ছিলাম তোরে। এ কি করিলি আর, এ কি ব্যবহার॥
যে কর্ম্ম তোমার জানাব কাহারে।
আশ্বাসে বিশ্বাস জন্মাইয়ে আমারে, মহাজ্ঞান-ধন করিলি অধিকার—
শেষে ভুলাইলে কালীর নাম আমার, এ দেহ ভাণ্ডার অর্পিলে শত্রুরে।
জ্ঞান-মাজিষ্ট্রেরে দরখাস্ত করিব, ব্রহ্মময়ীর পাশে যাইতে তোরে নিব,
তিনটি কাল তোমায় আবদ্ধ রাখিব— তারিণীর শ্রীচরণ-কারাগারে॥"

মুসলমান তান্ত্রিক সাধক মির্জ্জা হুসেন আলী মায়ের আবাহন করিয়া গীতি রচনা করিলেন—

"যা রে শমন এবার ফিরি।
এস মা মোর আঙ্গিনাতে দোহাই লাগে ত্রিপুরারী॥
যদি কর জোর জবরি, সামনে আছে জজ কাছারি।
আইনের মত রসিদ দিব, জামিন দিব ত্রিপুরারী॥
আমি তোমার কি ধার ধারি, শ্যামা মায়ের খাস তালুকে বসত করি।
বলে মৃজা হুসেন আলি, যা করে মা জয় কালী—
পুণ্যের ঘরে শূন্য দিয়ে, পাপ নিয়ে যাও নিলাম করি॥"

মাতৃ-সুধা-রস-পানে বিভোর একজন সাধক প্রাণের আবেগে 'মনঃ-শিক্ষা' গান গাহিলেন—

"মন তোমার এই ভ্রম গেল না;
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না।
(ওরে) ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তাই জান না?
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোনা,

(ওরে) কোন লাজে সাজাতে চাস্ তায় দিয়ে ছার ডাকের গহনা ?
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা,
(ওরে) কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস্ তায় আলো চাল আর বুট ভিজানা ?
জগৎকে পাল্‌ছেন যে মা তাও কি জানিস্ না,
(ওরে) কেমনে দিতে চাস্ বলি, মেষ, মহিষ আর ছাগল ছানা ?"

সাধক দ্বিজ রামধন অপার আশায় শিব ও শক্তি একাধারে দেখিতে বাসনা করিয়া তান্ত্রিক সাধন-যোগের মূলতত্ত্ব ব্যক্ত করিয়া গাহিলেন—

"জাগ কুলকুণ্ডলিনী, প্রসুপ্ত ভুজগকায়া, আধার পদ্মবাসিনী ॥
গচ্ছ সুষুম্না পথ, স্বাধিষ্ঠানে হও উদিত, মণিপুর অনাহত, বিশুদ্ধাজ্ঞা সিঞ্চারিণী ॥
ত্রিকোণে জ্বলে কৃশানু, তাপিত হইল তনু, মূলাধার আর্য্যশিরে, স্বয়ম্ভু শিব-বেষ্টিনী ॥
শিরস্থ সহস্র দলে, পরম শিবেতে মিলে, ক্রীড়া কর কুতূহলে, সচ্চিদানন্দদায়িনী ॥
দ্বিজ রামধন মাগে যোগাসনেতে যোগে, পরম-শিবের সহিতে তোমায় হেরিব তারিণী ॥

—ভক্তের ইচ্ছাই পূর্ণ হইল ; সাধক শিরোমণি দ্বিজ যদুনাথ কস্তুরী চুয়া-চন্দনাদি বিভূষিত অতুল ঐশ্বর্য্যময়ী গিরিরাজ-কন্যা উমামায়ে ও ত্রিজগৎপিতা ভস্ম-বিভূতি-মাখা ভিখারী ভোলানাথের মিলিততনু হর-গৌরী মূর্ত্তি সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া 'কর্ণাট্ রাগে' প্রাণের আনন্দে গাহিলেন—

"আজি কি পেখনু[১] সমন্বিত হরগৌরী । সফল ভায়ো[২] রে নঞান-যুগ[৩] মেরি[৪] ॥
চাঁচর বেণী বিরাজিত কাঁহু[৫] । কাঁহু পর লম্বিত বিনোদ জ`রাউ[৬] ॥
পারিজাত মালা গলে গিরিবালা । গিরিগণ্ডে দোলত সেহিতাক্ষমালা ॥
মলয়জ পঙ্ক প্রলেপ অঙ্গ চারু । চিতা ধূলি ভূষণ ত্রিজগত গুরু ॥

১। দেখিনু। ২। হইল। ৩। নয়ন যুগল। ৪। আমার। ৫। কাহার বা। ৬। জটাজাল।

লোহি লোহিতাম্বর অরুণ জিনি সোহা[১]। বাঘাম্বর কাহ্নু দনুজ দল মোহা॥
হরগৌরী নিরখে[২] গৌরী সারং লোকাইও। যদুনাথ উভয় চরণ বলি যাইও॥”[৩]

॥ নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥

৬। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও কীর্ত্তন গান।

বাংলার আফ্‌গান্ অভিজান সমগ্র বাংলা দেশকে যে শ্মশানে পরিণত করিয়াছিল তাহা ঐতিহাসিক মাত্রেই অবগত আছেন। বাংলার যাহা কিছু গৌরবের বস্তু ছিল, প্রায় সমস্তই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল—বাঙ্গালীর শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম্ম, জাতীয়তা, শিল্প ও বাণিজ্য সবই ভাসিয়া গিয়াছিল—বাংলা দেশের দেবমূর্ত্তি ও পীঠস্থান, মন্দির ও বিহার, পুঁথি ও পত্র সবই এক প্রকার নিঃশেষে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, উক্ত আফ্‌গান্ আক্রমণের ফলে। অনেক বাঙ্গালী বৌদ্ধ শ্রমণকে সিপাই বলিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া আফ্‌গান্ মুসলমানেরা নৃসংশভাবে হত্যা করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ মত নষ্টপ্রায় করিয়া দিয়াছিল। এই হতাবশিষ্ট এবং আতঙ্ক-ক্লিষ্ট বৌদ্ধদিগকে পুনরায় সনাতন হিন্দুধর্ম্মে প্রধানত দীক্ষিত করিয়াছিলেন গৌড়ীয় শঙ্কর, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ, আগমবাগীশ প্রভৃতি বাংলার স্মার্ত্ত পঞ্চোপাসক শাক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত তান্ত্রিকগণ।

কাল-প্রবাহে আবার যখন তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতির মধ্যেও নানাবিধ জঘন্য ও বিকৃত প্রক্রিয়া প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় পবিত্র তান্ত্রিক অনুষ্ঠানরাজি বহুল পরিমাণে অঙ্গবৈগুণ্য দোষে দূষিত ও বিভৎস হইয়া উঠিল, যখন তন্ত্রানভিজ্ঞ ও সাধনায় অধঃপতিত কাপালিক প্রভৃতি সম্প্রদায়দিগের দ্বারা তন্ত্র-সাধন-ক্রম মাত্র বিকৃত চক্রানুষ্ঠান, কারণ-সেবন ও নরবলী প্রদানে

১। সোভা। ২। নিরখিয়া, দেখে—দর্শন করিয়া। ৩। দ্বিজ কমললোচনের “চণ্ডিকা-বিজয়” দ্রষ্টব্য।

পর্য্যবসিত হইল—বাঙ্গালীর বিশৃঙ্খল জীবন-সাধনার এমনই ঘোরতর দুর্দ্দিনে, শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ও অসংখ্য বৈষ্ণব-পদকর্ত্তাদিগের রচিত পদাবলী ও কীর্ত্তন গানের মাহাত্ম্যে উদ্বোধিত হইয়া বাঙ্গালী আবার নবচেতনা লাভ করিল। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রবর্ত্তিত প্রেম-ভক্তি-মূলক রাগাত্মিকা বৈষ্ণব ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবতারণা করিয়া, ভারতীয় 'ভাবদর্শনের' তথা 'মানবত-দর্শনের' একটি বিশিষ্ট আলেখ্য প্রদর্শনে প্রয়াস করা যাইবে; ভক্ত মহাত্মাদিগের কৃপাই আমাদিগের একমাত্র সহায়।

শ্রীমৎচৈতন্যদেব একটি গৌড়ীয় সম্প্রদায় গঠন করিয়া তাঁহার প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূলমন্ত্র হিসাবে—

"জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন"

—এই ত্রিবিধ সাধন-পন্থার নির্দ্দেশ দিয়া এক অপূর্ব্ব প্রেমধর্ম্ম প্রচার করেন ও চতুঃষষ্টি-অঙ্গ সাধন-ভক্তির মধ্যে অধিক প্রভাবশালী পাঁচটি প্রধান অঙ্গের প্রতি বিশেষভাবে নিষ্ঠা রাখিতে উপদেশ দিয়া বলিলেন—

"সাধু সঙ্গ, নাম কীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণ প্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥
এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈলে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ[১]॥"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রবর্ত্তিত এই ভাবাত্মিকা প্রেমধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গেসঙ্গেই অধ্যাত্ম-জগতে এক অভিনব পরিস্থিতির সূচনা হইল, বাংলায় প্লাবন

১। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যখণ্ড, 'অভিধেয় ভক্তিতত্ত্ব বিচার' প্রকরণ—২২শ পঃ।

আসিল,—স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঙ্গালী আবার বাঁচিয়া উঠিল ; প্রেমের জোয়ারে 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়'—এমনই বিচিত্র প্রাণ-মাতান স্রোতে, 'নিমাই পণ্ডিত' বাংলা দেশকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে আত্মহারা হইয়া শ্রীগৌররায় আকুল আবেগে, কীর্ত্তনের মূর্চ্ছনায়, দেশ মুখরিত করিয়া গাহিলেন—

"তুয়া পদ মন লাগুহুঁ রে।
শারঙ্গধর ! তুয়া চরণে মন লাগুহুঁ রে॥"

তাঁহার নিজ পরিকরেরা সকলেই পণ্ডিত ও সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন—শ্রীরূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী প্রভৃতি ছয় গোস্বামী, তাঁহার অভেদ-আত্মা শ্রীনিতাইচাঁদ এবং পরম ভাগবত শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, গদাধর, শ্রীবাস, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট, স্বরূপ, রামানন্দ, মুরারী গুপ্ত প্রভৃতি সকলেই প্রেমধর্ম্ম প্রচারে শ্রীচৈতন্যদেবের সহায়ক হইলেন। তাহার পরবর্ত্তিকালে আবির্ভূত বৈষ্ণবসাধক ও পদকর্ত্তাদিগের ত আর কথাই নাই—গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, বলরাম দাস, ঘনশ্যাম দাস, বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, নিত্যানন্দ দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, 'নরোত্তম দাস, বৈষ্ণবদাস—কত নাম করিব। সুমধুর পদাবলী ও মর্ম্মস্পর্শী কীর্ত্তন গানে সমগ্র বঙ্গদেশ প্রেম-ধর্ম্মে প্লাবিত হইয়া গেল ; অনেকেই এই সার্ব্বভৌমিক প্রেমধর্ম্ম আশ্রয় করিল—ভক্তি ও প্রেমের ঐশি শক্তিতে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি পুনরায় প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল—সম্পূর্ণরূপে নবীন এক 'ভাবদর্শনের' তত্ত্বা-স্বাদনে বিভোর হইয়া বাঙ্গালী জাতি দেশে দেশে তাহাদের নূতন জীবন-বেদ প্রচার করিল। এ হেন 'ভাবদর্শন' বাংলার এক অভিনব অবদান, ভারতের নূতন সম্পদ,—সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করিয়া 'নদের নিমাই' জগতে এক নূতনতর প্রেরণা আনিয়া দিলেন ; গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের পরিকল্পনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এক মহান্ ঐক্যের সন্ধান দিলেন ; বৈদিক

আর্য্যধর্ম্ম ও ভাবাত্মিকা অপরাপর অসংখ্য তৈর্থিক ও আজীবক ধর্ম্মে বৈদিক দর্শনে ও ভাবদর্শনে, এক অভূতপূর্ব্ব সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠাপিত হইল—বিশ্বচরাচর উৎফুল্ল হইল, বাঙ্গালী কৃতকৃতার্থ হইল ; শ্রীগৌরাঙ্গ নদিয়াতে অবতীর্ণ হইয়া এক অভিনব বিশ্বসত্ত্ব রচনা করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বাভাস পাইয়া সহজীয়া-সাধক চণ্ডিদাস গাহিলেন—

"আজু কে গো মুরলী বাজায়। এ তো কভু নহে শ্যাম রায় ॥
ইহার গৌর বরণে করে আল। চূড়াটী বান্ধিয়া কেবা দিল ॥
"ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি। নটবর বেশ পাইল কতি ॥
বনমালা গলে দোলে ভাল। এনা বেশ কোন দেশে ছিল ॥
"আজু কেনে দেখি বিপরীত। হবে বুঝি দোঁহার চরিত ॥
চণ্ডিদাস মনে মনে হাসে। এ রূপ হইবে কোন দেশে ॥"

—সাধকের এ ভবিষ্যদ্বাণীকে সার্থক করিয়া তাঁহার প্রাণের আকুল আকাঙ্ক্ষা যথাকালে মূর্ত্ত হইয়া প্রকটিত হইল। শ্রীস্বরূপ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীচরণ সরোজে নমস্কার জ্ঞাপন করিয়া, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের সার-সিদ্ধান্ত স্বীয় 'করচায়' ব্যক্ত করিলেন—

"রাধাকৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবিপুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥"

শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম্মাশ্রিত অভিনব ভক্তিসিদ্ধান্ত বিবৃত করিয়া অপূর্ব্ব দর্শনগ্রন্থ "ষট্সন্দর্ভ" * রচনা করিলেন। পরবর্ত্তীকালে শ্রীচৈতন্যদেবের অনুমোদিত বেদান্তভাষ্য অনুশরণ করিয়া শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ "শ্রীগোবিন্দভাষ্য" রচনা করিলেন।

---

* "ষট্সন্দর্ভের" অপর নাম "শ্রীভাগবতসন্দর্ভ" ; ইহাতে সন্নিবিষ্ট ছয়টী সন্দর্ভ, যথা—তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্মা, শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তি ও প্রীতি।

"বিদগ্ধমাধব", "ললিত মাধব," "উজ্জ্বল নীলমণি", "দানকেলি-কৌমুদী", "লঘুভাগবত", ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু", "হরিভক্তি বিলাস", "গোপালচম্পু", "চৈতন্য চন্দ্রোদয়", "চৈতন্য মঙ্গল", "প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা", "চৈতন্য ভাগবত" প্রভৃতি বহু সংখ্যক ভক্তিতত্ত্ব-বিষয়ক বৈষ্ণবগ্রন্থ রচিত হইল। উল্লিখিত সর্ব্বসিদ্ধান্তসার ষট্-সন্দর্ভ গ্রন্থের টীকা স্বরূপে "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" মহাভাগবত শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রণয়ন করিলেন—হরিনাম সংকীর্ত্তনের বিজয়-দুন্দুভি-নিনাদে সমগ্র ভারত মুখরিত হইয়া উঠিল। "ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু" সঙ্কীর্ত্তনের সূত্র রচনা করিলেন[১]—

"নাম-লীলা-গুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্।"

—শ্রীকৃষ্ণের নাম, তাঁহার লীলামাধুরী ও গুণাবলী প্রভৃতির উচ্চস্বরে ভাষণকে কীর্ত্তন বলে ; সঙ্কীর্ত্তনের ফলও "বিষ্ণুধর্ম্মে" বিবৃত হইল—'কৃষ্ণ' এই মঙ্গলময় নাম যাহার কথায় নিষ্পন্ন হয়—

"কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে"

—তাহার কোটী-কোটী-কল্পের মহাপাপ ভস্মীভূত হইয়া যায়।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রবর্ত্তিত হরি-সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে এক স্বর্গীয় ভাব বিদ্যমান—শ্রীকৃষ্ণের নাম সঙ্কীর্ত্তন ও তাঁহার সহিত প্রাণ বঁধুয়ার সম্পর্ক স্থাপন, ভক্তসাধকবৃন্দের চৈতন্যস্বরূপ নিষ্ক্রিয় পুরুষ ও ক্রিয়াশীলা প্রকৃতির অতীব গুহ্য জগৎ-কারণ তত্ত্বের আস্বাদন, স্রষ্টা ও সৃষ্ট জীবের মধ্যে এই যে অভূতপূর্ব্ব নিবিড় রসানুভূতি ও মিলন প্রচেষ্টা—

"যথা তথা বা বিদধাতু, মৎপ্রাণনাথস্তু স এব না পর[২]"

—এমন যে উপাস্যের প্রতি উপাসকের নির্ব্বিচারে ঐকান্তিক নির্ভরতা এবং প্রেম নিবেদন—ইহাই শ্রীভগবানের করুণাবতার, যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক,

১। 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু', পূর্ব্ব বিভাগ, ২য়া লহরী, ৭২ লহর্যাংশ।

২। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃত অষ্টম 'শিক্ষাষ্টকের' শেষ-চরণ।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চির-অনর্পিত অবদান। রাস-রসভাব-সমাধির প্রকরণ শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন বস্তুতঃই অপার্থিব। শ্রীহরি সেখানেই স্বয়ং অধিষ্ঠিত হ'ন, যেখানে হরিনাম কীর্ত্তিত হয়; ইহা শাস্ত্রবাক্য, সুতরাং প্রামাণ্য। 'নারদীয় ভক্তিসূত্রে' উক্ত হইয়াছে—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি, তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ॥"

—'ভক্তি রত্নাকর' গ্রন্থেও বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীখণ্ডে যখন প্রথম কীর্ত্তন[১] হয়, তখন শ্রীচৈতন্যদেব তথায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; বৈষ্ণবদিগেরও ইহাই একান্ত বিশ্বাস, কৃষ্ণকথা যেখানে হয় শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বপার্শ্বদ তথায় আবির্ভূত হন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পিত "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থ যে শ্রীজীবগোস্বামীকৃত "শ্রীভাগবতসন্দর্ভের" টীকা স্বরূপে রচিত, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমদনগোপাল জীউর আজ্ঞায় ইহা রচনা করিয়াছেন এবং অনন্ত প্রেমামৃত-নির্য্যাস পরিবেষণ করিয়া করযোড়ে সকলকে তাঁহার আকুল অনুরোধ জানাইয়াছেন—

"শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্যচরিতামৃতম্॥"

উক্ত অমৃতময়ী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার শ্রীমুখোদগীর্ণ "শিক্ষাষ্টক" স্বীয় পার্ষদ 'স্বরূপ' ও 'রামানন্দের' সহিত পরমানন্দে ভাবাবেশে আস্বাদন করিয়া—

১। বাংলা কীর্ত্তন পদও অসংখ্য বিদ্যমান এবং সেগুলি গান করিবার নানারূপ কীর্ত্তনের 'প্রবৃত্তিও' আছে, যথা—"নরোত্তম ঠাকুরালি", "মনোহরসাহী" "রেনেটি" ইত্যাদি।

—"হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়। নাম সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায় ॥
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে কর কৃষ্ণ-আরাধন। সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥"

—"বিংশতি পরিচ্ছেদে নিজ শিক্ষাষ্টক পড়িয়া। তার অর্থ আস্বাদিলা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥
ভক্তি শিক্ষাইতে সেই অষ্টক করিল। সেই শ্লোকাষ্টকের অর্থপুনঃ আস্বাদিল[১] ॥"

—তথাহি প্রথমাষ্টকঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব মহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ॥
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনম্[২] ॥"

—"সঙ্কীর্ত্তন হইতে পাপ সংসার নাশন। চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম ॥
কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন। কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥"
— শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।"

শ্লোক আস্বাদন করিয়াই শ্রীগৌরচন্দ্রের বিষাদ-দৈন্যের উদয় হইল ; তিনি 'আপনাকে করি সংসারী জীব অভিমান', স্বীয় ইষ্টলাভে অসমর্থতা হেতু অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া অতীব উৎকণ্ঠার সহিত নাম মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন—

—তথাহি দ্বিতীয়াষ্টকঃ

"নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্! মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥"

১। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডে "শিক্ষাশ্লোকার্থাস্বাদন' নামক বিংশ পরিচ্ছেদ।
২। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃত পদ্যাবলী—'নাম মাহাত্ম্য' প্রকরণ, ২২শ অঙ্ক।
৩। ঐ ঐ —'নাম মাহাত্ম্য' প্রকরণ, ৩১শ অঙ্ক।

—"অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার। কৃপাতে কহিল অনেক নামের প্রচার ॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। দেশকাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ। আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ ॥"

—'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।'

—কেমন করিয়া 'নামে প্রেম উপজয়'—কিরূপে, তাহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নাম সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করিলেন—

—তথাহি তৃতীয়াষ্টকঃ

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ[১] ॥
—"উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম। দুই প্রকার সহিষ্ণুতা, করে বৃক্ষসম ॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়। শুকাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয় ॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন। ঘর্ম্মবৃষ্টি সহে আনের করয়ে পোষণ ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়। শ্রীকৃষ্ণচরণে তার প্রেম উপজয় ॥"

—"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।"

উক্ত লক্ষণ বিবৃত করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দৈন্য আরও বা[illegible] গেল, তিনি ধন-সম্পত্তি, আত্মীয় ও স্বজন, প্রতিষ্ঠা বা প্রতিপত্তি কোন কিছুরই কামনা না করিয়া প্রেমের যাহা স্বভাব, যাহাতে প্রেমের প্রকৃষ্ট সম্বন্ধ সেই 'শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণ ঠাঞি মাগিতে লাগিল'—তথাহি চতুর্থাষ্টকঃ

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ ! কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে, ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি[২] ॥"

—"ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণ মোরে দেহ কৃপা করি ॥"—"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।"

১। শ্রীমন্মহাপ্রভুকৃত পদ্যাবলী, 'নাম সঙ্কীর্ত্তন' প্রকরণ।
২। ঐ ঐ 'ভক্তোৎসুক্য প্রার্থনা' প্রকরণ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিজেকে পুনরায় 'সংসারী জীব' এই অভিমানে অতি দৈন্যে দাস্যভক্তি-দান শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিলেন—

—তথাহি পঞ্চমাষ্টকঃ

"অয়ি নন্দতনুজ ! কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়[১] ॥"

—হে নন্দ-তনুজ ! "তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাশরিয়া।
পড়িয়াছি ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হৈয়া ॥
কৃপা করি, কর তুমি পদধূলীসম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন ॥"

—"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।"

শ্রীগৌরাঙ্গের আবার অতীব "উৎকণ্ঠা-দৈন্যের" উদয় হইল, তিনি প্রেমের সহিত নাম সঙ্কীর্ত্তন শ্রীকৃষ্ণের নিকট 'যাচ্ঞা' করিলেন—

—তথাহি ষষ্টাষ্টকঃ

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি[২] ॥"

—"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন কোরে দেহ প্রেমধন ॥"—"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।"

হে কৃষ্ণ! কখন তোমার নাম লইতে নয়নে অশ্রুধারা বহিবে—প্রেমাবেশে কণ্ঠ মোর রুদ্ধ হইবে ও শরীরে আমার রোমাঞ্চ হইবে কবে তোমার নাম লইতে হে কৃষ্ণ !—উদ্বেগ শ্রীচৈতন্যদেবের আরও বর্দ্ধিত হইল, দৈন্য তাঁহাকে আরও বিষণ্ণ করিয়া তুলিল—তিনি কৃষ্ণ-বিরহ-জনিত আকুল আবেগ জ্ঞাপন করিলেন—

১। শ্রীমন্মহাপ্রভুকৃত পদ্যাবলী—'ভক্তের দৈন্যোক্তি' প্রকরণ।
২। ঐ ঐ 'ভক্তের দৈন্যোক্তি' প্রকরণ।

—তথাহি সপ্তমাষ্টকঃ

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুসা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে[১] ॥"

—"উদ্বেগে দিবস না যায়, ক্ষণ যুগসম।
বর্ষা মেঘ সম অশ্রু বর্ষে দ্বিনয়ন ॥
গোবিন্দবিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন ॥"

—"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।"

শ্রীকৃষ্ণবিরহ জনিত দারুণ উদ্বেগ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে অস্থির করিল; তাঁহার "স্বাভাবিক প্রেম স্বভাবের"[২] উদয় হইল, তিনি 'রাধাভাবে' বিভোর হইয়া রসানুরাগে শ্রীকৃষ্ণের ঔদাসীন্য উপেক্ষা করিয়া, তাঁহা 'মনের নিশ্চয়' ব্যক্ত করিলেন

—তথাহি অষ্টমাষ্টকঃ

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথাতথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ[৩] ॥"

—"আমি কৃষ্ণপদ দাসী, তিঁহো রস সুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ।
কিবা না দেন দরশন, জরে আমার তনু মন,
তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ ॥

১। শ্রীমন্মহাপ্রভুকৃত পদ্যাবলী—'ভক্তের দৈন্যোক্তি' প্রকরণ।

২। 'স্বাভাবিক প্রেমস্বভাব', অর্থাৎ একই সময়ে হর্ষ, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, প্রৌঢ়ি ও বিনয়ের উদয়।

৩। শ্রীমন্মহাপ্রভুকৃত পদ্যাবলী—'শ্রীরাধার বিলাপ' প্রকরণ।

সখি হে ! শুন মোর প্রাণের নিশ্চয় ।

কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে,

মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ অন্য নয় ॥"

... ...

—"এই রাধার বচন বিশুদ্ধ প্রেম লক্ষণ,

আস্বাদয়ে শ্রীগৌর রায় ।

ভাবিতে মন অস্থির, সাত্ত্বিকে ব্যাপে শরীর,

মন দেহ ধরণ না যায় ॥

ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম, যেন জাম্বু নদ হেম,

আত্মসুখের যাঁহা নাহি গন্ধ ।

সে প্রেম জানাইতে লোকে, প্রভু কৈল এই শ্লোকে,

পদে কৈল অর্থের নির্ব্বন্ধ ॥"—"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ।"

এমনই ভাবে প্রেমের ঠাকুর শ্রীগোরারায় 'রাধাভাব-দ্যুতি-ধরি' বিশুদ্ধ প্রেমলক্ষণ আস্বাদন করিয়া 'আপনি আচরি ধর্ম্ম' লোক শিক্ষার্থ 'শিক্ষাষ্টক' প্রচার করিলেন—

"প্রভুর শিক্ষাষ্টক শ্লোক যেই পড়ে শুনে ।

কৃষ্ণপ্রেমভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে ॥"

—"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ।"

এই কৃষ্ণপ্রেমভক্তিই 'ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেমতত্ত্ব'—ইহাতে কামের গন্ধ মাত্র নাই—'কৃষ্ণ সুখ প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম ।'

'ওঁ সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা । ওঁ অমৃতরূপা চ[১] ॥'—ইহাই নারদ ঋষির ভক্তির সংজ্ঞা ।

'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে ।'—কৃষ্ণপ্রেমভক্তির ইহাই শাণ্ডিল্য সূত্র ।

১ । 'নারদ ভক্তিসূত্র'—২য় ও ৩য় সূত্র ।

ইহার বিষয় চিন্তা করিতে গেলে প্রাণ-মন অস্থির হইয়া যায়, শরীর সাত্ত্বিক-গুণে পরিব্যপ্ত হয়; 'তনুমনের'ধারণার ইহা অতীত; 'হ্লাদিনী সার-সমবেত সম্বিদ্রূপা" [১] ভক্তিতে, অহৈতুকী ভক্তি-ভাবের আশ্রয়েই, এ হেন প্রেমের স্ফুরণ হয়। এমন মাধুর্যময়ী প্রেমস্ফূর্ত্তি ঘটিলেই জীবের প্রকৃত 'দর্শন' লাভ হয়, তাহার আত্মবোধ ঘটে, তাহার ত্রিতাপের লয় হয়।

তখন সেই ভক্ত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মহাভাব-রাসরসলীলার আস্বাদ লাভ করেন ও আত্মহারা, পাগলপারা হইয়া, 'লীলাশুকের' ন্যায়, আপন হৃদয়-বল্লভ 'শিখিপিচ্ছ-বিভূষণ, গোপবেশ-সুমোহন' বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণদেবকে চোখে-চোখে, বুকে-বুকে, মুখে-মুখে রাখিয়া, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ-সুমাধুর্য নিয়ত পান করিতে করিতে মহানন্দে শুধুই গান করিতে থাকেন—

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো—
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো,
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্[২] ॥"

—ইহাই শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব-সম্মত রাগাত্মিকা ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম।

শ্রীমাধব দাস উক্ত ভক্তি-মার্গ অনুসরণ করিয়া ভাবে ও প্রেমে বিভোর হইয়া, আকুল আবেগে কাঁদিয়া গাহিলেন—

"আইলা 'গৌরাঙ্গ' আমার কাদম্বিনী হইয়া।
ভাসাইলা গৌড়দেশ প্রেম ভক্তি দয়া ॥

১। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত 'শ্রীগোবিন্দভাষ্য'—৩।৪।১২ ॥

২। শ্রীবিল্বমঙ্গলকৃত 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে' রাস-লীলা বর্ণন নামক ৮ম প্রকাশ, ৯২ তি শ্লোক।

'নিত্যানন্দ রায়' তাহে মারুত সহায়।
যাঁহা নাহি প্রেমবৃষ্টি তাহা লইয়া যায় ॥
প্রেমের সমুদ্র তাহে—রাধাকৃষ্ণ লীলা।
মন্থন করিয়া 'রূপ' তাহা উঠাইলা ॥
এবে সেই প্রেম দেখি বিদিত করিয়া।
এ 'মাধবদাস' কাঁদে বিন্দু না পাইয়া ॥"

শ্রীগোপাল বাউল প্রেমে পাগল হইয়া তান ধরিলেন—

"এসে এক রসিক পাগল, বাদালে গোল, নদের মাঝে দেখ সে তোরা—
পাগলের সঙ্গে যাব, পাগল হ'বো, হের্'ব রসের নবগোরা।
নিতাই পাগল, গৌর পাগল, চৈতন্য পাগলের গোড়া,
অদ্বৈত পাগল হয়ে, রসে ডুবে, প্রেম এনেছে জাহাজ পোরা ॥
ব্রহ্মা পাগল, বিষ্ণু পাগল, আর এক পাগল না দেয় ধরা।
কৈলাসের শিব পাগল, হয়ে পাগল সার করেছে ভাং ধুতুরা ॥
ইমাম্ পাগল, হোছেন পাগল, আর এক পাগল না দেয় ধরা—
তারা তিন পাগলে যুক্তি ক'রে—মক্কায় কর্‌লে নামাজ পড়া।
যত সব বৈরাগী বৈষ্ণব, ভেক্ নিয়ে, নাম বাড়ালে বাউল নাড়া—
গোঁসাই গোবিনের বচন—গোপালে শোন, পাবি চরণ জ্যান্তে মরা ॥"

ভক্ত-চূড়ামণি শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর প্রার্থনা করিলেন—

"গৌরাঙ্গের ছু'টী পদ, যার ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি রসসার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার ॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্য লীলা তারে স্ফুরে,
সে জন ভকতি অধিকারী ॥

গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্য সিদ্ধ করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত-পাশ।
শ্রীগৌরমণ্ডল ভূমি, যে বা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস॥
গৌর প্রেম রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধা মাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহেতে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলি ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥"

শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত শ্রীনিতাইচাঁদের অভেদ মানিয়া, নিতাই নামগুণ গাহিয়া, লোচনদাস শ্রীনিতায়ের মহিমায় মাতোয়ারা হইয়া পদ রচনা করিলেন—

"নিতাই মোর জীবন ধন, নিতাই মোর জাতি[১]
নিতাই বিহনে মোর—আর নাহি গতি।
সংসার-সুখের-মুখে, দিয়া মেনে ছাই।
নগরে মাগিয়া খাবো—গাইব নিতাই।
যে দেশে নিতাই নাই—সে দেশে না যাব,
নিতাই-বিমুখ-জনার-মুখ না হেরিব।
গঙ্গা-যার-পদজল, হর শিরে ধরে।[২]
হেন নিতাই না ভজিয়া দুঃখ পাঞা মরে!
লোচন বলে, আমার নিতাই, যেবা নাহি মানে,
অনল জ্বালিয়া দিব[৩]—তার মাঝ-মুখখানে॥"

১। সাংসারিক জীবনের যাবতীয় ইচ্ছা ও স্বাধীনতা শ্রীনিতাইচাঁদে সমর্পণ করিয়া, একান্ত সরল ভাবে, তাঁহাকেই একমাত্র জীবন সর্ব্বস্বজ্ঞানে, পদকর্ত্তা নিতাই নাম গাহিয়াছেন।
২। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের মহিমা শ্রীনিতাইচাঁদে অতিদেশ করিয়া ও উভয়ের অভেদ মানিয়া ইহা বর্ণিত হইয়াছে। (দ্রঃ—শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, শ্রীকৃষ্ণ-বলদেব)
৩। শ্রীনিতাইচাঁদের যে নিন্দা করে, একমাত্র অগ্নিশুদ্ধিই তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত।

কবি কুলশেখর শ্রীজয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রভৃতি পদকর্ত্তাদিগের অমিয় পদাবলী কীর্ত্তনে মুগ্ধ ও মোহিত বৈষ্ণবদাস প্রেমরসাস্বাদনোদ্দেশ্যে শ্রীগৌরচন্দ্রের শরণাগত হইয়া ব্যাকুল প্রাণে গাহিলেন—

"জয় জয়দেব কবি নৃপতি শিরোমণি বিদ্যাপতি রসধাম
জয় জয় চণ্ডিদাস রসশেখর অখিল ভুবন অনুপাম ॥
যা কর রচিঅ মধুর রস নিরমিল গন্থ পন্থময় গীত।
পঁহু মোর গৌরচন্দ্র আস্বাদিলা রায় স্বরূপ সহিত ॥
যবহু এ ভাব উদয় করু অন্তরে ওর গায়ই দুঁহু মেলি।
শুনাইতে হার পাষাণ গলি নাওত ঐছন সুমধুর কেলি ॥
আছিল গোপতে যতন করি পঁহু মোর জগতে করল পরকাশ।
সে রস স্তবনে পরশ নাহি হোয়ল—রোয়ত বৈষ্ণবদাস ॥"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এই অপূর্ব্ব রস-সাধনার ধর্ম্ম প্রচার করিয়া স্বীয় শিষ্যদিগকে স্পষ্ট নির্দ্দেশ দিলেন, যে লীলায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরকীয়া-ভাব হইলে প্রেমরসের পরিপুষ্টি হয় এবং উক্ত পরকীয়া-ভাব শ্রীরাধার সখী ও মঞ্জরীগণের অনুগত হইয়া স্বরণ, মনন, ও ধ্যান করিতে হয়। এহেন উচ্চাঙ্গের সাধনায় রসের বিকার দ্বারা অভিভূত হইবার আশঙ্কা আছে বলিয়াই জন-সাধারণের নিকট তাঁহার প্রবর্ত্তিত রসলীলাত্মক ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্যক্ত করিলেন—

"কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নর বপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর—
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥"—"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।"

—আর উক্ত কারণেই সকলকেই শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তনে নিরন্তর রত থাকিতে আদেশ দিলেন ; "নাম লইলে প্রেম উপজয়"—তখন লীলারসের আস্বাদ হয়, এক অভিনব ভাবদর্শনের অপূর্ব্ব সুষমায় প্রাণ-মন ভরপুর হইয়া

যায়। বৈষ্ণব রস-শাস্ত্র "উজ্জ্বল-নীলমণিতে" ইহার বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এবং "হরিভক্তি-বিলাস" প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীরাধাকৃষ্ণরাসরসলীলার গুঢ়-তত্ত্বেরও সন্দর্ভ দৃষ্ট হয়।

এই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম কেমন করিয়া লাভ হয়? কি প্রণালীতে শ্রীকৃষ্ণে প্রেম উপজয়? সাধকশিরোমণি গোবিন্দদাস শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের গুঢ়-তত্ত্ব পরিপাক করিয়া প্রাণের অভিলাষ প্রকাশ করিয়া ভজন গাহিলেন—

"ভজহুরে মন, শ্রীনন্দনন্দন, অভয়া চরণারবিন্দ রে।
দুর্লভ মানব জনম তা সহ তরহ এ ভবসিন্ধু রে॥
শীত আতপ বাত বরিখ, এ দিন যামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিনু, কৃপণ দুর্জ্জণ, চপল সুখ লব লাগি রে॥
এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন, ইথে কি পরতীতি রে।
কমল দল জল, জীবন টলমল, ভজহু হরিপদ নিতি রে॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, পাদ সেবন দাসী রে।
পূজন সখীজন, আত্মনিবেদন, গোবিন্দদাস অভিলাষ রে॥"

উক্ত মহাভাব-রসলীলার মাধুরী এবং শ্রীচৈতন্যদেবের এই আচণ্ডাল সকল জগদ্বাসীকেই প্রেমবিতরণ স্মরণ করিয়া ভাবে ও প্রেমে প্রেমদাস কীর্ত্তন ধরিলেন—

"চিদানন্দ সিন্ধু নীরে, প্রেমানন্দ লহরী—
মহাভাব রস লীলা, কি মাধুরী মরি মরি।
বিবিধ বিলাস রস প্রসঙ্গ, কত অভিনব ভাব তরঙ্গ
ডুবিছে উঠিছে, করিছে রঙ্গ, নবীন নবীন রূপ ধরি।
(হরি, হরি, হরি ব'লে।)
মহাযোগে সমুদায়-একাকার হইল—
দেশ কাল ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচিল।
(আশা পুরিল রে, আমার সকল সাধ মিটে গেল।)

এখন আনন্দে মাতিয়া, দুবাহু তুলিয়া
বল রে মন হরি হরি।
টুটল ভরম ভীতি, ধরম করম নীতি,
দূর ভেল জাতি-কুল-মান ;
কঁহা হাম, কাঁহা হরি, প্রাণ মন চুরি করি,
বঁধুয়া ক'রল পয়ান।
(আমি কেনই বা এলাম রে—প্রেমসিন্ধু তটে।)
ভাবেতে হওল ভোর, অবহিঁ হৃদয় মোর,
নাহি যাত আপন পসান ;
প্রেমদাস কহে হাসি, শুন সাধু জগবাসী,
এহ সোহি নূতন বিধান।
(কিছু ভয় নাই ! ভয় নাই !!)"

এই যে প্রেমের বিরহাবস্থা, ইহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শ্রীগৌরচন্দ্র। শ্রীগৌরকিশোরের বিরহোন্মাদ-অবস্থা তাহার স্বীয় পদে বর্ণন করিয়া সতৃষ্ণ নরহরিদাস মনের আক্ষেপে গাহিলেন—

"আরে মোর গৌর কিশোর।
নাহি জানে দিবানিশি, কারণ বিহনে হাসি,
মনের ভরমে পঁহু ভোর ॥
খেনে উচ্চৈস্বরে গায়, কারে পঁহু কি সুধায়,
কোথায় আমার প্রাণনাথ।
খেনে শীতে অঙ্গ কম্প, খেনে খেনে দেয় লম্ফ,
কাঁহা পাঁও, যাঁও কার সাথ ॥
খেনে ঊর্দ্ধবাহু করি, নাচে বোলে ফিরি ফিরি,
খেনে খেনে করয়ে প্রলাপ।
খেনে আঁখিযুগ মুদে, হা নাথ বলিয়া কাঁদে,
খেনে খেনে করয়ে সন্তাপ ॥

কহে দাস নরহরি, আরে মোর গৌরহরি,—
রাধার পীরিতে হৈল হেন।
ঐছন করিতে চিতে, কলিযুগে উদ্ধারিতে,
বঞ্চিত হইনু মুঞি কেন।"

রাধার পীরিত কেমন? বিচ্ছেদ ব্যাকুলিতা ধনী-মণি শ্রীরাধার 'পীরিতি-বিয়াধি' ও 'শ্যাম-বিরহ' স্মরণ করিয়া কৃষ্ণের দূতী ভাবাবিষ্ট জ্ঞানদাস আক্ষেপানুরাগে গীত রচনা করিলেন—

"শুনিয়া দেখিনু, দেখিয়া ভুলিনু, ভুলিয়া পীরিতি কৈনু,
পীরিতি বিচ্ছেদ, সহনে না যায়, ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈনু!
সই! পীরিতি দোসর [১] ধাতা—
বিধির বিধান, সব করে আন, না শুনে ধরম কথা ॥ [২]
সবাই বোলে পীরিতি কাহিনী, কে বলে পীরিতি ভাল,
শ্যাম বঁধু সনে পীরিতি করিয়া, পাঁজর ধসিয়া গেল!
পীরিতি থিরিতি [৩] তুলে তুলাইনু [৪], পীরিতি গুরুয়া ভার;
পীরিতি বিয়াধি [৫]! যারে উপজয়, সে বুঝে, না বুঝে আর!
কেন হেন সই! পীরিতি করিনু, দেখিয়া কদম্বতলে,
জ্ঞানদাস কহে—এমন পীরিতি, ছাড়িবে কাহার বোলে?"

রাধা-ভাবকান্তি-ধরি সাধক শিরোমণি গোবিন্দদাস ভাবে বিভোর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধারাণির 'তিমির-অভিসার' স্বীয় পদাবলীতে ধৃত করিয়া গাহিলেন—

"মাধব কি কহব দৈব বিপাক।
পথ-আগমন-কথা, কত না কহিব হে
যদি হয় মুখ লাখে লাখ ॥

১। দোসর—স্বতন্ত্র। ২। ধরম কথা—যথাবিহিত জাগতিক কর্তব্যাচরণের কথা। ৩। থিরিতি—মৃতি, মরণ। ৪। তুলে তোলাইনু—তৌল করিলাম, অর্থাৎ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। ৫। বিয়াধি—ব্যাধি।

মন্দির তেজি যব পদচারি আওলু,
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ, হেরই না পারিয়ে
পদযুগে বেড়ল ভুজঙ্গ ॥
একে কুল-কামিনী তাহে কুহু-যামিনী,
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর, বরিখয়ে ঝর ঝর
হাম যাওব কোন পুর ॥
একে পদ-পঙ্কজ, পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জরজর ভেল।
তুঁয়া দরশন-আশে, কছু নাহি জানলু
চিরদুখ অব দূরে গেল ॥
তোঁহারি মুরলী রব, শ্রবণে প্রবেশল
ছোড়লু গৃহ-সুখ-আশ।
পন্থহু দুখ তৃণ করি না গণলু
কহতহি গোবিন্দ দাস ॥"

পরম ভক্ত সুকবি শ্রীরামানন্দ রায় শ্রীমতী রাধার 'জ্যোৎস্নাভিসার' বর্ণন করিয়া পদ রচনা করিলেন—

"রাধা মধুর বিহারা—
হরিমুপগচ্ছতি, মন্থর-পদগতি, লঘু লঘু তরলিত হারা [১] ॥ধ্রু॥
চিকুরতরঙ্গকো [২] ফেন-পটলমিব, কুসুমং দধতী কামং ;
নটদপসব্য-দিশা [৩] দিশতীব [৪] চ নর্ত্তিতুমতনুমবামম্ [৫] ॥

১। আন্দোলিত। ২। কেশরাশি। ৩। নৃত্যশীল চক্ষু। ৪। যেন আদেশ দিতেছে। ৫। দক্ষিণ চক্ষু।

শঙ্কিত লজ্জিত, রসভরে চঞ্চল, মধুর-দৃগন্ত-লবেন[১].—
মধুমথনং প্রতি[২] সমুপ হরন্তী,[৩] কুবলয়দাম[৪] রসেন[৫] ॥
গজপতি রুদ্রনরাধীপ[৬] মধুনাতন-মদনং,[৭] মধুরেণ—
রামানন্দ রায় কবি ভণিতং সুখয়তু[৮] রস বিসরেণ[৯] ॥"

শ্রীরাধারাণীর বদন সন্দর্শনে উল্লসিত কানুর আনন্দোচ্ছ্বাস ও শ্রীরাধা-কানুর মধুর-মিলন ও সম্ভোগ, ভাবের আবেশে প্রত্যক্ষ করিয়া ও "দুহু-গুণ-গান" করিয়া, জ্ঞানদাস আত্মহারা হইয়া মহানন্দে পদ রচনা করিলেন—

"রাধা বদন হেরি—কানু আনন্দা—
জলধী উছল যৈছে হেরইতে চন্দা[১০] !
কতহি মনোরথ কৌশল কতরি !
রাধা কানু-কুসুম-শর-সমরি !
পুলকে পূরল তনু হৃদয় উলাস[১১]—
নয়ন ঢুলাঢুলি—লহু-লহু হাস[১২] ।
দুহুঁ অতি-বিদগধ[১৩] অনবধি লেহা[১৪]
রস-আবেশে বিসরি[১৫] নিজ দেহা ।
হার টুটল পরিরম্ভণ-কেলী,
মৃগ-মদ কুঙ্কুম, পরিমল ভেলি ।
নিরসি[১৬] অধর-মধু পিবি-মাতোয়ার
ভুখিল-ভ্রমর[১৭] কুসুম—অনিবার[১৮] ।

১। অপাঙ্গ দৃষ্টিতে। ২। মধু-মথন হরির প্রতি। ৩। উপহার দিতেছে। ৪। নীলকমলমালা। ৫। আনন্দে। ৬। উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র। ৭। অধুনাতন-মদন, অর্থাৎ কন্দর্পের ন্যায় সুন্দর। ৮। আনন্দিত করুক। ৯। মধুর রসবিস্তার দ্বারা। ১০। চাঁদ। ১১। উল্লাস। ১২। লঘু-লঘু, মৃদুমন্দ, মোহন। ১৩। অতুলনীয় রস-পারদর্শী। ১৪। স্নেহ। ১৫। বিস্মৃত। ১৬। মনের সাধে নিঃশেষ করিয়া। ১৭। ক্ষুধায় আকুল মধুকর। ১৮। নিবারণ রহিত।

দোহু দোহা চুম্বনে বয়ানে বয়ান [১]।
জ্ঞানদাস হেরি দুহুঁ গুণ গান।"

শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল-চরণ পাইবার আশায়, শ্রীরাধার সখী ও মঞ্জরী শ্রীরূপের অনুগত হইয়া প্রাণের আবেগে প্রার্থনা জানাইলেন—"শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়"[২] এবং অনন্ত লালসায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া গাহিলেন—

"শ্রীরূপ মঞ্জরী পদ, সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজন পূজন।
সেই মোর প্রাণ ধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন॥
সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধ সেই মোর ভক্তি-ঋদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত, সেই তপ, সেই মোর মন্ত্রজপ,
সেই মোর ধরম করম॥
অনুকুল হবে বিধি, সে পদ সম্পদ-নিধি,
নিরখিব এ-দুই নয়নে।
সে রূপ-মাধুরী রাশি যেন কুবলয় শশী,
প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে॥
তুয়া অদর্শনে অহি গরলে জরল দেহি,
চিরদিন তাপিত জীবন।
হা হা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া,
নরোত্তম পাইল শরণ॥"

১। মুখে মুখ রাখিয়া। ২। চণ্ডিদাসের "স্বরূপ বিহনে, রূপের জনম, কখন নাহিক হয়"—ইত্যাদি, ১৯৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পদ দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীচরণ শরণ লইয়া অদ্যাবধিও বহু বৈষ্ণব ভক্ত যোগী-জন-বাঞ্ছিত রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকারী হইয়া জীবনে ধন্য ও কৃত-কৃতার্থ হইতেছেন এবং দীনাতিদীনের মত 'দন্তে তৃণ ধরি' দেশে দেশে হরি-নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া অযাচিতভাবে তাঁহাদের সাধন-প্রজ্ঞা-লব্ধ রাস-রসলীলাত্মক গুহ্য প্রেমতত্ত্ব জনসাধারণের নিকট অকাতরে পরিবেষণ করিয়া গললগ্নীকৃত-বাসে কর-জোড়ে-শুধুই এই ভিক্ষা চাহিতেছেন—

"ভজ নিতাই-গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে-কৃষ্ণ হরে-রাম॥"

শ্রীশ্রীরাধাপুরুষোত্তম দেবের উজ্জ্বল শৃঙ্গার রসদ্বারা পরিপুষ্ট চির-অনর্পিত এই রাগাত্মিকা ভক্তি সর্ব্বসাধারণের নিকট যিনি অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন, সেই কলি-কলুষ-নাশন শ্রীশচীনন্দন সতত সকলের হৃদয়-কন্দরে স্ফুরিত হউন, ইহাই, এ দাসের একান্ত ও নিত্য প্রার্থনা—

"অনর্পিত-চরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তি-শ্রিয়ম্।
হরিঃপুরট-সুন্দর-দ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥"

॥ ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

অনুক্রমণিকা

॥ বাসুদেব সর্ব্বমিতি ॥

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	২৬	পেক্‌থা	পেক্‌থা
১০	১৩	"উপবেদ"	"উপবেদ" চারিটি
১৯	৫	বাচম্পতি	বাচস্পতি
২২	২৮	বিকার	ও বিকার
২৩	২২	গাত্রেন্দ্রিয়েম্বপি	গাত্রেন্দ্রিয়েস্বপি
৩১	৭	প্রবর্ত্তীত	প্রবর্ত্তিত
৩২	৪	তম্ব	তত্ত্ব
	৯	উৎকর্য অপকর্য	উৎকর্ষ অপকর্ষ
৩৮	১৬	organ	organs
৩৯	২	abstenence	abstinence
৪৮	৫	নবদ্বীপের	নবদ্বীপের,
৫২	৯	dialectict	dialectic
৫৯	২০	Light	শুধুই Light
	২২	air	শুধুই air
৬১	১৩	একা	এক বা
৬২	১৬	Genera	General
৬৭	১০	nuclers	nucleus
	১২	com-parson	com-parison
	১৮	recaled	recalled

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৪	১৯	ল	লয়
১০৬	১৫	ব্রহ্ম	ব্রহ্মা
১২১	৪	উপায়র	উপায়ের
১২৩	২	অন্যান্ন	অন্যান্য
১৩১	৮	ভারদ্বাজ	ভরদ্বাজ
১৩২	২৩	মতানুযায়	মতানুযায়ী
১৩৩	১৮	বার্ত্তায়নের	কাত্যায়নের
১৩৪	১	ভাষ্যবৃত্তি	ভাষাবৃত্তি
১৫২	২৩	কারা	করা
১৫৭	৫	বত্তা	বক্তা
	১৩	( )	(১)
১৬০	১৭	Slable	Stable
১৬৪	১৭	নয়	নহে
১৬৬	৪	Eight-fo(.ld	Eight-fold
১৬৯	১৯	বুদ্ধর	বুদ্ধ
১৭০	২	সুও	সুত্ত
১৯০	৯	পনরুপদেশ	পুনরুপদেশ
২০২	১২	দিরা	দিয়া
২০৪	১	প্রেমকা	প্রেমিকা
২০৫	৯	কবীরজী,	দাদূদয়ালজী
২২৬	৩	দুর্দ্দৈস	দুর্দ্দৈব
২[illegible]	১৪,২৫	থিরিতি	মিরিতি
	[illegible]	বাঞ্ছাসিদ্ধ	বাঞ্ছাসিদ্ধি